উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-মানস

* * *

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

UPANISHADER PATABHUMIKAY
RABINDRA MANASH
(Tagore against the Upanishadic background)
Dr. Sashi Bhusan Das Gupta
Price Rs. 7·50 nP.

প্রকাশক : অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮

মূল্য : ৭·৫০ (সাত টাকা পঞ্চাশ ন.প.)

প্রচ্ছদপট: শ্রীঅরূপ গুহঠাকুরতা

মুদ্রাকর : শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সারকুলার রোড
কলিকাতা-১৪

অধ্যাপক শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেন,

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথকে লইয়া ইতঃপূর্বে আর কোনো বই লিখি নাই। সাহিত্য-বিষয়ে অন্যান্য যে সব বই লিখিয়াছি সেখানে দেখিয়াছি, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে রবীন্দ্রচর্চাই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে; তথাপি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কোনো গোটা বই লেখা হয় নাই। ব্যাপারটা অকারণ নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বই লিখিতে গিয়া বারংবার প্রথমেই নিরুৎসাহিত হইয়া গিয়াছি; কারণ, মনে হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের যে দিক্‌টি অবলম্বন করিয়া আমি বই লিখিতে যাইতেছি সে দিক্‌টি অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন সর্বাপেক্ষা ভাল করিয়া। নিজের সম্বন্ধে বলিবার কোনো কথাই কবি বাকি রাখিয়া যান নাই। সে-সব কথাও একবার বলেন নাই, দুইবার বলেন নাই, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া নানা-প্রসঙ্গে নানাভাবে বার বার বলিয়াছেন; আর তিনি যে-কথা যে-ভাবে বলিয়া গিয়াছেন সে-কথা তাহা অপেক্ষা ভাল করিয়া নিজের ভাষায় বলিবার শক্তির অভাব সব সময়েই অনুভব করিয়াছি। কবির সত্য কবি যেমন করিয়া বলিতে পারেন অপরে আর তেমনটি পারেন না, শুধু পারেন না তাহা নয়, ভাষ্যমেঘের জালে সত্যসূর্যকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন।

কিন্তু কবি নিজেই আবার কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা রাখিয়া গিয়াছেন। এ-কথা ঠিক, নিজের কথা কবি গানে-কবিতায়, গল্পে-নাটকে, প্রবন্ধে-ভাষণে-পত্রে সবই বলিয়া গিয়াছেন এবং কবির সহিত ঘনিষ্ঠতম পরিচয় লাভের উপায় কবির নিজের লেখা পড়া। কিন্তু কবি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা অনেক কথা, প্রায় পড়িয়া শেষ করা যায় না। তাহার ভাষাও আবার মুখ্যতঃ অনুভূতির ভাষা, যাহা অপেক্ষা চিন্তার ভাষাটা আমাদের নিকটে অনেক সময় বেশি গ্রহণযোগ্য। অতএব কবির সেই অনেকভাবে ছড়ানো বিপুল কথাকে গুছাইয়া আনিয়া চিন্তার ভাষায় স্বল্পায়তনে বলিবার অবকাশ এবং প্রয়োজন উভয়ই রহিয়াছে।

গ্রন্থে প্রথমে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের মিলের কথা। কিন্তু এত সব মিল সত্ত্বেও উপনিষদের প্রভাবেই রবীন্দ্র-মানস গড়িয়া উঠিয়াছে এ-কথা সত্য নয়। রবীন্দ্র-মানস গড়িয়া

উঠিয়াছে তাহার আপন ধর্মে ; অনুভূতিই সেখানে প্রধান উপজীব্য, সেখান হইতে রস সংগ্রহ করিয়া এ মানস নিরন্তরই বাড়িয়া চলিয়াছে—গড়িয়া উঠিয়াছে। ঔপনিষদ মানস যেন একটি পটভূমিকা—সেই পটভূমিকার উপরেই রবীন্দ্র-মানসের বিচিত্র বিস্তার। আমি শুধু উপনিষদের পটভূমিকাটুকুই লক্ষ্য করি নাই, তাহার উপরে কবি-মানসের বিচিত্র বিস্তারকেও লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই বিস্তারের মধ্যেই রবীন্দ্র-মানসের সত্য পরিচয়।

উপনিষদের পটভূমিকায় যেখানে কবি-মানসকে বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি সেখানে স্বাভাবিকভাবেই কবির অধ্যাত্ম-অনুভূতি ও চিন্তার অথবা কবির জীবন-জিজ্ঞাসার আলোচনাই মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই-জাতীয় আলোচনার একটা বিপদ্ আছে। গ্রন্থের ফলশ্রুতির ভিতর দিয়া হয়ত কবির সমগ্র কবিরূপটি চাপা পড়িয়া তাঁহার অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসু রূপটিই বড় হইয়া ওঠে। বই পড়িতে পড়িতে হয়ত এমন ধারণাও কাহারও মনে বদ্ধমূল হইয়া উঠিতে পারে যে আমি যে দিক্ হইতে রবীন্দ্র-মানসকে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি তাহাই রবীন্দ্র-মানসের মুখ্য দিক্, আমি যে-সকল কবিতা লইয়া আলোচনা করিয়াছি বা যে-জাতীয় কবিতা হইতে উদ্ধৃতি দিয়াছি এইগুলিই কবির শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি। কিন্তু সে কথা সত্য নহে। রবীন্দ্রনাথ অনেক নাটক-উপন্যাস রচনা করিয়াছেন এবং প্রচুর পরিমাণে ছোটগল্প লিখিয়া গিয়াছেন যাহার সহিত অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নাই ; রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পরিচয়ে এগুলির স্থান কোনোমতেই উপেক্ষণীয় নহে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেও এমন কবিতার সংখ্যা স্বল্প নয় যেগুলি খুব ভাল কবিতা, অথচ অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার সহিত প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত নয়। আমি এই কথাটাকেই স্পষ্ট করিয়া তুলিতে চাই, আমি এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র পরিচয়কে উপস্থিত করিতে চাহি নাই, আমি একটি বিশেষ দিক্ হইতে দেখিয়াছি, সেই দিক্‌টিকে যথাসাধ্য সুসম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছি।

আলোচনায় অগ্রসর হইয়া আরও একটি কথা মনে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ গানে-কবিতায়-ভাষণে-প্রবন্ধে বহুস্থানেই একটি প্রাত্যহিক আমি ও তাহার পিছনকার একটি বিরাট আমির কথা বলিয়াছেন। এই বিরাট আমিকে আমির পিছনকার আত্মা বলা যায়; আত্মাকে পরমাত্মার সহিত যুক্ত করা যায়, বিশ্বের অন্তর্নিহিত একের সহিত যুক্ত করা যায়। রবীন্দ্রনাথ মানুষের ভিতরকার এই দুই আমির কথা যেভাবে বলিয়াছেন, চেতনায় অন্তর্ভুবনের

যারা এক আমির অতি সহজে অপর আমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার যে-সব কথা বলিয়াছেন, সে সব ক্ষেত্রে অনেক সময় আধুনিক মনোবিকলনের ব্যাখ্যা উপস্থিত করিতে লুব্ধ হইয়াছি। এরূপ লুব্ধ হইবার কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেই রহিয়াছে। কবি নিজেই অনেক সময় জ্ঞাতে অজ্ঞাতে মনোবিকলনের চিন্তা ও সিদ্ধান্তের দিকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। কিন্তু প্রলুব্ধ হইয়াও আত্মসংবরণ করিয়াছি; কারণ মাঝে মাঝে সুবিধা মতন দুই একটি গান বা কবিতা অবলম্বন করিয়া সেই সব ব্যাখ্যা-সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া কোনো লাভ নাই। সেই দৃষ্টিতে দেখিতে হইলে প্রথমাবধি সেই দৃষ্টিতেই দেখিতে হয় এবং প্রথমেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া লইতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি-জীবন ও বিশ্ব-জীবনের অন্তর্নিহিত যে এক পরম ভূমা পুরুষকে অনুভব করিয়াছেন তিনি 'পরম ভূমা পুরুষ' নন, তিনি 'পরম ভুয়া পুরুষ'। মানবচেতনার বিভিন্ন স্তরের যে রহস্য, ব্যষ্টি-চেতনার ভিতর দিয়া সমষ্টি-চেতনা প্রকাশের যে রহস্য, ব্যক্তি-চেতনার ভিতর দিয়া সমষ্টি-চেতনার যে ক্ষণে ক্ষণে আভাস ইঙ্গিত বা উদ্বোধ ইহার সকল রহস্যের ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুভূত বা পরিকল্পিত সকল 'আমি-তুমি'র লীলা-রহস্যের ব্যাখ্যা মেলে। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার মধ্যে আত্ম-অতিক্রমণের যে একটি নিরন্তর তাগিদ দেখিতে পাই, মনোবিজ্ঞানের ভাষায় অতি সহজেই তাহার ব্যাখ্যা মেলে। জাগ্রত মনের ক্ষেত্র অপেক্ষা সংস্কার-বাসনার ক্ষেত্র অনেক বেশি প্রশস্ত, চেতনা অপেক্ষা প্রবৃত্তির ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত; আবার মন হইতে প্রাণের ক্ষেত্র প্রশস্ততর, প্রাণ-অপেক্ষা বিশুদ্ধ অস্তিত্বের ক্ষেত্র আরও প্রশস্ততর; আমরা কেবলই তাই জাগ্রত ভাবনা হইতে সংস্কার-বাসনায়, চেতনা হইতে প্রবৃত্তিতে, মন হইতে প্রাণে—প্রাণ হইতে বিশুদ্ধ অস্তিত্বে পৌঁছাইতে চাই। কবিগণের আত্ম-অতিক্রম-প্রবণতার ইহাই হইল মূল-রহস্য। এ পথে চলিলে এই পথেই চলিতে হয়; অন্যপথে চলিতে চলিতে মাঝে মাঝে এ-পথের দুই একটি সচকিত-করিয়া-দেওয়া কথার অবতারণা করিয়া লাভ নাই। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের লিখিত এমন বই পড়িয়াছি যাহাতে উপনিষদের অধ্যাত্মতত্ত্বকে সবটাই Nature Mysticism বা প্রকৃতি-রহস্যবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আর এই প্রকৃতি-রহস্যবাদকে অনেক সময়ই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ব্যক্তিমনের জাগ্রত প্রত্যয় অহং-এর সঙ্গে ব্যক্তিমনের অতলগভীরে নিস্তব্ধ অচেতন মনের মিলনরূপে। জীবনের মধ্যে 'একে'র স্পর্শকে ব্যাখ্যা

করা হইয়াছে নৈমিত্যরূপ অচেতনের গভীর অতল হইতে ঈষৎ জাগরণ ও স্পন্দনের রূপে। এ সকলকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করি না; এগুলি এখনও নিজের মনের কাছে কৌতূহলপ্রদ তথ্য-সংবাদ, প্রত্যয়ের প্রসাদ লাভ করে নাই। প্রত্যয়ের ঝোঁক এখনও অধ্যাত্ম-বিশ্বাসের পথে, সুতরাং সেই পথকেই বাছিয়া লওয়া শ্রেয় মনে করিয়াছি। অভিনবত্বের মোহে নিজের ও অপরের বুদ্ধিভেদ জন্মাইয়া কোনো লাভ নাই।

গ্রন্থমধ্যে অধ্যায় ভাগ করিয়া আলোচ্য বিষয়ের কোনো শিরোনামা দেওয়া হয় নাই; সংখ্যা দ্বারা প্রসঙ্গগুলি ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য বিষয়কে প্রথমে দুইটি ভাগে পৃথক্ করা যাইতে পারে, প্রথমে উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের মিল, দ্বিতীয়ে উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-মানসের স্বাতন্ত্র্য। আলোচনার দ্বিতীয় ভাগে আবার মুখ্যতঃ চারিটি প্রসঙ্গ রহিয়াছে, (ক) রবীন্দ্রনাথের মানবতাবোধ, (খ) রবীন্দ্রনাথের অমরত্বের আদর্শ, (গ) রবীন্দ্রনাথের মুক্তির আদর্শ, (ঘ) রবীন্দ্রনাথের অদ্বয়ের মধ্যে দ্বয়বোধ। এক হইতে ছয় পর্যন্ত ভাগে রবীন্দ্রনাথ ও উপনিষদ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে, সাত হইতে নয় ভাগে রবীন্দ্র-মানসের স্বাতন্ত্র্যব্যঞ্জক মানবতা-বোধের আলোচনা হইয়াছে, দশে অমরত্বের আদর্শ এবং একাদশে মুক্তির আদর্শ আলোচিত হইয়াছে। দ্বাদশ হইতে বিংশতিতম ভাগে রবীন্দ্রনাথের অদ্বয়ের মধ্যে দ্বয়বোধের কথা লইয়া আলোচনা করিয়াছি। এই আলোচনা দ্বাদশ-ত্রয়োদশে সাধারণভাবে করা হইয়াছে; চতুর্দশ ও পঞ্চদশে প্রাক্-চল্লিশ যুগের কবিতা অবলম্বনে আলোচনা করিয়াছি, ষোড়শে 'নৈবেদ্যে'র যুগ ও সপ্তদশে গীতাঞ্জলি যুগ আলোচিত হইয়াছে। অষ্টাদশে বলাকায় আসিয়া বাঁক ফিরিবার ইতিহাস, ঊনবিংশে পূরবীর যুগ ও বিংশে শেষ আলোকের রশ্মিপাতে রবীন্দ্রমানসকে বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় সমগ্র গ্রন্থখানি শোভনরূপে প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন।

১০৩৫বি, চারু এভেনিউ
কলিকাতা-৩৩

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

॥ ১ ॥

রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদের প্রভাব সর্বজনবিদিত। এ সত্য স্বতঃপ্রকাশ, কোনো প্রমাণ-প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে না। একেবারে প্রথমযুগের কাব্য-কবিতা-সঙ্গীত ও গদ্যরচনা হইতে আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বের লেখা পর্যন্ত সব লেখার মধ্যেই এই সত্যের পরিচয় আছে—কোথাও একটু গূঢ়, কোথাও ঈষৎ রূপান্তরিত, কোথাও একেবারে স্পষ্ট। স্পষ্ট পরিচয় যেখানে রহিয়াছে তাহার পরিমাণও এত প্রচুর যে কোনো আলোচনা ব্যতীতই নিশ্চিত বিশ্বাস উৎপাদনের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কবি-অনুভূতির সঙ্গে বহু স্থলে অজ্ঞাতে উপনিষদের সত্যানুভূতির সাদৃশ্য ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, জ্ঞাতে তাঁহার অনুভূতিতে এবং ভাবে-ভাবনায় উপনিষদের ছোঁওয়া লাগিয়াছে; প্রকাশের ক্ষেত্রেও ঔপনিষদিক প্রকাশভঙ্গি দেখা দিয়াছে অসংখ্য লেখায়—জ্ঞাতেও অজ্ঞাতেও। রবীন্দ্রনাথের শুধু ধর্মসম্পর্কিত গদ্য লেখায় নহে, অন্যান্যবিষয়ক গদ্য লেখাতেও উপনিষদের ভাব ভাষা অনুবাদ উদ্ধৃতি কেবলই ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখা দিয়াছে। তাঁহার 'শান্তিনিকেতন'-পর্যায়ে প্রকাশিত ভাষণ ও লেখন-সমূহ অনেক স্থলেই নিজের উপলব্ধি-অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলাইয়া মিলাইয়া উপনিষদের ব্যাখ্যা—শুধু ব্যাখ্যা বলিব না, উপনিষদের বাণীকে বাস্তবজীবনের সকল আনন্দ-উৎসব সুখদুঃখ আশা-নৈরাশ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগের চেষ্টা। উপনিষদের কয়েকটি বাণী রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সঙ্গীতে গদ্য লেখায় বারবার ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিয়াছে ধ্রুবপদের মত; সুরের সকল বিস্তার আবার ফিরিয়া আসিয়াছে ঐ ধ্রুবপদেই। ঈশ-উপনিষদের একটি বাণী রবীন্দ্রনাথকে সারা জীবন একেবারে

যেন 'ভূতে পাওয়া'র মত পাইয়া বসিয়াছিল। বাণীটিতে বলা হইয়াছে যে, একটি হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত হইয়া আছে; জগৎ-সবিতা ও জগৎপোষক সূর্যের নিকটে প্রার্থনা করা হইয়াছে, হে পূষন্, তুমি তোমার রশ্মিসমূহ সংবরণ করো, তবেই সত্যের মুখ হইতে এই হিরণ্ময় আবরণ দূর হইয়া যাইবে, এবং সেই আবরণ দূর হইলে দেখা যাইবে, ঐ জগৎ-প্রসবিতার ভিতরে যে জ্যোতির্ময় পুরুষ, সেই জ্যোতির্ময় পুরুষই রহিয়াছেন আমার মধ্যেও। উপনিষদের এই বাণীটি রবীন্দ্রনাথের কবিতায় এবং গদ্য লেখায় প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক পর্যায়েই আসিয়া দেখা দিয়াছে— এক অর্থেও দেখা দিয়াছে, ভাবের বিচিত্র সম্প্রসারণেও দেখা দিয়াছে; কথাটাকে বার বার বলিয়াও যেন শেষ করা যায় নাই; আসলে কথাটা ঠিক বলার কথা নয়, ইহা রবীন্দ্রনাথের সমগ্রজীবনব্যাপী একটি অনির্বচনীয় অনুভূতি, তাহাকে শ্রান্তিহীন-ভাবে বার বার বলিয়াও মনে হইয়াছে, 'যে কথা বলিতে চাই বলা হয় নাই'।

আয়ুর্বেদীয় পদ্ধতিতে ঔষধে 'ভাবনা' দিবার একটি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে। কাজটি হইল কোনো বস্তুর সঙ্গে কোনো রসের মিশাল দেওয়া। রস যাহাতে বস্তুটির প্রতি অণুপরমাণুর সহিত মিলিয়া যাইতে পারে, এজন্য দিনে বস্তুটির সহিত রস মিশাইয়া রৌদ্রে শুকাইতে হয়, রাত্রিতে আবার শিশিরে রাখিতে হয়। এইরূপ দীর্ঘদিন ধরিয়া রৌদ্রে শুকানো এবং শিশিরে ভিজানোর মধ্য দিয়া রসের বিশোষণ ঘটে, বস্তুটি তখন রসে 'ভাবিত' হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের জীবন উপনিষদের রসে এইভাবেই 'ভাবনা' লাভ করিয়াছিল। (শৈশব হইতেই উপনিষদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয়; রবীন্দ্রনাথ নিজেই একাধিক স্থলে বলিয়াছেন, কৈশোরে তিনি উপনিষদের শ্লোকগুলি বার বার বিশুদ্ধ উচ্চারণে আবৃত্তি করিতেন। পারিবারিক জীবনে এবং সমাজ-জীবনে

চারিদিকে এই উপনিষদের প্রভাব। রাজা রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের সংস্কারসাধনের সঙ্কল্প লইয়া এই ঔপনিষদিক সত্যে হিন্দুধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সেই হইতে এই ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত ছিল উপনিষদে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিজে রবীন্দ্রনাথের নিকটে এই উপনিষদের বাণীর জীবন্ত প্রেরণা ছিলেন। সুতরাং প্রথমজীবন হইতেই এই উপনিষদ্‌কে তিনি পাইয়াছিলেন প্রচুরভাবে, প্রকৃতির সহজ দাক্ষিণ্যের মতই।) কিন্তু কৈশোরে একবার শুধু পাইলেন না, সারা জীবনের বিভিন্ন স্তরে তাহাকে পাইলেন; শুধু পাইলেন না, তাহাকে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন দিবসের কর্মকোলাহলের ভিতর দিয়া, সকল আশা-উৎসাহের উৎসব-আনন্দের উত্তাপের মধ্য দিয়া, বাস্তবজীবনের রূঢ় কঠোরতার প্রাখর্যের ভিতর দিয়া; আবার তাহাকে গ্রহণ করিলেন নিশীথের নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়া, অশ্রুসিক্ত সকল অভিজ্ঞতা-অনুভূতির ভিতর দিয়া। এইভাবে দীর্ঘদিনের 'ভাবনা'র ভিতর দিয়া উপনিষদ্‌ শুধু তাঁহার মনে প্রবেশ করিল না, অনুপ্রবিষ্ট হইল তাঁহার সত্তার সকল সূক্ষ্ম উপাদানের মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদের এই প্রভাব বুঝিয়া লইবার একটি সহজ পন্থা আছে। রবীন্দ্রনাথ ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে কিভাবে উপনিষদের উদ্ধৃতি দিয়াছেন, কিভাবে উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কোথায় রবীন্দ্রনাথের কোন্‌ বাণীর সঙ্গে উপনিষদের কোন্‌ বাণীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাদৃশ্য রহিয়াছে তাহার একটা পরিসংখ্যান অতি সহজেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহার কবিতা এবং সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও এই পন্থা গ্রহণ করা তেমন কোনো দুঃসাধ্য কার্য নয়। এই পরিসংখ্যানই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপনিষদের লেনদেনের মোটামুটি একটা পরিমাণগত পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু বিষয়টিকে ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে পন্থাটিকে অতিমাত্রায় বাহ্য বলিয়া মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গানের শব্দে

পাশে উপনিষদের বাণী বসাইয়া সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়া লাভ কি? রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার কবিতার ভিতরেই তো কত স্থানে উপনিষদের পঙ্‌ক্তি হুবহু তুলিয়া দিয়াছেন। গদ্য লেখায় তো কত স্থানে তিনি ইচ্ছা করিয়াই উপনিষদের বচনভঙ্গিটি পর্যন্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাজমহলের প্রসঙ্গে এক স্থানে বলিয়াছেন, 'কিন্তু, ঐ সাজাহানের কন্যা জাহানারার একটি কান্নার গান? তাকে নিয়ে আমরা বলেছি, ওঁ।' এই বলার ভঙ্গিটি পর্যন্ত যে উপনিষদের তাহা তো আর কোনো গবেষণাদ্বারা লাভ করিতে হয়না।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপনিষদের মিল লক্ষ্য করিবার অন্য একটা দিক্ আছে; প্রথমেই লক্ষ্য করিতে হইবে, দিক্‌টা শুধু প্রভাব বিচার করিবার নয়, দিক্‌টা হইল বিশেষ করিয়া মিল লক্ষ্য করিবার; অর্থাৎ উপনিষদ্‌গুলির মধ্যে প্রকাশিত যে মন আর রবীন্দ্রনাথের যে মন, এই উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে একটা অত্যন্ত সহজ এবং আশ্চর্য মিল; সে মিল আশ্চর্য এই জন্য যে অন্তত: তিন সহস্রাধিক বৎসর কালের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়াও এ মিল দেখা দিয়াছে অতি ঘনিষ্ঠ অথচ সহজ ভাবে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই মিলকে লক্ষ্য করিয়াছেন এবং স্পষ্টভাবেই আরো লক্ষ্য করিয়াছেন যে এই মিল সর্বত্র সচেতন-অনুকরণজাত বা প্রভাবজাত নয়, অচেতনভাবেই এই ঘনিষ্ঠ মিল গড়িয়া উঠিয়াছে। কবি অনেকবার সগর্বে নিজের পরিচয় দিয়াছেন বৈদিক ঋষিকবিগণের উত্তরাধিকারী বলিয়া। কিন্তু এই উত্তরাধিকারের সত্য দ্বারাই রবীন্দ্রনাথের সহিত বৈদিক ঋষিকবিগণের মিলের ব্যাখ্যা করিতে যাওয়া উচিত হইবে না; উত্তরাধিকারের সম্পদের সত্য অস্বীকার করিবার নহে, রবীন্দ্রনাথও তাহা অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু উত্তরাধিকারের মিল অস্বীকার না করিয়াও বলিব— সেই মিলের অতিরিক্তও লক্ষ্য করা যায় চিত্তধাতুর উপকরণে ও সংগঠনে একটা

মৌলিক মিল, সেই মিলটাকেই আমরা একটু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিব।

কথাটা লইয়া প্রথমেই একটা কৈফিয়ত দিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। রবীন্দ্রনাথকে যতই বড় কবি বা মনীষী বলিয়া স্বীকার করি-না কেন এবং তাঁহাকে যতই শ্রদ্ধা প্রদর্শনে প্রস্তুত থাকি-না কেন, তাঁহাকে একেবারে বৈদিক ঋষিগণের সঙ্গে সমান করিয়া দেখা জিনিসটাকে খানিকটা বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে পারে। বৈদিক ঋষি বলিতে এখানে আমি সংহিতা, আরণ্যক, উপনিষদ্— সর্ব-জাতীয় বৈদিক মন্ত্রের ঋষির কথাই বলিতেছি। রবীন্দ্রনাথকে বৈদিক ঋষির তুল্য করিয়া দেখিতে মনে যদি দ্বিধা জাগে তবে সে দ্বিধার মুখ্য কারণ হইল বৈদিক ঋষি সম্বন্ধে আমাদের একটা ধর্মীয় সংস্কার। বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের এতদিনে একটা বিশেষ হিন্দু সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছে এই যে, বৈদিক সাহিত্য সবটাই হইল ধর্মশাস্ত্র। এই সংস্কারটাকে একটু নড়াইয়া লইতে পারিলেই দেখি, বৈদিক ঋষিগণও মানুষ ছিলেন, তাঁহারা কবি ছিলেন, বেদ-আরণ্যক-উপনিষদ্ সবই তাঁহাদের দিব্যপ্রেরণাময় কবিতা। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা ও গানও এইরূপ দিব্যপ্রেরণাময় কবিতা। রবীন্দ্রনাথ যদি উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ না করিয়া আর তিন সহস্র বর্ষ পূর্বে জন্মগ্রহণ করিতেন এবং বাংলা ভাষায় কবিতা-গান রচনা না করিয়া তখনকার দিনের আর্যভারতীয় ভাষায় রচনা করিয়া রাখিয়া যাইতেন তবে ইহার অনেক অংশকেই আমরা অবাধে দিব্যমন্ত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতাম, তাহার উপরে টীকা-ভাষ্য-অনুভাষ্য রচনা করিয়া বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টাও করিতে পারিতাম। কালের এই ব্যবধানের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ও কৃতি অনেকখানি রহস্যাচ্ছন্ন হইয়া ওঠে নাই বলিয়াই হয়তো রবীন্দ্রনাথকে বৈদিক ঋষির সমতুল্য বলিয়া গ্রহণ

করিতে সংস্কারবিজড়িত মনে বাধা পাইতেছি। প্রসঙ্গক্রমে এ কথাও মনে রাখিতে হইবে, আরণ্যক-উপনিষদের ঋষিগণ সকলেই সংসারত্যাগী বনবাসী যতিধর্মাবলম্বী ছিলেন না; তাঁহারা কৃষিকর্ম করিয়া গোপালন করিয়া স্ত্রীপুত্রসহ গার্হস্থ্যজীবন যাপন করিতেন। উপনিষদের ব্রহ্মবিদ্যার প্রবক্তা বহু স্থলে আরণ্যক ঋষি নহেন, ব্রাহ্মণও নহেন—ব্রাহ্মণগণ দেশ-দেশান্তর হইতে শ্রদ্ধার্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইতেন ক্ষত্রিয় রাজার নিকট, তিনিই ব্রহ্মবিষয়ে ব্রাহ্মণগণকে উপদেশ দিয়াছেন। বক্তা সেই সেই রাজগণ বা শ্রোতা সেই সেই ব্রাহ্মণগণই যে উপনিষদ্‌গুলি রচনা করিয়া রাখিয়াছেন এমন নাও হইতে পারে; অনেক কাহিনী-কিংবদন্তীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া নিজেদের উপলব্ধি-অভিজ্ঞতার প্রেরণায় যাঁহারা এগুলি রচনা করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা কবি—সত্যদ্রষ্টা বলিয়াও কবি, ভাষা ও ছন্দের মাধ্যমে তাঁহাদের অনুভূতি-অভিজ্ঞতাকে দেশে দেশে কালে কালে মানুষের চিত্তের মধ্যে সংক্রামিত করিয়া দিবার মত উপযুক্ত প্রকাশের জন্যও তাঁহারা কবি। রবীন্দ্রনাথকে সেই সত্যদ্রষ্টা কবিগণের সহিত এক করিয়া দেখিতে কোনো বাধা দেখিতেছি না।

রবীন্দ্রনাথের সত্যদর্শনের পন্থা বৈদিক কবিগণের পন্থার একান্ত অনুরূপ। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করিব। কিন্তু আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, তিনসহস্রাধিক বর্ষের ব্যবধানকে অতিক্রম করিয়া রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গির সহিত এই বৈদিক কবিগণের প্রকাশভঙ্গিরও একটি একান্ত অনুরূপতা রহিয়াছে। উদ্ধৃতির বাহুল্য বর্জন করিবার জন্য ইতস্তত দুই-চারিটি নমুনা লইতেছি। 'বিচিত্রিতা'র 'দান' কবিতায় কবি উষার একটি বর্ণনা দিয়াছেন—

হে উষা তরুণী,
নিশীথের সিন্ধুতীরে নিঃশব্দের মন্থর ধ্বনি

যেমনি উঠিলে জেগে, দেখিলে তোমার শয্যাশেষে
তোমারি উদ্দেশে
রেখেছে ফুলের ডালি
শিশিরে প্রক্ষালি
কোন্ মহা-অন্ধকারে কে প্রেমিক প্রচ্ছন্ন সুন্দর।

বৈদিক উষা-বর্ণনার সঙ্গে যাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় রহিয়াছে তাঁহার নিকটে বুঝাইয়া বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই উষার এই বর্ণনার সহিত বৈদিক উষা-বর্ণনার কি ঘনিষ্ঠ যোগ; আবার রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্য-কবিতা-গানের সঙ্গে যাঁহার পরিচয় রহিয়াছে তাঁহাকেও বলিয়া দিবার কোনো প্রয়োজন নাই যে বৈদিক সাহিত্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ব্যতীতও রবীন্দ্রনাথের হাতে উষার এ-জাতীয় একটি বর্ণনা কত সহজেই আশা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'ধর্মে'র অন্তর্গত 'দিন ও রাত্রি' লেখাটির মধ্যে রাত্রির একটি বর্ণনা দিয়াছেন—

"এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অখণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। সন্তান যখন মাতার আলিঙ্গনপাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখে না শোনে না, তখনই নিবিড়তরভাবে মাতাকে অনুভব করে— সেই অনুভূতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক—শুদ্ধ অন্ধকার তেমনি যখন আমাদের দেখা-শোনাকে শান্ত করিয়া দেয়, তখনই আমরা এক শয্যাতলে নিখিলকে ও নিখিলমাতাকে আমাদের বক্ষের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্তী করিয়া অনুভব করি। তখন নিজের অভাব নিজের শক্তি নিজের কাজ বাড়িয়া উঠিয়া আমাদের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দেয় না, অত্যুগ্র ভেদবোধ আমাদের প্রত্যেককে খণ্ড খণ্ড পৃথক্ পৃথক্ করিয়া রাখে না, মহৎ নিঃশব্দতার মধ্য দিয়া নিখিলের নিশ্বাস আমাদের গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে, এবং নিত্যজাগ্রত নিখিলজননীর অনিমেষ দৃষ্টি আমাদের শিয়রের কাছে প্রত্যক্ষগম্য হইয়া উঠে।"

এই বর্ণনা সর্বাংশে বৈদিক রাত্রিসূক্তের অনুরূপ নয়, কারণ এখানে রাত্রি নিজে নিখিলমাতা নহেন, রাত্রি নিখিলমাতার কাছে আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দেন ; কিন্তু এইটুকু পার্থক্যসত্ত্বেও মনে হয়, এই বর্ণনাকেও একটি 'রাত্রিসূক্ত' নাম দিতে আপত্তি কি ?

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও নিগূঢ় মিলের কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। বৈদিক সকলজাতীয় প্রাকৃতিক বর্ণনা পড়িলেই মনে হয়, এই বর্ণনার পিছনে আর একটা বড় জিনিস রহিয়াছে—তাহা হইল, সকল বর্ণনার ভিতর দিয়া প্রকৃতির সর্বত্র একটি দেবতার সত্যে বিশ্বাস স্থাপন এবং সেই দেবতার সহিত ব্যক্তিগত একটা যোগ স্থাপনের চেষ্টা। এখানে দেবতা শব্দের অর্থ দ্যোতনশীল প্রকাশবান্ নিত্য সত্য। এই জিনিসটি রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও প্রথমাবধিই ঘটিয়াছে। তাঁহার প্রথমজীবনের কথা বলিতে গিয়া তাঁহার *The Religion of Man* গ্রন্থে ষষ্ঠ অধ্যায়ে তিনি বলিয়াছেন—

"সেই দিনগুলির দিকে যখন ফিরিয়া তাকাই তখন মনে হয়, অজ্ঞাতসারে আমি আমার বৈদিক পূর্বসূরিগণের পথই অনুসরণ করিয়াছি ;— গ্রীষ্মমণ্ডলের আকাশের যে দ্যোতনা রহিয়াছে সকলের পিছনকার সত্যের দিকে, তাহা দ্বারাই আমি উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলাম। বর্ষণহীন জলভরা মেঘগুলির ঘনসমাবেশ, সারি সারি নারিকেলগাছের মধ্যে ভঙ্গিময় আবেগের সাড়া জাগাইয়া দিয়া ঝড়ের আকস্মিক আগমন, প্রজ্বলন্ত নিদাঘমধ্যাহ্নের ভীতিপ্রদ নির্জনতা, শরতের শিশিরসিক্ত যবনিকার অন্তরালে সূর্যের নিঃশব্দ উদয়—ইহার প্রত্যেকটির মধ্যে যে বিস্ময় ছিল তাহা সর্বব্যাপী একটি সত্যের সহিত যোগের নিবিড়তায় আমার মনকে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিল।"

রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনের এই সত্য শুধু প্রথম জীবনেরই সত্য নহে, তাঁহার সর্বজীবনেরই সত্য।

উপনিষদ্গুলির মধ্যে অধ্যাত্মসত্যানুভূতির যে প্রকাশ তাহা মুখ্যতঃ অনুভূতিলীন চিত্তের বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে দিব্যপ্রেরণায়

স্বত-উৎসারণ। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দিব্যপ্রেরণার এইজাতীয় স্বত-উৎসারণের আর সংখ্যা নির্দেশ করিবার উপায় নাই। ইহার অনেক ক্ষেত্রে তাঁহার চেতনা উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত; কিন্তু আরো অসংখ্য ক্ষেত্র রহিয়াছে যেখানে তাঁহার স্বধর্মেই এইজাতীয় দিব্যানুভূতি অজস্রভাবেই উৎসারিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব চিত্তধর্ম হইতে উৎসারিত হইয়াও সেগুলি উপনিষদের এইজাতীয় উৎসারণ বা উচ্চারণের সঙ্গে প্রকৃতিতে একেবারে এক। রবীন্দ্রনাথ যেখানে আলোকোজ্জ্বল একটি প্রভাতের হৃদয়ানুভূতি প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন—

আজ গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায় দেখেছি আলোক-আসনে—
দেখেছি আমার হৃদয়রাজারে।
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা সনে, সে নীরব সভা-মাঝারে—
দেখেছি চিরজনমের রাজারে।
এই বাতাস আমারে হৃদয়ে লয়েছে, আলোক আমার তনুতে
কেমনে মিলে গেছে মোর তনুতে—
তাই এ গগন-ভরা প্রভাত পশিল আমার অণুতে অণুতে।

তখন আমরা সেই ঋষিরই বাণী লাভ করি, সূর্যালোক-উদ্ভাসিত একটি প্রভাত যাঁহার শুধু হৃদয়ে প্রবেশ করে নাই, যাঁহার দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে বিশ্বের সকল রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মধ্যে আসীন এক সত্যের আনন্দ ও জ্যোতির স্পন্দন জাগাইয়া দিয়াছে। ইহাকে উপনিষদের কোনো প্রভাব বলিব না; ইহা সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব অনুভূতি। সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রনাথের নিজের হইয়াও ইহা প্রকৃতিতে যে সবখানিই ঔপনিষদিক এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে উপনিষদের প্রকৃতিগত গভীর মিলের প্রশ্ন। 'বীথিকা'র 'আদিতম' কবিতাটির মধ্যে যখন দেখি—

প্রাণের প্রথমতম কম্পন
অসংখ্যের বন্যায় করিতেছে বিচরণ,

তারি সেই ঝংকার ধ্বনিহীন—
আকাশের বক্ষেতে কেঁপে ওঠে নিশিদিন ;
মোর শিরা তন্তুতে বাজে তাই ;
সুগভীর চেতনার মাঝে তাই
নর্তন জেগে ওঠে অদৃশ্য ভঙ্গীতে
অরণ্যমর্মর-সংগীতে।

ওই তরু ওই লতা ওরা সবে
মুখরিত কুসুমে ও পল্লবে—
সেই মহাবাণীময় গহন মৌনতলে
নির্বাক স্থলে জলে
শুনি আদি ওংকার,
শুনি মূক গুঞ্জন অগোচর চেতনার।

এ কথা রবীন্দ্রনাথের চিত্তে উপনিষদের প্রতিধ্বনিমাত্র নয় ; রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের কথার সঙ্গে এই কথা মিলাইয়া লইলে দেখিব, ইহাই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের মর্মকথা। এই কথা যেমন তাঁহার সমগ্র জীবনের মর্মকথা, এই প্রকাশও তাঁহার নিজস্ব প্রকাশ ; এক স্থলে হঠাৎ আসিয়া নিজেকে এমন নূতন করিয়া প্রকাশ করেন নাই— এইভাবেই হৃদয়ানুভূতিকে প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন দীর্ঘজীবনের কবিকর্মে।

'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ' উপনিষদের এই বাণীটি রবীন্দ্রনাথের মনে গভীর অনুরণন তুলিয়াছিল। তিনি 'শান্তি-নিকেতনে'র লেখার মধ্যে একটি লেখায় এই বাণীটিকে প্রসারিত করিয়া তাহাকে অপূর্ব রূপ দিয়াছেন। অন্যত্রও বহু স্থলে তিনি এই বাণীটিকে নানা প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু 'আরোগ্যে'র নবম-সংখ্যক কবিতাটিতে যখন দেখিতে পাই—

বিরাট সৃষ্টির ক্ষেত্রে
আতশবাজির খেলা আকাশে আকাশে

সূর্যতারা লয়ে
যুগযুগান্তের পরিমাপে।
অনাদি অদৃশ্য হতে আমিও এসেছি
ক্ষুদ্র অগ্নিকণা নিয়ে
এক প্রান্তে ক্ষুদ্র দেশে কালে।...

দেখিলাম যুগে যুগে নটনটী বহু শত শত
ফেলে গেছে নানারঙা বেশ তাহাদের
রঙ্গশালা-দ্বারের বাহিরে।
দেখিলাম চাহি
শত শত নির্বাপিত নক্ষত্রের নেপথ্যপ্রাঙ্গণে
নটরাজ নিস্তব্ধ একাকী।

তখন কি এই কথাই বলিব যে ইহা রবীন্দ্রনাথের চিত্তে সেই উপনিষদের বাণীরই অনুরণন মাত্র? ইহা কি রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী অনুভূতির দ্বারা সত্যমূল্য লাভ করে নাই? ইহার যে প্রকাশ তাহাকেও রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রকাশ বলিবার কি কোনো যৌক্তিকতা নাই? এই সকল 'বিশেষত্ব' লইয়াও প্রেরণায় ও প্রকাশে উপনিষদের সঙ্গে যে গভীর মিল তাহার প্রতিই আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এই মিলকেই আমি মৌলিক মিল বা ধাতুগত মিল বলিয়াছি।

পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের সকল ধর্মানুভূতিকে এবং অধ্যাত্মচিন্তাকে যেভাবে বার বার উপনিষদের বাণীর সঙ্গে যুক্ত করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, শুধু গদ্য লেখায় বা ভাষণে নহে, কবিতা-রচনার ব্যাপারেও তিনি বহু ক্ষেত্রে সচেতনভাবেই যেরূপ নিজের ভাব ও ভাষাকে উপনিষদের ভাব ও ভাষার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে অতি স্বাভাবিক-ভাবেই মনে হইতে পারে, এখানে প্রকৃতিগত মিলের প্রশ্নটা অনেকখানি অবান্তর, এখানে আবাল্য উপনিষদের রসে পুষ্ট কবি-

মানসেরই প্রকাশ দেখা যাইতেছে। রবীন্দ্রনাথের লেখা সমগ্রভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া আমাদের মনে হইয়াছে, প্রভাবের কথা অস্বীকার না করিয়াও বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেক স্তরেই নিজের অনুভূতি ও মননের সঙ্গে তিনি উপনিষদের বাণীর 'সায়' পাইয়াছেন। উপনিষদের বাণীর সঙ্গে অনুভূতি ও মননের এই সায় তাঁহাকে সর্বদা উৎসাহ দিয়াছে, প্রত্যয় দিয়াছে; উপনিষদের বাণীর সঙ্গে মিলে তিনি নিজেকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠরূপে আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ঔপনিষদিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁহার আজীবন গভীর শ্রদ্ধা। ফলে নিজের কথাকেও রবীন্দ্রনাথ বার বার করিয়া উপনিষদের বাণীর সঙ্গে যুক্ত করিয়াই বলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। উপনিষদের বাণীকে অবলম্বন করিয়া তিনি যেখানে যেখানে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে সর্বত্রই তাঁহার মন উপনিষদের একান্ত অনুগামী নহে; কোথাও উপনিষদের সূক্ষ্ম একটি ব্যঞ্জনাকে বিস্তার করিয়া তিনি তাহাতে নূতন ব্যঞ্জনা সংযোজিত করিয়াছেন, কোথায়ও দেখিব, নিজের অনুভূতি-মননকে তিনি খানিকটা উপনিষদের উপরে আরোপ করিয়াছেন। উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের মিল দেখাইয়া কোথায় কোথায় রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়াই উপনিষদ্‌কে অনেকখানি অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছেন ইহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা যেখানে করিব সেইখানেই আমাদের বক্তব্যটি স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। প্রসঙ্গক্রমে অপর একটি তথ্যের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া রাখিতে চাই; রবীন্দ্রনাথের কৈশোর এবং প্রথমযৌবনের অনেক কবিতার ভিতর দিয়া কবিমনের যে অপটু আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে তাহার উপরে উপনিষদের প্রভাব ছিল না, অথচ পরবর্তী কালের ভাবধারার সঙ্গে মিলাইয়া এগুলিকে যখন গ্রহণ করিতে চাই তখন ভাবধারার অন্তর্নিহিত একতানতা আমাদিগকে বিস্মিত করে, কবি নিজেও এই আবিষ্কারে ক্ষণে ক্ষণে সচকিত এবং চমৎকৃত হইয়া উঠিয়াছেন।

॥ ২ ॥

উপনিষদ্‌গুলি কোনো এক ঋষিকবির রচনা নয়। বেদের উত্তরাংশ বলিয়া এগুলি সাধারণভাবে বেদান্ত নামে অভিহিত; আমরা সাধারণতঃ এই বেদান্তের একটা রচনাকাল মোটামুটিভাবে স্থির করিয়া লইলেও সব উপনিষদের রচনাকাল যে খুবই কাছাকাছি এ কথা সত্য না হইবারই সম্ভাবনা। উপনিষদের মুখ্য আলোচ্য বা প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ হইলেও এই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এবং শুশ্রূষা সর্বক্ষেত্রে এক নহে। পরবর্তী যুগের বিভিন্ন কালেও অনেক উপনিষদ্‌ রচিত হইয়াছে। কিন্তু মোটামুটিভাবে যে-কয়খানি উপনিষদ্‌ প্রাচীন বলিয়া স্বীকৃত তাহাদের ভিতরকার রচনার কালগত ব্যবধান এবং বিষয়বস্তুকে উপস্থাপিত এবং আলোচনা করিবার ভঙ্গিবৈচিত্র্য সত্ত্বেও তাহাদের মধ্যে আমরা একটা গভীর ঐক্য দেখিতে পাই, যে ঐক্যকে অবলম্বন করিয়া আমরা উপনিষদের বাণী, উপনিষদের সুর প্রভৃতি সাধারণীকৃত কথা বলিয়া থাকি। এই ঐক্য কোথায় তাহা ভালো করিয়া বুঝিয়া লইতে গেলেই লক্ষ্য পড়ে সব উপনিষদের মধ্যেই প্রধানভাবে দুইটি জিনিসের প্রতি—একটি হইল গভীর জিজ্ঞাসা, অপরটি হইল দর্শন; দর্শন এখানে একমাত্র বুদ্ধিনির্ভর বা মুখ্যভাবে বুদ্ধিনির্ভর কোনো মত-সিদ্ধান্ত নহে, দর্শন এখানে গভীর অনুভূতি এবং তাহার সানন্দ উচ্চারণ। আমরা আধুনিক কালে যাহাকে 'দার্শনিক মতবাদ' বলিয়া অভিহিত করি সমস্ত উপনিষদের মধ্যে এইরূপ কোনো একটি দার্শনিক মতবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে এ কথা বলা যায় না। উপনিষদ্‌গুলিকে লইয়া বিশেষ বিশেষ দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে পরবর্তী কালে। আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, পরস্পরবিবদমান দার্শনিক মতাবলম্বিগণের এক পক্ষ একটি

বিশেষ মতবাদকে দৃঢ়রূপে স্থাপিত করিবার জন্য যে-সব বাণীর সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন অপর পক্ষ সেই মতবাদ নিরসন করিবার জন্যই আবার সেই বাণীগুলির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। মতবাদে মতবাদে তর্ক এবং বিবাদ হইতেছে—মাঝখানে উপনিষদের বাণীগুলি স্থির রহিয়াছে; মূলে যে 'মতবাদ' গড়িয়া তোলা তাহাদের কাজ নয়—তাহারা হইল মানুষের মনের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাগুলির উত্তরে বিভিন্ন সত্যদর্শী ঋষির বিভিন্নকালে লব্ধ অনুভূতির দিব্য-প্রেরণাময় সোল্লাস উচ্চারণ। বিশ্বসৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া সর্বত্র একইভাবে একই ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে তাহা বলা যায় না, সে কাজ করিবার প্রতিজ্ঞাদ্বারাও নিজেদের তাঁহারা আষ্টেপৃষ্ঠে বদ্ধ করিয়া লন নাই। দার্শনিক মতৈক্যের কঠোরতা আরোপ করিতে গিয়া উপনিষদের বাণীগুলির উপরে ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ দার্শনিকবৃন্দ যে অনেক সময় বুদ্ধির অত্যাচার করিয়াছেন এ কথাও আমরা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না।

উপনিষদের মধ্যে আমরা একটা নিত্যনবীনতা আবিষ্কার করি যাহা আমরা অন্য কোনো দার্শনিক সিদ্ধান্তের বেড়াজালের মধ্যেই লাভ করিতে পারি না। মানুষের মন এখানে যেমন একটা আদিম বিস্ময় এবং সেই বিস্ময়জনিত অফুরন্ত জিজ্ঞাসা লইয়া দেখা দিয়াছে এমন আর কোথাও দেখা যায় না। সত্যও এখানে বুদ্ধিগ্রাহ্য কোনো স্থির সিদ্ধান্ত নহে, বিশ্বাসলব্ধ কোনো সনাতন ভগবৎ-প্রত্যাদেশ নহে—সত্য এখানে মানুষের জ্যোতিরুদ্ভাসিত এবং আনন্দস্পন্দিত হৃদয়ের মধ্যে নানাভাবে হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছে—সেই হইয়া উঠিবার সকল ইঙ্গিত সকল ব্যঞ্জনা বিশ্বের অন্তর্নিহিত একটি পরম একের দিকে। মানুষের মনে বিস্ময় এবং জিজ্ঞাসা এখানে অন্ধকারের পরপার হইতে স্বর্ণকিরণোদ্ভাসিত সবিতার নিঃশব্দ আবির্ভাবে, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা রাত্রির আকাশে

চন্দ্র-তারকা-গ্রহ-নক্ষত্র লইয়া, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা ঐ যে ক্ষুদ্র বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্‌গম এবং তাহার ক্রমবিবৃদ্ধিতে বিরাট্ ন্যগ্রোধবৃক্ষটির বনভূমিব্যাপী বিকাশ তাহা লইয়া, বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা এই দেহটি লইয়া, দেহের কর্ম-সাধক ইন্দ্রিয়গুলি লইয়া, দেহের যাহাতে প্রতিষ্ঠা সেই অন্ন লইয়া—অন্নে প্রতিষ্ঠিত প্রাণ লইয়া, প্রাণে প্রতিষ্ঠিত মন, মনে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান, বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত আনন্দ লইয়া। (এই যে মন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইতেছে, এই যে প্রাণ অফুরন্ত ধারে বহিয়া চলিতেছে, এই যে চক্ষু দেখিতেছে, এই যে কান শুনিতেছে—ইহার প্রতিটিই যে পরম বিস্ময়, প্রতিটিকে লইয়াই অনন্ত প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর দিবে কে? বুদ্ধি? সেও তো ইন্দ্রিয়েরই কাজ—তাহাকে লইয়াও তো বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা। উত্তর জাগিতে লাগিল শুধু বন্ধনহীন আবরণহীন হৃদয়ের মধ্যে, চিত্তের জ্যোতির্ময় এবং আনন্দময় উদ্‌ভাসনের মধ্যে। সে উদ্‌ভাসন কথনো উচ্চারণ করিল, অনন্ত মহিমা ঐ জ্যোতির্ময় সবিতার, অন্ধকারের পরপারে ঐ জ্যোতির্ময় সবিতাকে দেখো—ঐ ব্রহ্ম; ঐ অগ্নি—দ্যুলোকে অগণিত জ্যোতিষ্ক হইয়া আছে, অন্তরিক্ষে বিদ্যুৎ হইয়া আছে, ভূলোকে যজ্ঞের হবি গ্রহণ করিতেছে, দেহের মধ্যে অন্নাদরূপে সব সোমকে গ্রাস করিতেছে পরিপাক করিতেছে —অনন্ত মহিমা এই অগ্নির—এই অগ্নিই ব্রহ্ম; এই যে বায়ু, যে অন্তরিক্ষে মরুদ্‌রূপে সঞ্চরমাণ, ভূলোকে স্পর্শরূপে প্রতীয়মান, দেহ মধ্যে প্রাণকে ধারণ করিয়া আছে—এই বায়ুই ব্রহ্ম; এই যে বিশ্বজৈবিক-প্রবাহের প্রতিষ্ঠা অন্ন—এই অন্নই ব্রহ্ম, এই যে অনন্তকালে প্রবাহিত মহাপ্রাণ—এই প্রাণই ব্রহ্ম। এই যে মহাকাশে পরিব্যাপ্ত মহা-আনন্দ—এই আনন্দই ব্রহ্ম! প্রতিটি জীবের অন্তরে অবস্থিত এই আত্মা ব্রহ্ম! এই সব মহিমা জুড়িয়া এক সত্য—সেই সত্যই পরম সত্য, সকল সত্যের অন্তর্নিহিত সত্য। সেই সত্য মহত্তম, সেই সত্য বৃহত্তম, সেই সত্যই ব্রহ্ম।)

(উপনিষদের সর্বত্র এই একের সন্ধান, এই একের উপলব্ধি। ভূলোকে অন্তরিক্ষে দ্যুলোকে, বিশ্বপ্রকৃতির সকল দৃশ্যে ঘটনায়, মানুষের দেহে মনে আত্মায়, সর্বত্র গূঢ় হইয়া রহিয়াছে যেন একটি বাণী—সর্বত্র বিশ্বজীবনের এবং ব্যক্তিজীবনের সেই বাণীটি লাভ করিবার চেষ্টা। সূর্যে চন্দ্রে নক্ষত্রে যেখানে তাহাকে পাওয়া গেল, অগ্নিতে বায়ুতে সলিলে যেখানে তাহাকে পাওয়া গেল, তৃণে লতায় বনস্পতিতে যেখানে তাহাকে পাওয়া গেল, মানুষের অন্নে প্রাণে মনে আত্মায় যেখানে তাহাকে পাওয়া গেল সেখানেই পরম আনন্দের সংবেগ—সেই সংবেগের স্বতঃপ্রকাশ দীপ্তিময় ভাষায় ছন্দে। কবিপ্রেরণা এবং ধর্মপ্রেরণায় এখানে কোনো দ্বৈতত্ব নাই, ওতপ্রোতভাবে মিলিয়া মিশিয়া এক।)

উপনিষদের ভিতরকার এই যে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা ইহাকে বর্তমান যুগে একটি বিশেষ অর্থে আমরা 'আদিম' বলিয়া আখ্যাত করি, সেই অর্থের মধ্যে মানবমনের অপরিণতির প্রতি একটি ইঙ্গিত আছে। কিন্তু বার বার উপনিষদ্ পড়িয়া মনে হইয়াছে উপনিষদের ভিতরকার যে বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা তাহাকে আজিকার দিনেও আমরা অতিক্রম করিতে পারিয়াছি কি? ইহা তো মানবমনের নিত্যকালের বিস্ময়, নিত্যকালের জিজ্ঞাসা। কোন্ শক্তির কি ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া মন বিষয়ের প্রতি ধাবিত হইতেছে, প্রথম প্রাণকে কে সঞ্চারিত করিয়াছিল? বাক্ কি শক্তিতে কথা বলে, কোন্ দেবতা নিয়োগ করেন এই চক্ষুকে শ্রোত্রকে? কোন্ দেবতা দীপ্যমান জ্যোতিষ্মান্ আদিত্যের মধ্যে—কোন্ দেবতা দীপ্যমান আমার সমস্ত দেহে মনে আত্মায়—কি সম্পর্ক ঐ আদিত্যের অন্তর্বর্তী ও অন্তর্যামী পুরুষ এবং আমার অন্তর্বর্তী ও অন্তর্যামী পুরুষের মধ্যে? সূক্ষ্ম বীজ হইতে কি করিয়া জাগিয়া উঠিল এই ন্যগ্রোধ বনস্পতি! ইহার সব বিষয়েই বৈজ্ঞানিক তথ্য আজ আমরা প্রচুরভাবে লাভ করিয়াছি—তথাপি আমাদের বিস্ময়ের

অবধি নাই, জিজ্ঞাসার কিছুমাত্র পরিসমাপ্তি নাই। আদিম শব্দের তাৎপর্য এখানে তাই প্রাথমিক—মানুষের সেই নিত্যকালের প্রাথমিক বিস্ময় ও জিজ্ঞাসা এখানে আশ্চর্য সহজ সরল রূপ লাভ করিয়াছে।

এই বিস্ময় ও জিজ্ঞাসার পরিণতি যে সত্যোপলব্ধিতে, নিত্য অনির্দেশ্য সেই সত্যের স্বরূপ। সর্বপ্রকারের 'না'-দ্বারা তাহাকে বর্ণনা কর সে বর্ণনাও ঠিক—সর্বপ্রকারের 'হাঁ'-দ্বারা তাহাকে বর্ণনা কর তাহাও ঠিক। আমাদের নিকটে সুনির্দেশ্য সত্য কোন্‌টা? হয় যাহাকে বুদ্ধির বেড়াজালে চারিদিক হইতে বাঁধিয়া ফেলিতে পারিলাম, অথবা বুদ্ধি যেখানে নাগাল পাইল না তখন একটি বিশ্বাসের দ্বারা একটা কিছুকে অনড়ভাবে গ্রহণ করিলাম। উপনিষদের সত্য এই দুইয়ের কোনোটিই নয়, আলঙ্কারিকের ভাষায় এ সত্য হইল বিশ্বজীবন এবং ব্যক্তিজীবনের 'ধ্বনি'। বিশ্বজীবনের যত গভীরে প্রবেশ করা যাইতেছে, ব্যক্তিজীবনের গভীর সত্তায় যত প্রবেশ করা যাইতেছে ততই সেই ধ্বনি, সেই এক সৎ-চিৎ-আনন্দের অনুরণন অমোঘভাবে অনুভূত হইতেছে। এই যে সকল দেখার ভিতর দিয়া চোখে দেখিলাম, এই যে সকল শোনার অন্তস্তলে কানে শুনিলাম, এই যে দেহের অণু-পরমাণু আলোকে উদ্ভাসিত আনন্দে স্পন্দিত হইয়া বলিয়া উঠিল 'আছে আছে আছে', সৎ-স্বরূপে আছে, অনন্ত চৈতন্যরূপে আছে, নিখিল-প্লাবী আনন্দরূপে আছে। যাহা আমাতে আছে তাহা তৃণে আছে বনস্পতিতে আছে, তাহা অগ্নিতে আছে জলে আছে, তাহা আদিত্যে আছে চন্দ্রমায় আছে, তাহা বিশ্বভুবনকে আবিষ্ট করিয়া আছে, চলমান জগতের চলমান জীবনের যাহা কিছু তাহার সবই ইহা দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই সত্যকে রসস্বরূপ 'সঃ' বলিয়া নির্দেশ করিতেও আপত্তি নাই, শুধুমাত্র 'তৎ' বলিয়া নির্দেশ করিতেও আপত্তি নাই, আবার সর্বভূতে অনুস্যূত অনির্দেশ্য 'অসৎ'

বলিয়া উল্লেখ করিতেও আপত্তি নাই। ইহাই বটে, আর ইহা কিছুতেই নয়—এ কথা পরবর্তী কালের মতবাদিগণের; উপনিষদ্ বলিবে অনন্তবিচিত্র আমার অনুভূতি এই সত্যের, তাই আমি এ-ভাবেও ইঙ্গিত দিয়াছি, ও-ভাবেও ইঙ্গিত দিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনের পরিণতি এই উপনিষদের ধারায়। সর্বপ্রথমেই লক্ষ্য করিতে পারি, ধর্মপ্রেরণা ও কবিপ্রেরণা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে এক এবং অবিচ্ছেদ্য। এইজন্য রবীন্দ্রনাথকে পৃথক্‌ভাবে ধর্মের কথা বা দর্শনের কথা বলিবার জন্য যখন আহ্বান জানান হইয়াছে তিনি তখন মহা অস্বস্তি অনুভব করিয়াছেন। 'হিবার্ট লেক্‌চার্‌স্' দিতে গিয়া তাই তিনি অতিস্পষ্ট করিয়া বলিলেন,—

"আমার ধর্ম হইল একজন কবির ধর্ম—এ ধর্ম কোনো নিষ্ঠাবান সদাচারী লোকের ধর্মও নয়, কোনো ধর্মতত্ত্ববিশারদের ধর্মও নয়। আমার গানগুলির প্রেরণা যে অদৃশ্য এবং চিহ্নহীন পথে আমার কাছে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেই পথেই আমি আমার ধর্মের সকল স্পর্শ লাভ করিয়াছি। আমার কবিজীবন যে রহস্যময় ধারায় গড়িয়া উঠিয়াছে আমার ধর্মজীবনও ঠিক সেই এক ধারাকেই অনুসরণ করিয়াছে। যেমন করিয়াই হোক, তাহারা পরস্পরে পরস্পরের সহিত যেন বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে; এ মিলন গড়িয়া উঠিয়াছে অনেক দিনের উৎসব অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া, সে তথ্যটা সম্বন্ধে আমি নিজে কখনই সচেতন ছিলাম না।"

রবীন্দ্রনাথের গানের প্রেরণা এবং ধর্মের স্পর্শ, এই উভয়ের সঞ্চরণের চিহ্নহীন গোপন পথটি কি? তাহা হইল পরম বিস্ময়ের পথ, যে পথে নিজের অজ্ঞাতেই তিনি পথিক হইয়াছিলেন চিত্তবিকাশের প্রথম ক্ষণ হইতে। জীবনকে ও জগৎকে রবীন্দ্রনাথ জানিয়া কখনও খুশী হইতে পারেন নাই, কেবলই মুগ্ধ হইয়াছেন বিস্মিত হইয়াছেন। সেই অনন্ত মুগ্ধতা ও বিস্ময় চিত্তের মধ্যে অনুক্ষণ জাগাইয়াছে বিচিত্র অনুভূতি, সেই অনুভূতি হৃদয়ে আনিয়াছে

সত্যের স্পর্শ, কণ্ঠে জাগাইয়াছে গান। শুধু বৃহৎ বৃহৎ ঘটনা বা বিরল দৃশ্যকে অবলম্বন করিয়া নয়

ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম, ওই শূন্য মাঠ,
ওই খেয়াঘাট,
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখি কাকলি-কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা— সেই সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি।
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো, এই হাওয়া,
এইমতো অস্ফুটধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ-বেদনায় এ জীবন বারে বারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

—বলাকা

এই পথেই আসিয়াছে গানও ধর্মও। পরমবিস্ময় রূপের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে অরূপের বীণা, সীমার মধ্যে আনিয়া দিয়াছে অসীমের লীলা, সান্তের মধ্যে আনিয়া দিয়াছে অনন্তের স্পর্শ। সেই অনন্তের স্পর্শকে রবীন্দ্রনাথ সুন্দরও বলিয়াছেন, সত্যও বলিয়াছেন। সুন্দরের পথ দিয়া তাই নিরন্তর সত্যের আনাগোনা, সত্যের স্পর্শেই আবার সুন্দরের অভিব্যক্তি। এই পরমবিস্ময় কবির হৃদয়ের তন্ত্রীগুলিকে কেবলই রম্যবীণার মত ঝঙ্কৃত করিয়া দিয়াছে; শৈশবাবধি চিত্তের এই রম্যবীণার ঝঙ্কার তাঁহার বিশ্বভুবনকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে; নিজের জীবনে এবং বিশ্বভুবনে তাই তিনি শুধু 'রূপের আড়ালে লুকিয়ে-বাজা' একটি

রম্যবীণার ঝঙ্কারই শুনিয়াছেন। একটি বিশেষ দিনের অভিজ্ঞতার কথা বলিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

"কাল সন্ধ্যা থেকে এই গানটি কেবলই আমার মনের মধ্যে ঝঙ্কৃত হচ্ছে—বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে। আমি কোনোমতেই ভুলতে পারছি নে—

বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।
অমল কমল-মাঝে, জ্যোৎস্না রজনী-মাঝে,
কাজল ঘন-মাঝে, নিশি-আঁধার মাঝে,
কুসুমসুরভি-মাঝে, বীণ-রণন শুনি যে—
প্রেমে প্রেমে বাজে।

কাল রাত্রে ছাদে দাঁড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে চেয়ে আমার মন সম্পূর্ণ স্বীকার করেছে 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে।' এ কবিকথা নয়, এ বাক্যালঙ্কার নয়—আকাশ এবং কালকে পরিপূর্ণ করে অহোরাত্র সঙ্গীত বেজে উঠেছে।...

এই প্রকাণ্ড বিপুল বিশ্ব-গানের বন্যা যখন সমস্ত আকাশ ছাপিয়ে আমাদের চিত্তের অভিমুখে ছুটে আসে তখন তাকে এক পথ দিয়ে গ্রহণ করতেই পারি নে, নানা দ্বার খুলে দিতে হয় চোখ দিয়ে, কান দিয়ে, স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে, নানা দিক দিয়ে তাকে নানারকম করে নিই। এই একতান মহাসঙ্গীতকে আমরা দেখি, শুনি, ছুঁই, শুঁকি, আস্বাদন করি।"

এই রম্যবীণার ধ্বনিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্যও আসিয়াছে, সুন্দরও আসিয়াছে; কোনো এক বিশেষ দিনেই আসে নাই, অল্পবিস্তর জীবনের প্রতিদিনেই আসিয়াছে; আর তাহাকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছেন সমগ্র সত্তা দিয়া; তাহাকে প্রতিদিন চোখ দিয়া দেখিয়াছেন, কান দিয়া শুনিয়াছেন, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা ঘ্রাণ করিয়াছেন, স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই, সত্য রবীন্দ্রনাথের কাছে কোনোদিনই একেবারে কাটাছাঁটা একটি অনড়

সিদ্ধান্ত নহে, সত্য কোনোদিন তাঁহার নিকটে 'মতবাদে'র কঠোর রূপ ধারণ করে নাই। আজীবন অভিজ্ঞতায় ও অনুভূতিতে সে সত্য সমগ্র জীবন ব্যাপিয়া কেবলই হইয়া উঠিয়াছে। অনন্ত বিচিত্রানুভূতির সমগ্রতা লইয়াই সত্য তাঁহার কাছে সত্য। অনুভূতি বিচিত্র — কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও তিনি একটি ঐক্য অনুভব করিয়াছেন, তাঁহার মতে এইখানেই সত্যের যাথার্থ্য। অনুভূতির মধ্যে এই ঐক্যলাভের জন্য অনুভূতির সকল বিচিত্রতার রং-রেখা খাঁজ-কোণ প্রভৃতিকে ঘষিয়া মাজিয়া বা সাধারণীকারক বুদ্ধির শান লাগাইয়া এক ছাঁচের সাদা-মাটা করিয়া লইবার কোনো প্রয়োজন হয় নাই। পাঠকের পক্ষেও এই ঐক্যকে তাই সবটা মনে মনে গ্রহণ করিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু বিশেষ মতবাদরূপে তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলেই বিপত্তি দেখা দেয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলিয়াছেন, দীর্ঘজীবনের প্রতিদিবসের ভিতর দিয়া তিনি নিজেও নিরন্তর 'হইয়া উঠিয়াছেন'—তাঁহার সত্যও তাঁহার ভিতরে প্রতি-দিনের অভিজ্ঞতা অনুভূতিতে হইয়া উঠিয়াছে—

"আমার জীবন তাহার ধর্মকে লাভ করিয়াছে একটা বাড়িয়া উঠিবার প্রবাহের ভিতর দিয়া, কোনো উত্তরাধিকারের ভিতর দিয়াও নয়, বাহির হইতে আমদানির দ্বারাও নয়। — *The Religion of Man*, ষষ্ঠ অধ্যায়।

"সব-কিছুর ভিতর দিয়াই যে একই বিষয়বস্তু প্রকাশ লাভ করিয়াছে, তাহাতেই আমার নিকট প্রমাণিত হইয়াছে যে 'মানুষের ধর্ম' আমার মনের মধ্যে একটা ধর্মের অনুভূতিরূপেই দিনে দিনে গড়িয়া উঠিয়াছে, কোনো দার্শনিক বিষয়বস্তুরূপে গড়িয়া ওঠে নাই। বস্তুত, আমার অপরিণত যৌবনের প্রথম দিককার রচনাগুলি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্তের রচনাসমূহের একটা মস্তবড়ো অংশের ভিতরেই এই গড়িয়া উঠিবার প্রায় একটা অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আজ আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, আমার সকল আরব্ধ কর্ম এবং উচ্চারিত বাণী—ইহারা সকলই আমার একটা প্রেরণার ঐক্যে গভীরভাবে বাঁধা রহিয়াছে; এই ঐক্যের ঠিক ঠিক

সংজ্ঞা যে কি তাহা আমার নিজের কাছেও অনেক সময় অজ্ঞাত রহিয়াছে।"

—*The Religion of Man*, প্রাক্‌কথন।

এই কথাটাকেই অন্যত্র এইভাবে বলিয়াছেন—

"ঠিক যাকে সাধারণে ধর্ম বলে, সেটা যে আমি আমার নিজের মধ্যে সুস্পষ্ট দৃঢ়রূপে লাভ করতে পেরেছি, তা বলতে পারি নে। কিন্তু মনের ভিতরে ভিতরে ক্রমশ যে একটা সজীব পদার্থ সৃষ্ট হয়ে উঠেছে, তা অনেক সময় অনুভব করতে পারি। বিশেষ কোনো-একটা নির্দিষ্ট মত নয়—একটা নিগূঢ় চেতনা একটা নূতন অন্তরিন্দ্রিয়। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমি ক্রমশ আপনার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারব,— আমার সুখদুঃখ, অন্তর-বাহির, বিশ্বাস-আচরণ, সমস্তটা মিলিয়ে জীবনটাকে একটা সমগ্রতা দিতে পারব।"

—আত্মপরিচয় গ্রন্থে উদ্ধৃত চিঠি।

এইখানেও আবার তাই দেখিতে পাই উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের ধাতুগত মিল। বিস্ময়ে জিজ্ঞাসায় অনুভূতিতে যে সত্যকে পাওয়া যাইতেছে তাহার মধ্যে ঐক্যকে বেশ বোঝা যাইতেছে, কিন্তু তাহাকে দার্শনিক মতবাদের কোনো বিশেষ খাঁচায় পূরিতে গেলেই টানিয়া ছিঁড়িয়া ছাঁটিয়া কাটিয়া দুমড়াইয়া বাঁকাইয়া অত্যাচার করিতে হইতেছে। ন্যায়-শাসিত দার্শনিকতার নাগপাশ হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া চিত্তকে যদি সহজভাবে পাতিয়া দেওয়া যায়, উপনিষদের বাণী ও রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা দুইই যোগ্য আসন অধিকার করিয়া বসিতে পারে।

॥ ৩ ॥

উপনিষদের বাণী কি ? 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ'। জগতে যাহা কিছু চলমান পরিবর্তনশীল বিকারশীল তাহার সব কিছুই যে এক পরমসত্যের দ্বারা আবৃত অর্থাৎ বিধৃত এবং পরিচালিত, সেই কথাটিই উপলব্ধি করিতে হইবে। এই যে বহুর মধ্যে ব্যাকৃত বিশ্বসৃষ্টি ইহাকে চঞ্চল বা বিকারশীল বলিয়া ধিকৃত করিতে হইবে না, তাহাকে গ্রহণ করো, ভোগ করো— কিন্তু 'ত্যক্তেন', ত্যাগের দ্বারা। কোন্ ত্যাগের দ্বারা ? যে বোধের দ্বারা 'সব-কিছু' যে একের মধ্যে বিধৃত হইয়া এক হইয়া আছে এই চেতনা আচ্ছন্ন হইয়া আছে সেই চিত্তাবরক বোধের ত্যাগের দ্বারা। চিত্তের সেই আবরণ দেশ-কালে অবচ্ছিন্ন একটি অহংকে জাগ্রত করিয়া রাখিতেছে, সেই অহং-এর ধর্মই হইল বিশ্বপ্রবাহের অখণ্ড সত্য হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা ও 'ইদং সর্বং'-এর ভিতরকার সব-কিছুকেও পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখা। প্রথমে এই পরস্পর-ব্যবচ্ছেদক 'অহং'টিকে ত্যাগ করিতে হইবে ; এই 'অহং'এর আবরণমুক্ত হইলেই দেখা যাইবে, আমার সকল সত্তা চৈতন্য ও আনন্দকে বিধৃত করিয়া রহিয়াছে যে সত্য সেই সত্যই বিরাজমান সুদূর আকাশে স্থিত ঐ জ্যোতির্ময় আদিত্যে। 'অহং' চারিদিকে কেবল সৃষ্টি করে সোনার আবরণ, সেই সোনার আবরণের দ্বারাই আবৃত হইয়া থাকে সত্যেরও মুখ ; সেই আবরণ অপসারিত হইলেই দেখা যাইবে ঐ সূর্যের মধ্যে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ— আমিই সেই। ঐ যে দ্যুলোকের সূর্য-চন্দ্র-তারকা, অন্তরিক্ষের বিদ্যুৎ, ভূলোকের অগ্নি— ইহার কিছুই আপনা-আপনি ভাসমান নয়, সকলের অন্তর্নিহিত এক সত্যই শুধু

ভাসমান— সেই একের ভাসকে অবলম্বন করিয়াই অপর সকলে দীপ্তিমান। আবার যে ভাস ঐ সূর্যের মধ্যে, চন্দ্র-তারকার মধ্যে, বিদ্যুতের মধ্যে, অগ্নির মধ্যে— সেই ভাসই সক্রিয় ব্যক্তির মধ্যে, তাহার ইন্দ্রিয়ে তাহার চিত্তে তাহার বুদ্ধিতে তাহার আত্মার আনন্দে জ্যোতিতে।

একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যে ঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥
নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যে ঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥

—কঠ, ২।২।১২-১৩

যিনি সর্বভূতের অন্তরাত্মা সর্বনিয়ন্তা একস্বরূপ, সেই একই তাঁহার এক রূপকে বহুধা করিয়া দিতেছেন; সেই একই সকল অনিত্যের ভিতরে নিত্য, চেতনগণের চেতন, সেই একই বহুর কামনার বিধান করিতেছেন; সেই একে কোথায় দেখিতে হইবে? 'আত্মস্থং', নিজের মধ্যে। কাঁহারা নিজের মধ্যে সেই একে দেখিতে পারেন? যাঁহারা ধীর তাঁহারা। ধীর কাঁহারা? 'অহং'-এর আবরণাত্মক সকল ভেদচাঞ্চল্য যাঁহাদের হৃদয় হইতে ঘুচিয়া গিয়াছে। 'অহং' চলিয়া গেলেই 'ইদং'ও চলিয়া যায়, তখন 'সর্বমিদং' সেই একের মধ্যে তাৎপর্য লাভ করে। মুণ্ডক উপনিষদের মধ্যে (২।২।৫) তাই দেখিতে পাই, এক দিকে যাঁহার মধ্যে দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ মিলিয়া রহিয়াছে, অন্য দিকে যাঁহার মধ্যে সকল প্রাণের সঙ্গে মন সমর্পিত হইয়া আছে, সেই 'এক'কেই জানিতে হইবে। কিরূপে কোথায় সেই একে 'তমেবৈকং'

জানিতে হইবে? 'আত্মানম্', আত্মরূপে নিজের মধ্যে অবস্থিতরূপে জানিতে হইবে। এখানে তাহা হইলে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি, আত্মার মধ্যে আত্মার সহিত অভিন্ন করিয়া যে 'এক'কে জানিতে হইবে তাহার ভিতরে এক দিক হইতে মিশিয়া গিয়াছে সকল বেদ্য, অপর দিক হইতে মিশিয়া নিঃশেষে বিলীন হইয়া গিয়াছে বেত্তা। মাণ্ডূক্যে (২) বলা হইয়াছে 'সর্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম ; অয়মাত্মা ব্রহ্ম', এই সকলও, অর্থাৎ বহির্বিশ্বের সব কিছুই ব্রহ্ম, আর ভিতরের এই আত্মাও ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয়ে (৩।১০।৪) বলা হইয়াছে, 'স যশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ।' 'সেই যিনি এই পুরুষে, আর সেই যিনি ঐ আদিত্যে—তিনি উভয়ত্রই এক।' উপনিষদের সর্বত্রই এইরূপ বর্ণনা। এক দিকে যেমন দেখি, 'যে দেবতা অগ্নিতে জলেতে, যিনি বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট, যিনি ওষধিতে যিনি বনস্পতিতে সেই দেবকে বারংবার নমস্কার।' (শ্বেতাশ্বতর, ২।১৭) ; ইহার সঙ্গেই দেখিতে পাই, 'এক দেবতা সর্বভূতের মধ্যে রহিয়াছেন গূঢ় হইয়া, তিনি সর্বব্যাপী, সর্বভূতের অন্তরাত্মা ; তিনিই সকল কর্মের অধ্যক্ষ, সর্বভূতের নিবাসস্থল, সাক্ষিস্বরূপ, চৈতন্যদায়ক, কেবল এবং নির্গুণ।' (শ্বেতাশ্বতর, ৬।১১)

ছান্দোগ্য-উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'যিনি সর্বকর্মা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্বরস, যিনি এই সকল পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, যিনি বাক্-রহিত উদাসীন— তিনিই আমার আত্মা, তিনিই আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে—এই-ই ব্রহ্ম।' (৩।১৪।৪)। আবার বলা হইয়াছে, 'তমসার পরে যে শ্রেষ্ঠ জ্যোতি সেই জ্যোতিকে নিজের মধ্যে দেখিতে পাইয়া দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান্ সূর্যকে লাভ করিয়াছি— উত্তম এই জ্যোতি, উত্তম এই জ্যোতি।' (৩।১৭।৭)। উদ্দালক আরুণি-পুত্র শ্বেতকেতুকে ব্রহ্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতে গিয়া একটি ন্যগ্রোধবীজকে ভাঙিয়া তাহার সূক্ষ্মতম অংশকে লইয়াও বলিয়াছিলেন, 'স য এষো হণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎ সত্যং স

আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।' (৬।১২।৩)। 'এই যে এই অণিমা—ইহাই (পরিদৃশ্যমান) এই সকলের আত্মা; ইহাই সত্য, সে-ই আত্মা, তুমিই সেই, হে শ্বেতকেতু।' বৃহদারণ্যক-উপনিষদে (১।৪।১০) বলা হইয়াছে, 'এইজন্য এখনও যিনি এইরূপ জানেন যে 'আমিই ব্রহ্ম' তিনি এই সব হন,'— য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি। বৃহদারণ্যকের সুপ্রসিদ্ধ 'মধুবিদ্যা'র (২।৫) মধ্যে দেখিতে পাই, 'এই পৃথিবী সমুদায় ভূতের মধু, সর্বভূত (ও) এই পৃথিবীর মধু। এই পৃথিবীতে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এবং এই দেহে যে তেজোময় অমৃতময় শারীর পুরুষ— এই (উভয়েই) তাহা, যাহা হইল এই আত্মা। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, ইহাই এই সবকিছু।' এইরূপে দেখিতে পাই, যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ রহিয়াছেন জলের মধ্যে, অগ্নির মধ্যে, বায়ুর মধ্যে, আদিত্যের মধ্যে, দিক্‌সমূহের মধ্যে, চন্দ্রের মধ্যে, বিদ্যুতের মধ্যে, মেঘগর্জনের মধ্যে, আকাশের মধ্যে, ধর্মের মধ্যে, সত্যের মধ্যে—সেই একই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ রহিয়াছেন এই দেহের মধ্যে; ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম— ইহাই এই যাহা-কিছু তাহার সব। আবার বৃহদারণ্যকে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য যেখানে গৌতমের নিকটে অন্তর্যামী আত্মার বর্ণনা করিয়াছেন (৩।৭) সেখানেও পৃথিবী দিয়া বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে— 'যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা অন্তর্যাম্যমৃতঃ।' 'যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে পৃথক্, যাঁহাকে পৃথিবী জানে না, অথচ পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর ভিতরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন ইনিই তোমার আত্মা—তিনি অন্তর্যামী, তিনি অমৃত।' এইরূপে যিনি জলে, অগ্নিতে, অন্তরিক্ষে, বায়ুতে, দ্যুলোকে, আদিত্যে, দিক্‌সমূহে, চন্দ্রতারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে—ইহার সব-কিছুর ভিতরে থাকিয়াও ইহার সব-কিছু হইতে পৃথক্,

এই সব-কিছুই যাঁহাকে জানে না, অথচ এই সব-কিছুই যাঁহার শরীর, এবং এই সকলের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি ইহার সব-কিছুই নিয়মিত করিতেছেন তিনিই হইলেন প্রত্যেক জীবেরও আত্মা— ইনিই সর্বান্তর্যামী, ইনিই অমৃত।

অমৃত কামনা করিয়াছিলেন যে মৈত্রেয়ী তাঁহাকে উপদেশ দিতে গিয়া যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন (বৃহদারণ্যক, ৪।৫।৬), পতির কামনায় পতি প্রিয় হয় না, জায়ার কামনায় জায়া প্রিয় হয় না, পুত্রের কামনায় পুত্র প্রিয় হয় না— এইরূপ বিত্ত পশু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় লোকসমূহ দেবগণ বেদসমূহ ভূতসমূহ— ইহার কিছুর জন্যই কিছু প্রিয় হয় না, আত্মার কামনায়ই সব-কিছু প্রিয় হয়। সুতরাং— 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়্যাত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাত ইদং সর্বং বিদিতম্।' 'এই আত্মাই দ্রষ্টব্য শ্রোতব্য, ইহারই মনন করিতে হইবে, নিদিধ্যাসন করিতে হইবে। হে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাকে দর্শন শ্রবণ মনন করিলে এবং বিশেষভাবে জ্ঞাত হইলে এই সকলই বিদিত হয়।' এই প্রসঙ্গে আরো বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে, ব্রাহ্মণ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এইরূপে যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়কে লোকসমূহকে দেবগণকে বেদসমূহকে ভূতসমূহকে, যে ব্যক্তি সমুদায় বস্তুকে আত্মা হইতে পৃথক্ মনে করে— ইহার সমুদায় বস্তুই তাহাকে পরিত্যাগ করে। ইহার সবই আত্মা— এ কথা যে জানে সে ইহার সকলকেই জানে সকলকেই পায়।

'অহং'-এর সঙ্গে 'একে'র যখন তাদাত্ম্য ঘটিল তখন 'অহং' আর ব্যক্তিকেন্দ্রে অবচ্ছিন্ন অল্প বা ক্ষুদ্র আমি নয়; 'অহং' সেখানে ভূমা— 'অহং' সেখানে সর্বব্যাপী 'অহং'। তৈত্তিরীয়ের এক স্থানে (১।১০) এই 'এক'-তাদাত্ম্যের পরে নির্ভীক উদাত্ত উচ্চারণ দেখিতে পাই— 'অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি।' 'আমিই হইলাম সংসারবৃক্ষের

প্রেরয়িতা। আমার কীর্তি পর্বতের পৃষ্ঠের স্থায় সমুন্নত। আদি কারণে আমার সত্তা ও স্মৃতি। সূর্যের মধ্যে রহিয়াছে যেমন সু-অমৃত, আমিও সেইরূপ।' তৈত্তিরীয়ের অন্যত্র (৩।১০।৬) বলা হইয়াছে, 'আমিই হইলাম প্রথমজ, আমি মূর্তামূর্ত জগতের এবং সকল দেবগণের পূর্ববর্তী। আমাতেই অমৃতের নাভি অর্থাৎ প্রতিষ্ঠা।' এখানে ভাবটি হইল এই, 'একে'র সঙ্গে যোগে এবং সেই অদ্বয়-প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া 'ইদং সর্বং'-এর সঙ্গে যোগে 'আমি' বৃহত্তম মহত্তম; সেই যোগ হইতে বিচ্যুত আমি ক্ষুদ্র, আমি মর্ত্য, আমি ক্ষয্য, আমি অসত্য।

আমরা উপরে উপনিষদের বাণীর যে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলাম ইহা হইতে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হইয়া ওঠে। প্রথমতঃ, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুইটি সত্তা রহিয়াছে, একটি তাহার নিত্যকালের 'অহং', যেটি তাহার আত্মা, তাহার অমৃতরূপ, তাহার শাশ্বতরূপ; অপরটি তাহার দেশ-কালে অবচ্ছিন্ন একটি ক্ষুদ্র 'অহং,' প্রাত্যহিকতার দ্বারা যে আবৃত এবং ক্লিন্ন; সে বৃহৎ হইতে সমগ্র হইতে নিজেকে সঙ্কুচিত রাখে, ভেদবুদ্ধিদ্বারা নিজেকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে, সেই ভেদাত্মক আত্মকেন্দ্রিকতা হইতে আসে যত পাপ, মানুষ হয় গৃধ্নু। কোথাও উপনিষদে এই দুইটি 'অহং'কে দুইটি পাখী বলা হইয়াছে, একই দেহবৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া এই দুইটি পাখী অবস্থান করে; একটি গাছের স্বাদু ফল খায়, অপরটি ফল না খাইয়া শুধু তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। ইহার একটি পাখী আত্মা, অপরটি জীব। জীবরূপে খণ্ড ক্ষুদ্র মর্ত্য 'অহং'-এর প্রকাশ; সেই অংশটা খসিয়া গেলেই অমৃত আত্মার স্পর্শ। চিত্তবিশুদ্ধি দ্বারা লাভ করিতে হয় সত্যের অনুভূতি; চিত্তবিশুদ্ধির প্রধান কথাই হইল, মর্ত্য 'অহং'-এর সর্বপ্রকার আবরণ-ক্লিন্নতা হইতে মুক্ত হওয়া।

দ্বিতীয়তঃ দেখিতে পাইলাম, উপনিষদের মধ্যে নানাভাবে এই একটি বিশ্বাস গড়িয়া উঠিয়াছিল যে দ্যুলোক অন্তরিক্ষ এবং ভূলোক

জুড়িয়া জড় ও চেতনের যত বিকাশ ও লীলা— ইহার সব জুড়িয়া অনন্ত কালে অনন্ত দেশে রহিয়াছে একটিমাত্র প্রবাহ ; সকল ধারা মিলিয়া বিশ্বপ্রবাহ এক এবং অখণ্ড।

তৃতীয়তঃ দেখি, এই এক বিশ্বপ্রবাহের পিছনে যে সত্য রহিয়াছে তাহাও অনাদি অসীম অনন্ত সর্বব্যাপী 'এক'। সেই একেই সকল বিধৃত, এবং সেই এককে জানিলেই সব-কিছু জানা হয়।

চতুর্থতঃ, আমার ভিতরকার মর্ত্য, ক্ষয্য 'আমি'টি দূর হইয়া গেলে আমার ভিতরে যে শাশ্বত সত্যকে আত্মারূপে অনুভব করি, সেই আত্মা সর্বব্যাপী একের সঙ্গে অভিন্ন। সুতরাং যে আত্মাকে লাভ করে, সে সেই পরম একককে লাভ করে ; যে সেই পরম একককে লাভ করে সে সেই একের ভিতর দিয়া 'ইদং সর্বং'কেই লাভ করে— সে 'ইদং সর্বং'ই হইয়া যায়।

পঞ্চমতঃ, এই একের ভিতরে যে মানুষের নিত্য অবস্থিতি এইখানেই মানুষের অমৃতত্ব অমরত্ব।

ষষ্ঠতঃ, মানুষ যেখানে পরমঅদ্বয়যোগে প্রতিষ্ঠিত সেখানে সে যে 'অহং'কে লাভ করে সে 'অহং' পরম মহিমায় মহিমান্বিত, সে 'অহং' বিশ্বভুবন ব্যাপ্ত।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, উপনিষদের বাণীগুলিকে মোটামুটি বিশ্লেষণ করিয়া যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে তাহাদিগকে এখানে উপস্থিত করিলাম, এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উপস্থাপিত হইবার মত সেগুলি পরস্পরবিশ্লিষ্ট নয়, প্রত্যেক কথাই প্রত্যেক কথার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ; শুধু আলোচনার সুবিধার জন্যই আমরা উপনিষদের প্রতিপাদ্যগুলিকে এইভাবে ভাগ করিয়া লইলাম।

উপনিষদের বাণীর যে-সকল দিকের কথা পূর্বে উল্লেখ করিলাম তাহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কোথায় মিল, এক-এক করিয়া তাহার আলোচনা করা যাইতে পারে। এই তুলনাত্মক আলোচনার ক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত একটি কথার পুনরুল্লেখ করিয়া লইতে চাই। উভয়ের ভিতরে যেখানে যত মিল দেখা যাইবে তাহার সবটাই রবীন্দ্রনাথের উপরে উপনিষদের প্রভাব—এই দৃষ্টিতে জিনিসটিকে গ্রহণ করিতে যাওয়া ঠিক হইবে না। পূর্বেই বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিমন গড়িয়া উঠিবার কাজে উপনিষদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাবকে কোনো অংশেই খর্ব করিতে চাহিতেছি না; কিন্তু তাহা খর্ব না করিয়াও বিষয়টিকে দেখিবার যে আরো একটি মস্তবড় দিক্ রহিয়াছে তাহার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে; ইহা হইল মানসিক কাঠামোর মিল, যাহাকে আমি ধাতুগত মিল বলিয়াছি। আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যদি ছেলেবেলা হইতে অমন করিয়া উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত না হইতেন, সারা জীবন উপনিষদের রসে দেহ-মনকে যেভাবে 'ভাবনা' দিয়াছেন তাহা নাও দিতেন তবুও রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে ও অন্যান্য লেখায় এমন অনেক উপাদান পাইতে পারিতাম যাহার সঙ্গে উপনিষদের নিগূঢ় মিল আমাদিগকে আশ্চর্য করিয়া দিত। মিলের এই দিকটিকেই আমি গভীরতর মিল বলিয়াছি। *The Religion of Man* গ্রন্থের একটি ভাষণে রবীন্দ্রনাথ অতি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে তাঁহার ধর্ম-বিশ্বাস তাঁহার নিজের বিশেষ প্রকৃতি হইতেই প্রসৃত হইয়াছে।

"ইহা বাল্যকাল হইতেই আমার প্রকৃতির ধারাকে অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে; তাহার পরে সহসা একদিন ইহা একটা প্রত্যক্ষ উপলব্ধির ভিতর

দিয়া আমার মানসে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।" It has followed the current of my temperament from early days until it suddenly flashed into my consciousness with a direct vision.

—প্রথম অধ্যায়

(উপনিষদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখিতে পাই মানুষের মধ্যে তাহার দ্বৈত সত্তা—একটি আত্মা, অপরটি হইল এই আত্মার সহচর 'অহং'; একদিকে তাহাকে বলা চলে আত্মার বহিশ্চর রূপ, কারণ তাহা আত্মাকে অবলম্বন করিয়াই দেশে কালে বার বার উদ্‌ভূত হইতেছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'শান্তিনিকেতনে'র 'নদী ও কূল' শীর্ষক লেখায় বলিয়াছেন—

"অমর আত্মার সঙ্গে এই মরণধর্মী অহংটা আলোর সঙ্গে ছায়ার মতো যে নিয়তই লেগে রয়েছে। শিক্ষার দ্বারা, অভ্যাসের দ্বারা, ঘটনাসংঘাতের দ্বারা, স্থানিক এবং সাময়িক নানা প্রভাবের দ্বারা, শরীর মন হৃদয়ের প্রকৃতিগত প্রবৃত্তির বেগের দ্বারা অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুলছে এবং কেবলই এই সংস্কার দেহটির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, আমাদের আত্মার নামরূপময় একটি চিরচঞ্চল পরিবেষ্টন তৈরি করছে।"

এই আত্মাকে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন নদীর চিরন্তন ধারা, অহং হইল দেশে দেশে কালে কালে যত রকমের আবর্জনার স্তূপকে লইয়া গড়িয়া-ওঠা নিয়তপরিবর্তনশীল চরের মত, এ চর নদীর চিরন্তন আনন্দস্রোতে কেবলই বাধার সৃষ্টি করিতে চাহে। অন্যত্র ('আত্মার প্রকাশ', শান্তিনিকেতন) তিনি বলিয়াছেন—

"আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটি বৈপরীত্য আছে। আত্মা ন জায়তে ম্রিয়তে। না জন্মায় না মরে। অহং জন্মমরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অন্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে।"

'শান্তিনিকেতনে'র 'জাগরণ' প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

"তা হলে দেখা যাচ্ছে এই-যে আমিত্ব ব'লে একটি জিনিস, এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত-কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানছি যে আমি আছি-

এই জানাটি যেখানে জাগছে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমিই হচ্ছি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।"

উপনিষদের মতন রবীন্দ্রনাথও এই কথা বার বার করিয়া বলিয়াছেন এই যে ক্ষুদ্র অহং ইহা আত্মধর্মেই নিত্য পরস্পরব্যবচ্ছেদক, অর্থাৎ জগতের যেখানে যাহা কিছু তাহার প্রত্যেকটিকে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চায়, আর নিজেকেও রাখিতে চায় বিশ্ব-সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া। এই 'অহং'-এর কাজ কেবল আবরণ-পাত্র সৃষ্টি করিয়া সত্যের মুখ আবৃত করিয়া রাখা, সে পাত্র একান্ত স্থূল ব্যাবহারিক জীবনের পঙ্কপ্রলেপযুক্ত পাত্রও হইতে পারে, ঝক্‌ঝকে বুদ্ধিদ্বারা রচিত সোনার পাত্রও হইতে পারে। সত্যের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইলে, সত্যের প্রত্যক্ষ স্পর্শ লাভ করিতে হইলে এই সঙ্কোচনধর্মী 'অহং-এর হাত হইতে প্রথমে নিজেকে মুক্ত করিতে হইবে। এই মুক্তি লাভ করিতে পারিলেই দেখা যায়, সত্য স্বপ্রকাশ, তাহাকে আর খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় না; যাহা কিছু সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইতেছে তাহার ভিতর দিয়াই সত্য আবির্ভূত হইতেছে, চিত্তকে আলোকে আনন্দে উদ্‌ভাসিত করিয়া দিতেছে। এই কথাটাকে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন কালে নানারকম করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার ভাষণে, দেশে এবং বিদেশে; এই কথাটা নানারকম করিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখা দিয়াছে তাঁহার বিভিন্ন বয়সের কবিতায়— বিশেষ করিয়া তাঁহার শেষের দিকের কবিতায়। উপনিষদের 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' কথাটির ভিতরকার ত্যাগ শব্দকে রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই ব্যাখ্যা করিয়াছেন সঙ্কোচনধর্মী ভেদধর্মী অহংকে ত্যাগ করিবার সত্য রূপে। 'মানুষের ধর্মে'র এক স্থানে কবি তাঁহার একটি শৈশবস্মৃতি বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—

"সেই ভোরে উঠে একদিন চৌরঙ্গির বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম। তখন ওখানে ফ্রি ইস্কুল বলে একটা ইস্কুল ছিল। রাস্তাটা পেরিয়েই ইস্কুলের হাতাটা দেখা যেত। সেদিকে চেয়ে দেখলুম, গাছের আড়ালে সূর্য উঠছে। যেমনি সূর্যের আবির্ভাব হল গাছের অন্তরাল থেকে, অমনি মনের পরদা খুলে গেল। মনে হল, মানুষ আজন্ম একটা আবরণ নিয়ে থাকে। সেটাতেই তার স্বাতন্ত্র্য। স্বাতন্ত্র্যের বেড়া লুপ্ত হলে সাংসারিক প্রয়োজনের অনেক অসুবিধা। কিন্তু, সেদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার আবরণ খসে পড়ল। মনে হল, সত্যকে মুক্ত দৃষ্টিতে দেখলুম। মানুষের অন্তরাত্মাকে দেখলুম। দুজন মুটে কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে চলেছে। তাদের দেখে মনে হল, কী অনির্বচনীয় সুন্দর। মনে হল না, তারা মুটে। সেদিন তাদের অন্তরাত্মাকে দেখলুম, যেখানে আছে চিরকালের মানুষ।"

গদ্য লেখায় রবীন্দ্রনাথ যে কথাকে স্থানে স্থানে উপস্থিত করিয়াছেন খানিকটা তত্ত্বরূপে, কবিতার মধ্যে তাহাকে প্রকাশ করিয়াছেন কবি-অনুভূতিরূপে। সেই কবি-অনুভূতি তাঁহার সত্যানুভূতি। অহং সম্বন্ধে কবির এই মনোভাব কোনো এক সময়ে স্পষ্ট তত্ত্বরূপে কবির কাছে প্রতিভাত হয় নাই। 'প্রভাতসংগীতে'র কবিতায় যখন কবির 'অস্ফুটবাক্ মন বিনা চেষ্টায় যেমন ক'রে পারে ভাবকে ব্যক্ত করেছে' সেখানেও দেখিতে পাই কবিচিত্তের বিজড়িত অস্পষ্ট ভাবোচ্চারণের মধ্যেও এই দুই 'অহং'-এর অনুভূতি ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁহার 'মানুষের ধর্মে'র মধ্যে প্রভাতসংগীত হইতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি দিয়া সে সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—

"জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি রয়েছি বাঁধা।
রয়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,
ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ-'পরে।

এইটেই হচ্ছে অহং, আপনাতে আবদ্ধ, অসীম থেকে বিচ্যুত হয়ে, অন্ধ

হয়ে থাকে অন্ধকারের মধ্যে। তারই মধ্যে ছিলুম, এটা অনুভব করলুম। সে যেন একটা স্বপ্নদশা।

গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ একেলা গাহিছে গান ;
মিশিছে স্বপনগীতি বিজন হৃদয়ে মোর।

নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নের যে লীলা সত্যের যোগ নেই তার সঙ্গে। অমূলক, মিথ্যা, নানা নাম দিই তাকে। অহং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ যে জীবন সেটা মিথ্যা। নানা অতিকৃতি দুঃখ ক্ষতি সব জড়িয়ে আছে তাতে। অহং যখন জেগে উঠে আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে নূতন জীবন লাভ করে। এক সময়ে সেই অহং-এর খেলাঘরের মধ্যে বন্দী ছিলুম। এমনি করে নিজের কাছে নিজের প্রাণ নিয়েই ছিলুম, বৃহৎ সত্যের রূপ দেখি নি।”

এই অবস্থাকেই কবি ‘প্রভাতসংগীতে’র ‘আহ্বান-সংগীতে’ বর্ণনা করিয়াছেন ‘লুকায়, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে কেবলি কোটরে বাস।’ এই ক্ষুদ্র আমির কোটর হইতে কবির প্রথম মুক্তির বার্তা সহসা বাঁধভাঙা শতধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহারা ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে’। এই ‘নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে’র অনুভূতিকেই কবি বলিয়াছেন তাঁহার জীবনের প্রথম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কবি-অনুভূতি এবং অধ্যাত্ম-অনুভূতি। কিন্তু স্পষ্টতঃই এ অনুভূতি তাঁহার নিজস্ব অনুভূতি —ইহাতে কোনো উপনিষদের প্রভাব খুঁজিতে যাওয়া বৃথা ; অথচ ইহার ভিতরেই তাঁহার কবিমানসের অনেকখানি পরিচয় রহিয়াছে তাহাকেও উপেক্ষা করা যায় না।

‘কড়ি ও কোমলে’র ‘স্বপ্নরুদ্ধ’ কবিতায় কবির যে ক্রন্দন—

আমি গাঁথি আপনারি চারি দিক ঘিরে
সূক্ষ্ম রেশমের জাল কীটের মতন।
মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।
কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি,
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

এ ক্রন্দনও সেই আমির মধ্যে বন্ধনের ক্রন্দন ; ইহার মধ্যে এখন পর্যন্ত স্পষ্ট অধ্যাত্মচেতনার যোগ ঘটে নাই, কিন্তু কবির অধ্যাত্ম-জীবনবোধের সঙ্গে এ ক্রন্দন নিবিড়ভাবে যুক্ত, ইহাকে তাই বলিতে পারি তাঁহার অধ্যাত্মজীবনেরই 'অবোধপূর্ব' ক্রন্দন।

শেষবয়সের কবিতাগুলির মধ্যে অধ্যাত্মচেতনা এবং তৎসঙ্গে উপনিষদের সুর স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষ বিশেষ কবি-অনুভূতির সহিত যুক্ত হইয়া প্রকাশ পাইলেও এখানে একটা সচেতনতাকে অস্বীকার করা যায় না। এই যুগে কবি অনেক সময়ই অনুভব করিয়াছেন, চেতনা যখন সর্ব-আবরণবিযুক্ত হইয়া একেবারে বিশুদ্ধ হইয়া ওঠে তখন ভুবনজোড়া বিশুদ্ধ আলো-প্রবাহের সহিত এই চেতনা-প্রবাহের কোনো পার্থক্য থাকে না। 'শ্যামলী'র 'কালরাত্রে' কবিতার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে কবির সেই অনুভূতির—

চেতনার সঙ্গে আলোর রইল না কোনো ব্যবধান।
প্রভাত-সূর্যের অন্তরে
দেখতে পেলেম আপনাকে
হিরণ্ময় পুরুষ ;
ডিঙিয়ে গেলেম দেহের বেড়া,
পেরিয়ে গেলেম কালের সীমা,
গান গাইলেম "চাইনে কিছু চাইনে",
যেমন গাইছে রক্তপদ্মের রক্তিমা,
যেমন গাইছে সমুদ্রের ঢেউ,
সন্ধ্যাতারার শান্তি,
গিরিশিখরের নির্জনতা।

আলোর স্পর্শে চেতনাকে এইরূপে নির্মল করিয়া লওয়া কবির ছিল একটি প্রাত্যহিক সাধনা। শৈশবে শীতের শেষরাত্রে কম্বল জড়াইয়াও তিনি কি করিয়া আসিয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে

বারান্দায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন অন্ধকারের যবনিকার আড়াল হইতে উদীয়মান নবীন সূর্যের আলোতে চেতনাকে জাগ্রত করিয়া লইবার জন্য তাহার বর্ণনা নিজেই করিয়া গিয়াছেন বহু প্রসঙ্গে। রাত্রির ঐ অন্ধকার যেন এই দেহকে অবলম্বন করিয়া এবং তাহার সঙ্গে যুক্ত একটা স্বার্থসঙ্কুচিত আমিকে অবলম্বন করিয়া ঘনীভূত হইয়া ওঠা আবরণ; তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছে আমাকেও— বিশ্বের দূর দূর স্থিত দিগ্‌বলয়কেও। আলোকস্নাত প্রভাতের আবির্ভাব সেই আবরণকে অপসারিত করিয়া, সকলের সঙ্গে এক হইয়া সত্য হইয়া উঠিবার আহ্বান লইয়া। এই 'আলোর মন্ত্রে'র দীক্ষা এবং চিরজীবন সেই আলোর মন্ত্রের সাধনার স্পষ্ট ইতিহাস কবি স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন তাঁহার 'পত্রপুটে'র কয়েকটি কবিতায়।—

বালক ছিলেম যখন
পৃথিবীর প্রথম জন্মদিনের আদি মন্ত্রটি
পেয়েছি আপন পুলককম্পিত অন্তরে,—
আলোর মন্ত্র।
পেয়েছি নারকেল-শাখার ঝালর-ঝোলা
আমার বাগানটিতে,
ভেঙে-পড়া শ্যাওলা-ধরা পাঁচিলের উপর
একলা ব'সে।
প্রথম প্রাণের বহ্নি-উৎস থেকে
নেমেছে তেজোময়ী লহরী,
দিয়েছে আমার নাড়ীতে
অনির্বচনীয়ের স্পন্দন।
আমার চৈতন্যে গোপনে দিয়েছে নাড়া
অনাদিকালের কোন্ অস্পষ্ট বার্তা,
প্রাচীন সূর্যের বিরাট বাষ্পদেহে বিলীন
আমার অব্যক্ত সত্তার রশ্মিস্ফুরণ।—১৫

কবির এই 'আলোর মন্ত্র' এবং সেই সাধনার রহস্য প্রকাশিত

হইয়াছে 'পূরবী'র সুপ্রসিদ্ধ 'সাবিত্রী' কবিতাটিতেও। 'পত্রপুটে'র ১০-সংখ্যক কবিতায় কবি শেষরাত্রির ধীরে ধীরে গলিয়া-পড়া অন্ধকারকে স্পষ্ট করিয়াই সমান করিয়া দেখিয়াছেন আত্মার আবরণ দেহবদ্ধ আমি রূপে।

এই দেহখানা বহন ক'রে আসছে দীর্ঘকাল
বহু ক্ষুদ্র মুহূর্তের রাগদ্বেষ, ভয়ভাবনা
কামনার আবর্জনারাশি।
এর আবিল আবরণে বারে বারে ঢাকা পড়ে
আত্মার মুক্তরূপ।...

প্রতিদিন যে প্রভাতে পৃথিবী
প্রথম সৃষ্টির অক্লান্ত নির্মল দেববেশে দেয় দেখা
আমি তার উন্মীলিত আলোকের অনুসরণ করে
অন্বেষণ করি আপন অন্তরলোক।...

আমিও প্রতিদিন উদয়দিগ্‌বলয় থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিচ্ছটায়
প্রসারিত ক'রে দিই আমার জাগরণ,
বলি—হে সবিতা,
সরিয়ে দাও আমার এই দেহ, এই আচ্ছাদন,—
তোমার তেজোময় অঙ্গের সূক্ষ্ম অগ্নিকণায়
রচিত যে-আমার দেহের অণুপরমাণু,
তারো অলক্ষ্য অন্তরে আছে তোমার কল্যাণতম রূপ,
তাই প্রকাশিত হোক আমার নিরাবিল দৃষ্টিতে।

'পত্রপুটে'র ছয়-সংখ্যক কবিতায়ও দেখি—

আপনাকে চেনার সময় পায় নি সে,
ঢাকা ছিল মোটা মাটির পর্দায়;
পর্দা খুলে দেখিয়ে দাও যে, সে আলো, সে আনন্দ,
তোমার সঙ্গে তার রূপের মিল।

'রোগশয্যায়' বসিয়াও কবির মনে হইয়াছে—

তখন সে বন্ধনের মুক্তক্ষেত্রে
যে চেতনা উদ্‌ভাসিয়া উঠে
প্রভাত-আলোর সাথে
দেখি তার অভিন্ন স্বরূপ।—৩৬

অনেক সময় কবি এই অনুভূতি লাভ করিয়াছেন চেতনার ঘনীভবনের দ্বারা। চেতনার সেই ঘনীভবন চিত্তে যে একতানতা আনয়ন করিয়াছে সেই একতানতাতেই চিত্ত বহিরাবরণ হইতে মুক্ত হইয়াছে। কবি ইংরেজি লেখায় এবং ভাষণেও বহু স্থানে deepening of the consciousness কথাটির উল্লেখ করিয়াছেন এবং deepening of the consciousness-এর ভিতর দিয়াই তিনি সকল অধ্যাত্মসত্যের স্পর্শ লাভ করিয়াছেন। এই-জাতীয় একটি চিত্তাবস্থানই প্রকাশ করিয়াছেন কবি 'পত্রপুটে'র সাত-সংখ্যক কবিতায়—

যে গভীর অনুভূতিতে নিবিড় হ'ল চিত্ত
সমস্ত সৃষ্টির অন্তরে তাকে দিয়েছি বিস্তীর্ণ ক'রে।
ঐ চাঁদ ঐ তারা ঐ তমঃপুঞ্জ গাছগুলি
এক হ'ল, বিরাট হ'ল, সম্পূর্ণ হ'ল
আমার চেতনায়।
বিশ্ব আমাকে পেয়েছে,
আমার মধ্যে পেয়েছে আপনাকে,
অলস কবির এই সার্থকতা।

এই ঘাটটিতে কবির মনের তার এমনভাবে বাঁধা হইয়া গিয়াছিল যে ঘুরিয়া-ফিরিয়া ঐ একই ঘাটে নানা ছলে আসিয়া তাঁহার সুর পৌঁছিত। পরবর্তী জীবনের কবিতায় ফাঁকে ফাঁকে এ সুরের প্রকাশ অতিসহজলক্ষ্য। এ যেন মুক্তিলোভী দুরন্ত বালকের মন, সুযোগ

পাইলেই গণ্ডি অতিক্রম করিয়া যতদূর খুশি বাহিরে চলিয়া যাইবার ইচ্ছা। বাহিরের প্রকৃতির ভিতর হইতে কোনো এক সাথী যেন একবার আসিয়া একটু ডাক দিলেই হইল—

মুক্তবাতায়নপ্রান্তে জনশূন্য ঘরে
বসে থাকি নিস্তব্ধ প্রহরে,
বাহিরে শ্যামল ছন্দে উঠে গান
ধরণীর প্রাণের আহ্বান ;
অমৃতের উৎসস্রোতে
চিত্ত ভেসে চলে যায় দিগন্তের নীলিম আলোতে।

—আরোগ্য, ৫

'প্রান্তিকে'র মধ্যে এই অনুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে ১২-সংখ্যক কবিতায়।—

আপনারে দেখি আমি আপন বাহিরে, যেন আমি
অপর যুগের কোনো অজানিত, সদ্য গেছে নামি
সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন ; অক্লান্ত বিস্ময়
যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়
পুষ্পলগ্ন ভ্রমরের মতো। এই তো ছুটির কাল,
সর্বদেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল,
নগ্ন চিত্ত মগ্ন হল সমস্তের মাঝে।

এই 'নগ্নচিত্ততা'ই হইল অহং হইতে মুক্তি ; 'সত্তা হতে প্রত্যহের আচ্ছাদন' যখন অপসারিত হইল এবং যখন 'সর্বদেহমন হতে ছিন্ন হল অভ্যাসের জাল' তখনই দেখা গেল, সত্য প্রতিভাত যাহা-কিছু সম্মুখে আসে তাহার সব-কিছুর ভিতর দিয়া— 'অক্লান্ত বিস্ময় যার পানে চক্ষু মেলি তারে যেন আঁকড়িয়া রয়' ; আর সত্যের অনুভূতি সেখানেই যেখানে এই প্রমাতৃ-স্বভাবের বিগলনের মধ্য দিয়া চিত্ত 'মগ্ন হল সমস্তের মাঝে'।

কবির এই-জাতীয় আর একটি অনুভূতি দেখিতে পাই 'রোগশয্যায়'-এর ২২-সংখ্যক কবিতায়—

আমার সত্তার আবরণ
খসে পড়ে গেল
অজানা নদীর স্রোতে
লয়ে মোর নাম, মোর খ্যাতি,
কৃপণের সঞ্চয় যা কিছু,
লয়ে কলঙ্কের স্মৃতি
মধুর ক্ষণের স্বাক্ষরিত

'জন্মদিনে'র ২৩-সংখ্যক কবিতায় বলিয়াছেন—

ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্তলোকের দ্বারে
নিদ্রায় জড়িত রাত্রিসম।
হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত।

আবার—

আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি
ম্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি,
লুপ্ত হয়ে যাক শূন্যতলে
দ্যুলোকের ভূলোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে।

—'জন্মদিন', ২৫

এই-জাতীয় অনুভূতির বর্ণনায় স্থানে স্থানে দেখিতে পাই, বাহিরের প্রকৃতি যেখানে তাহার রূপের বহুবৈচিত্র্য এবং শব্দের

বিভিন্ন ধারা একের মধ্যে সমাহিত করিয়া দিয়াছে সেখানে কবি নিজের বহিঃসত্তাকেও যেন হারাইয়া ফেলিয়াছেন, সেই বহিঃসত্তার বিলীনতার ভিতর দিয়া কবি এক সত্যের সঙ্গে আনন্দে আলোকে নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়াছেন। এ-জাতীয় একটি অনুভূতির চমৎকার বর্ণনা দেখিতে পাই প্রান্তিকের ৯-সংখ্যক কবিতায়—

দেখিলাম—অবসন্ন চেতনার গোধূলিবেলায়
দেহ মোর ভেসে যায় কালো কালিন্দীর স্রোত বাহি
নিয়ে অনুভূতিপুঞ্জ, নিয়ে তার বিচিত্র বেদনা,
চিত্র-করা আচ্ছাদনে আজন্মের স্মৃতির সঞ্চয়,
নিয়ে তার বাঁশিখানি। দূর হতে দূরে যেতে যেতে
ম্লান হয়ে আসে তার রূপ, পরিচিত তীরে তীরে
তরুচ্ছায়া-আলিঙ্গিত লোকালয়ে ক্ষীণ হয়ে আসে
সন্ধ্যা আরতির ধ্বনি, ঘরে ঘরে রুদ্ধ হয় দ্বার,
ঢাকা পড়ে দীপশিখা, নৌকা বাঁধা পড়ে ঘাটে।
দুই তটে ক্ষান্ত হল পারাপার, ঘনালো রজনী,
বিহঙ্গের মৌনগান অরণ্যের শাখায় শাখায়
মহানিঃশব্দের পায়ে রচি দিল আত্মবলি তার।
এক কৃষ্ণ অরূপতা নামে বিশ্ববৈচিত্র্যের 'পরে
স্থলে জলে। ছায়া হয়ে বিন্দু হয়ে মিলে যায় দেহ
অন্তহীন তমিস্রায়। নক্ষত্রবেদীর তলে আসি
একা স্তব্ধ দাঁড়াইয়া ঊর্ধ্বে চেয়ে কহি জোড় হাতে—
হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,
এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,
দেখি তারে যে-পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক।

এখানে দেহ বিলীন হইয়া যাওয়া শব্দের অর্থই হইল দেশ-কালে ধৃত প্রাত্যহিকের আবরণযুক্ত সত্তার বিলীন হইয়া যাওয়া। কবিতাটির মধ্যে বেশ লক্ষ্য করিতে পারি, একটি কবি-অনুভূতি স্তরে স্তরে অগ্রসর হইয়া কিভাবে একটি ধর্মানুভূতির রূপ লাভ করিতেছে।

গীতাঞ্জলির যুগে যেখানে 'সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে'র কথা দেখিতে পাই, অথবা দেখি—

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে হবে
হবে গো এইবার—
আমার এই মলিন অহংকার।

অথবা গীতালিতে দেখি—

আপন হতে বাহির হয়ে
বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের
পাবি সাড়া

অথবা—

এই আবরণ ক্ষয় হবে গো ক্ষয় হবে,
এ দেহ মন ভূমানন্দময় হবে।

সেখানে ইহা বিশেষ কোনো একটি কবি-অনুভূতির অপেক্ষা করে নাই; প্রচলিত বিশ্বাসপ্রবণতার পথেই এ-সব কথা দেখা দিয়াছে; কিন্তু পরবর্তী কালের কবিতায়—এ ক্ষেত্রে বিশ্বাসপ্রবণতার ভিতরেও কবি-অনুভূতির যোগ লক্ষণীয় হইয়া উঠিয়াছে।

॥ ৫ ॥

উপনিষদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথেও দেখিলাম, একটা বহিরাবরণের মত চারিদিক হইতে আমার স্বরূপকে আবৃত করিয়া থাকে যে স্থান-কালের সঙ্গে ভাসিয়া-বেড়ানো একটা অহং তাহা অপসারিত হইলে বা বিগলিত হইলেই আমার মধ্যে দেশকালাতীত যে অমৃত-স্বরূপ আমিকে বা আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় তাহাতেই ঘটে মানুষের সত্যপ্রতিষ্ঠা। এই সত্যপ্রতিষ্ঠায় আরো জানা গেল, আমার ভিতরকার জন্মজন্মান্তরের বহু নানাখানার ভিতর দিয়া সত্য বলিয়া উপলব্ধ হইল যে 'এক', এই একই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত 'এক'। এই বোধ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কতভাবে প্রকাশ এবং প্রসার লাভ করিয়াছে তাহা আলোচনা করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই বোধের সঙ্গে যুক্ত আর-একটি বোধ বা বিশ্বাসের সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া প্রয়োজন। ইহা হইল উপনিষদের ন্যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটি বিশ্বৈক্যবোধ, এ বোধ কবির বিশ্বাত্মবোধের সঙ্গেই জড়িত। রবীন্দ্রনাথের শৈশবের কবিতার ভিতর দিয়াই এই বোধ প্রকাশিত হইয়াছে যে বিশ্বপ্রবাহ এক এবং অখণ্ড; ইহার মধ্যে জড়ের যত বিকাশ বিকার আবর্তন-বিবর্তন, প্রাণের যত চঞ্চল আবেগ ও বঙ্কিম প্রচরণ, চৈতন্যের যত বিকাশ ও বিস্তার—ইহার সকল ধারা, সকল আবর্তন, সকল কলরব—সেই এক পরিকল্পনায় এবং প্রবাহে বিধৃত। একটি সঙ্গীতের মধ্যে যেমন সকল কথা অর্থ ভাব সুর তাল মান লয় সর্বাংশে অটুটভাবে বিধৃত থাকে এই বিশ্ব-প্রবাহও সেইরূপ একটি অনাদি অনন্ত বিশ্বসঙ্গীত। দ্যুলোকের চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারকা যেমন করিয়া এই সঙ্গীতের তানবিস্তারমাত্র, অন্তরিক্ষের মেঘ-বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝঞ্ঝা যেমন করিয়া এই সঙ্গীতের

স্বরতরঙ্গমাত্র— ঠিক তেমন করিয়াই পৃথিবীর সকল বন-অরণ্যানী, পাহাড়-পর্বত, সাগর-সিন্ধু, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী—এবং অনন্ত মানুষ—দেশে দেশে কালে কালে তাহার বিকাশের বিচিত্র ইতিহাস—ইহার সকলই সেই একই বিশ্বমহাসঙ্গীতের স্বরপ্রবাহমাত্র। ইহার কোনোটা হইতেই কোনোটা পৃথক নয়, স্বতন্ত্রভাবে ইহার কেহই সত্য নয় ; সত্য নিহিত ইহার সমগ্রতায়। সে সমগ্রতার ভিতরে নিহিত যে এক সত্য সেই এক সত্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগেই প্রতিটি বস্তুর সত্য, সেই যোগে ধরণীর প্রতিটি ধূলিকণাও সত্য ; আর সেই অখণ্ডতার যোগ যেখানে হারাইয়া গেল সেইখানেই শুধু ধরণীর ধূলিকণা নয়, নিখিলশূন্যে ঘূর্ণমান জ্যোতিষ্ক-পুঞ্জও তাহাদের সকল জ্যোতি লইয়াই উদ্দেশ্যহীনতার চরমমিথ্যাত্বের অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। শুধু আমার সত্যই যে আমিকে অতিক্রম করিয়া সকল কিছুর সঙ্গে যোগে তাহা নয়, সকলের সত্যই আবার আমার সঙ্গে যোগে, অখণ্ডতার সঙ্গে নিরন্তর যোগে। প্রতিটি বস্তুর যাহা কিছু অর্থ তাহাকেও লাভ করিতে হইবে সব-কিছুর ভিতরে প্রসারিত এক সত্যের স্পর্শ লাগাইয়া। নিখিলপ্রবাহের মধ্যে পরিব্যাপ্ত যে এক উদ্দেশ্য এক অর্থ, তাহাকেই রবীন্দ্রনাথ বার বার করিয়া বলিয়াছেন একটি 'অনাদি স্বপ্ন'।

বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত অখণ্ড ঐক্যে এই বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে মূলতঃ উপনিষদের প্রভাবজনিত নয়, ইহা রবীন্দ্রনাথের একটি প্রকৃতিগত বা সহজাত বিশ্বাস, এবং এ বিশ্বাস উপনিষদের দ্বারা উত্তরোত্তর কেবলই পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে কবির 'প্রভাতসংগীতে'র কবিতাগুলিতে। আশ্চর্যভাবে লক্ষ্য করিতে পারি, বিশ্বের অন্তর্নিহিত এই অখণ্ডতার বোধ 'প্রভাত-সংগীতে'র মধ্যে কবির অপরিণত মনকে যেন একেবারে পাইয়া বসিয়াছিল। 'প্রভাতসংগীতে'র 'অনন্ত জীবন' কবিতাটির মধ্যে অতি স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই—

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জলরাশি,
চারি দিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
সূর্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি, যত গান, যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে,
মেশে আসি সেই সিন্ধু'পরে।

ইহার সহিত 'মুণ্ডক-উপনিষদে'র নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিকে বেশ মিলাইয়া লওয়া যায়—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽস্তং
গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥ ৩।২।৮

"প্রবহমান নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে অস্ত যায়, সেইরূপ বিদ্বান্ নাম ও রূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন।" কিন্তু 'প্রভাতসংগীতে'র 'অনন্ত জীবন' কবিতাটি পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায়, এই ভাব ও কথা রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন কবিচিত্তে কতকগুলি নিজস্ব জীবনজিজ্ঞাসাকে অবলম্বন করিয়া নিজস্ব ধারায় এবং নিজস্ব ভঙ্গিতেই ভাসিয়া উঠিয়াছে। এখানে কবি বিশ্বজীবনের একটি অখণ্ডতার কথাই বলিলেন; কিন্তু এই অখণ্ড বিধান স্বভাবতঃই একটি অখণ্ড বিধাতার মূর্তি জাগাইয়া তুলিবে, এবং এই অখণ্ড বিধাতা ও অখণ্ড বিধানের সঙ্গে অনাদি সম্পর্কের প্রশ্ন তুলিবে। পূর্বেই বলিয়াছি, বিধান ও বিধাতার ভিতরকার এই সম্পর্কটির ইঙ্গিত করিয়াছেন কবি একটি 'মহাস্বপ্নে'র ধারণার দ্বারা। কবির এই ধারণাই ফুটিয়া উঠিয়াছে প্রভাতসংগীতের 'মহাস্বপ্ন' কবিতাটির ভিতর দিয়া।

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।
বিশাল জগৎ এই
প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
হৃদয়সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিশ্বের মতন।
উঠিতেছে চন্দ্র সূর্য, উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি-পরিবার।
উঠিতেছে, ছুটিতেছে গ্রহ-উপগ্রহ দলে দলে,
উঠিতেছে ডুবিতেছে রাত্রি দিন, আকাশের তলে।
একা বসি মহাসিন্ধু চিরদিন গাইতেছে গান,
ছুটিয়া সহস্র নদী পদতলে মিলাইছে প্রাণ।

'মহাস্বপ্ন' কবিতায় কবির যে ভাব ও ভাবনা প্রকাশ পাইয়াছে তাহারই নানাভাবে বিস্তার দেখিতে পাই আবার 'প্রভাতসংগীতে'র 'স্রোত' কবিতাটির মধ্যে। এই কবিতাটিতে শুধু বিশ্বপ্রবাহের কোনো এক মহাদেবের মহাস্বপ্নে বিধৃত অখণ্ডতার কথাই পাই না, সেই অখণ্ড ধারার সঙ্গে ব্যক্তিধারাটিকে মিলাইয়া দিবার ব্যাকুল আগ্রহও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কবির স্বীকৃতিতেই এখানকার কথা ও ছন্দ অত্যন্ত 'নড়বড়ে', কিন্তু ইঙ্গিতটি স্পষ্ট।

শতেক কোটি গ্রহ তারা যে স্রোতে তৃণপ্রায়,
সে স্রোতমাঝে অবহেলে ঢালিয়া দিব কায়,
অসীম কাল ভেসে যাব অসীম আকাশেতে,
জগৎ কল-কলরব শুনিব কান পেতে।
দেখিব ঢেউ, উঠে ঢেউ, দেখিব মিশে যায়,
জীবন মাঝে উঠে ঢেউ মরণ গান গায়।...
অবোধ ওরে, কেন মিছে করিস আমি আমি।
উজানে যেতে পারিবি কি সাগরপথগামী।...
জগৎ হয়ে রব আমি একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে একটি জলকণা।

আমার নাহি সুখ-দুখ পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি তাহাই হয়ে যাই।...
সবার সাথে আছি আমি আমার সাথে নাই,
জগৎ-স্রোতে দিবানিশি ভাসিয়া চলে যাই।

রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বসৃষ্টির কোথাও 'মহাস্বপ্ন' বলিয়াছেন, কোথাও 'মহাসংগীত' বলিয়াছেন, কোথাও ইহাকে 'বিশ্বনৃত্য' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে যে 'মহাস্বপ্ন', বা 'মহাসংগীতে'র ধারণা ইহা গভীর তাৎপর্যব্যঞ্জক; রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনদর্শনের সহিত ইহার যোগ আছে, অথবা এ কথাও বলা যায় যে এই ধারণার উপরেই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন গ্রথিত। এই ধারণাগুলির তাই পৃথক্‌ভাবে বিস্তৃত আলোচনা হইবার প্রয়োজন, এই প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবেশ করা সঙ্গত হইবে না। সংক্ষেপে এখানে এই তথ্যটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতে পারে যে, এ ক্ষেত্রে উপনিষদের সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুরের মিলের মধ্যেও একটা পার্থক্য রহিয়াছে। উপনিষদে এই বিশ্বসৃষ্টির অখণ্ড-প্রবাহের পিছনে 'একে'র প্রশাসনের কথা রহিয়াছে। বৃহদারণ্যকে বলা হইয়াছে—

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ॥ ৩।৮।৯
এই অক্ষরের প্রশাসনে, হে গার্গি, সূর্যচন্দ্র বিধৃত হইয়া আছে।'
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি দ্যাবাপৃথিব্যৌ বিধৃতে তিষ্ঠতঃ॥ ৩।৮।৯
'এই অক্ষরের প্রশাসনে, হে গার্গি, দ্যুলোক ও পৃথিবী বিধৃত হইয়া আছে।'
এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নিমেষা মুহূর্তা অহোরাত্রাণ্যর্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরা ইতি বিধৃতা তিষ্ঠন্তি॥ ৩।৮।৯

'এই অক্ষরের প্রশাসনে, হে গার্গি, নিমেষসমূহ, মুহূর্তসমূহ, অহোরাত্রসকল, অর্ধমাসগুলি, মাসসমূহ, ঋতুসমূহ, সংবৎসরসমূহ—সব বিধৃত হইয়া আছে।'

এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যো ঽন্যাঃ॥ ৩।৮।৯

'এই অক্ষরের প্রশাসনে, হে গার্গি, প্রাচ্য দিকস্থ অনেক নদী শ্বেতপর্বত-সমূহ হইতে স্যন্দমান হয়, পশ্চিম দিকের শ্বেতপর্বতসমূহ হইতেও স্যন্দমান হয়।'

তদ্ বা এতদ্ অক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্র শ্রুতং শ্রোত্র মতং মন্ত্র বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতৃ ....এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ ॥ ৩।৮।১১

'হে গার্গি, সেই যে এই অক্ষর ইনি সকলের অদৃষ্ট, কিন্তু ইনি সকলের দ্রষ্টা; ইনি সকলের অশ্রুত, কিন্তু ইনি সকলের শ্রোতা; কেহ তাঁহাকে মনন করিতে পারে না, কিন্তু তিনি সকলের মনন করেন; কেহ তাঁহাকে বিশেষরূপে জ্ঞাত হয় নাই, তিনি সকলকে বিশেষরূপে জ্ঞাত। এই অক্ষরেই, হে গার্গি, আকাশ ওতপ্রোত হইয়া আছে।'

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই যে এক অক্ষরের ভিতরে বিধৃত হইয়া একতাপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা এখানে বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু লক্ষণীয় ঐ 'প্রশাসনে'র কথা। উপনিষদের অন্যত্র বলা হইয়াছে ভয়ের কথা; অগ্নি ইঁহার ভয়ে তাপ দিতেছে, সূর্য ইঁহার ভয়ে তাপ দিতেছে, ইন্দ্র, বায়ু, মৃত্যু—ইহারা সকলেই ইঁহার ভয়ে ধাবিত হইতেছে। কোথাও সর্বব্যাপী প্রাণরূপ সর্বনিয়ন্তা এই অক্ষরকে বলা হইয়াছে 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্', উদ্যত বজ্রের ন্যায় মহৎ ভয়! রবীন্দ্রনাথ এই প্রশাসন বা ভয়ের দিকটি গ্রহণ করিলেন না। উপনিষদে সৃষ্টি প্রবাহের পশ্চাতে যে একটা আনন্দের দিক রহিয়াছে, রবীন্দ্রনাথ সেই দিকটিই গ্রহণ করিলেন। উপনিষদে বলা হইয়াছে, আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল জাত হয়, জাতসমূহ আনন্দের দ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, আনন্দেই ফিরিয়া যায়, তাহাতেই অভিসংবিষ্ট হয়। ভয়ের তো কোনো প্রশ্নই নাই, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন —ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানিয়াছেন তিনি তো আর কোন কিছু হইতেই ভয় পান না। যে অক্ষরের কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, সেই অক্ষর যে রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি—তিনি রসস্বরূপ, সেই রসকে জানিয়া সকলে আনন্দস্বরূপই হইয়া যায়। ঐ যে বলা হইল, আকাশে এক অক্ষর ওতপ্রোত হইয়া আছেন,

সেই অক্ষর সম্বন্ধেই তো অন্যত্র বলা হইয়াছে— কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ, এষ হ্যেবানন্দয়াতি ; কে চেষ্টা করিত, কে বাঁচিয়া থাকিত যদি আকাশে এই আনন্দ না থাকিত !

রবীন্দ্রনাথ এইখানেই তাঁহার অন্তরে গভীর মিল অনুভব করিয়াছেন। সৃষ্টির একটা অখণ্ডরূপ যখন হইতেই রবীন্দ্রনাথের কবিহৃদয়ে জাগিয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতেই ইহার মূলসত্তায় তিনি একটা আনন্দরূপ অনুভব করিয়াছেন ; এই অনুভূতিই কবিকে নিয়ত প্রেরণা দান করিয়াছে এই সৃষ্টিকে আনন্দ-প্রাচুর্যে উদ্ভূত 'অনাদি মহাস্বপ্নে'র রূপ দিতে, অথবা মহাসঙ্গীত বা মহানৃত্যের রূপ দিতে। 'সোনার তরী'র 'বিশ্বনৃত্য' কবিতায় তাই দেখি, এই আনন্দময় অক্ষর মহারহস্যের অন্তস্তলে বসিয়া যেন এক মহাসঙ্গীতের সুর আপনমনে বসিয়া বাজাইতেছেন— সেই সুরে সুরে তালে তালে সৃষ্টিপ্রবাহ বিচিত্ররূপে আবর্তিত হইতেছে —

ওগো, কে বাজায়, বুঝি শোনা যায়,
মহারহস্যে বসিয়া,
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর 'পরে বসিয়া।

গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল—
গগনে গগনে জ্যোতি-অঞ্চল
পড়িছে খসিয়া খসিয়া।

ওগো, কে বাজায়, কে শুনিতে পায়,
না জানি কী মহা রাগিণী !
ফুলিয়া ফুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী।
ঘন অরণ্য আনন্দে দুলে—

অনন্ত নভে শত বাহু তুলে,
কি গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুলে,
মর্মরে দিনযামিনী।...

পশু-বিহঙ্গ কীটপতঙ্গ
জীবনের ধারা ছুটিছে।
কী মহা খেলায় মরণবেলায়
তরঙ্গ তার টুটিছে।
কোনোখানে আলো কোনোখানে ছায়া,
জেগে জেগে ওঠে নব নব কায়া,
চেতনাপূর্ণ অদ্ভুত মায়া
বুদ্বুদসম ফুটিছে।

'সোনার তরী'র এই কবিতারই পরিণতি 'গীতিমাল্যে'র গানে

এই তো তোমার আলোক-ধেনু
সূর্যতারা দলে দলে,
কোথায় বসে বাজাও বেণু
চরাও মহা-গগনতলে।

এখানেও দেখি, আলোক-ধেনু শুধু দ্যুলোকের 'সূর্যতারা দলে দলে' নয়, আলোক-ধেনু পৃথিবীর প্রাঙ্গণেও—

তৃণের সারি তুলছে মাথা,
তরুর শাখে শ্যামল পাতা,
আলোয়-চরা ধেনু এরা
ভিড় করেছে ফুলে ফলে॥

আবার সেই একই রাখালের সুর সমানভাবে সক্রিয় মানুষের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষায়—

আশা-তৃষা আমার যত
ঘুরে বেড়ায় কোথায় কত,

মোর জীবনের রাখাল ওগো
ডাক দেবে কি সন্ধ্যা হলে ॥

সুতরাং সেই 'একে'র সুরেই বিশ্বজীবন বিধৃত।

'নৈবেদ্যে'র পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে যে অদ্বয়বোধ তাহা রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র কাব্যধারার ভিতর দিয়াই জাগিয়া উঠিতেছিল; 'নৈবেদ্যে' আসিয়া মনে হয়, কবি-অনুভূতি এখানে উপনিষদের সঙ্গে মিল খুঁজিয়া পাইয়াছে; অনুভূতির প্রকাশে তাই উপনিষৎ-সচেতনতার চিহ্ন আছে। 'নৈবেদ্যে' যখন দেখি—

এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,
মোর অঙ্গে রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল।

অথবা—

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্‌বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে; সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু সমুদ্রদোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।

তখন কবির অনুভূতির সঙ্গে উপনিষৎ-সচেতনতা স্পষ্ট। কিন্তু জীবনের কোনো মুহূর্তেই এই উপনিষৎ-সচেতনতা কবির কবি-অনুভূতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই। এখানেও 'নৈবেদ্যে'র

প্রথম উদ্ধৃতির মধ্যে যে 'স্তব্ধতা'র কথা বলা হইয়াছে— যে স্তব্ধতার ভিতর দিয়া হৃদয়ে সত্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে—সে স্তব্ধতা কবির চিত্তে নামিয়া আসিয়াছে কি উপায়ে ?

আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে।
জনশূন্য ক্ষেত্র-মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার
স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদ্রিতনয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত
নিদ্রায় অলস ক্লান্ত।

যে স্তব্ধতার ভিতর দিয়া কবিচিত্তে উপনিষদের সত্যের আবির্ভাব ঘটিয়াছে সেই স্তব্ধতার এই পটভূমিটিকে ভালো করিয়া স্মরণে না রাখিলে রবীন্দ্রনাথের চিত্তানুভূতির সঙ্গে এবং কণ্ঠস্বরের সঙ্গে উপনিষদের ঋষিগণের চিত্তানুভূতি ও কণ্ঠস্বরের মিলের স্বরূপ এবং তাৎপর্য ভালো করিয়া বোঝা যাইবে না। কবি-অনুভূতির ভিতর দিয়া চিত্তে যে সত্য উদ্‌ভাসিত হইয়াছে, উপনিষদের আবৃত্তি এবং গায়ত্রীমন্ত্রের বিধিপূর্বক জপের মধ্য দিয়াও চিত্তে সেই সত্যই উদ্ভাসিত হইয়াছে। সত্যের এই দুই উদ্ভাসের মধ্যে কবি কোনোদিনই কোনো পার্থক্য অনুভব করিতে পারেন নাই, সেই জন্যই তিনি বার বার বলিয়াছেন, তাঁহার কবিজীবন এবং ধর্মজীবন জীবনের প্রথম লগ্ন হইতেই অবিচ্ছেদ্য মিলনসূত্রে আবদ্ধ ছিল। বারো বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ পিতার নিকট হইতে গায়ত্রীমন্ত্র লাভ করিয়াছিলেন। এই মন্ত্র অবলম্বনে তাঁহার তখনকার অনুভূতির কথা বলিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন—

"এই মন্ত্র চিন্তা করতে করতে মনে হ'ত, বিশ্বভুবনের অস্তিত্ব আর

আমার অস্তিত্ব একাত্মক। ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই ভূলোক, অন্তরীক্ষ, আমি তারই সঙ্গে অখণ্ড। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি-অন্তে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মনে চৈতন্য প্রেরণ করেছেন। চৈতন্য ও বিশ্ব, বাহিরে ও অন্তরে সৃষ্টির এই দুই ধারা এক ধারায় মিলছে।" —মানুষের ধর্ম।

বহুদিনের অনুভূতি ও মনন শেষে গিয়া কবিচিত্তে দেখা দিয়াছে একটা সহজ প্রত্যয়রূপে। এ প্রত্যয় যে একজন কবির মনে কতখানি সহজ হইয়া উঠিতে পারে, একই 'প্রাণপ্রেতি'কে যে প্রাণবস্তু সকল কিছুর ভিতর দিয়া কিভাবে অনায়াসে অথচ অসংদিগ্ধভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহার উজ্জ্বল পরিচয় রহিয়াছে কবির 'বনবাণী'র প্রতিটি কবিতার ভিতর দিয়া। উদ্ধৃতি দিতে হইলে প্রায় সবগুলি কবিতাই উদ্ধৃত করিয়া দিতে হয়। শুধু প্রাণের স্পন্দন নয়, তাহার সঙ্গে রহিয়াছে সৃষ্টির আদিমযুগের ভাষায় ভাব-বিনিময়। সেই একই সর্বব্যাপী প্রাণের উপলব্ধি দেখিতে পাই আকাশপ্রদীপের 'স্কুল-পালানে' কবিতায়—

যে প্রথম প্রাণ
একই বেগ জাগাইছে গোপন সঞ্চারে
রসরক্তধারে
মানবশিরায় আর তরুর তন্তুতে,
একই স্পন্দনের ছন্দ উভয়ের অণুতে অণুতে।

'রোগশয্যায়' শুইয়াও কবির মনে হইয়াছে সেই অখণ্ডের কথা—

অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
যে দেখে অখণ্ড রূপে
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক।—২৫

আবার 'আরোগ্যে'র দিনেও বলিতে পারিয়াছেন—

সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই যে অদ্বয়বোধ উপনিষদের সহিত ইহার গভীর যোগ এবং মিল থাকিলেও এই উভয় সর্বত্র এবং সর্বাংশে অনুরূপ নয়। রবীন্দ্রনাথের স্বকীয় কবি-অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হইয়া এই অদ্বয়বোধ কবিমানসে বিভিন্ন রূপান্তর এবং পরিণতি লাভ করিয়াছে। এই সকল রূপান্তর এবং পরিণতির মূলে একটা গভীর ঐক্য আছে বটে, কিন্তু ঐক্যের মধ্যেও যে বৈচিত্র্য রহিয়াছে তাহা উপেক্ষণীয় নহে। এই অদ্বয়বোধ কোনো কোনো স্থানে স্পষ্টতঃ উপনিষদের অধ্যাত্মবোধের অনুরূপ অথবা তাহা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই অদ্বয়বোধের মধ্যে একটি ধারা দেখিতে পাই যে ধারাটিকে নাম দিতে পারি Nature Mysticism বা প্রকৃতিরহস্যবাদ। মিস্টিসিজ্‌ম্‌ বা রহস্যবাদের এখানে মুখ্য লক্ষণ হইল দুইটি, প্রথমতঃ, একটা পরম-ঐক্যের দিকে অনিবার্য প্রবণতা, দ্বিতীয়তঃ, সে প্রবণতা বুদ্ধিজাত প্রবণতা নয়, অনুভূতির স্নিগ্ধালোকে প্রাপ্ত বা উদ্বুদ্ধ প্রবণতা। এখানকার যে ঐক্যবোধ তাহাকে কবির মূল অধ্যাত্মবোধের সঙ্গেও যুক্ত করা যায়, আবার ইহাকে কোনো অধ্যাত্মবোধরূপে ব্যাখ্যা না করিয়া নিছক একটি কবি-অনুভূতি বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন যুগের বহু কবিতা ও লেখার ভিতর আমরা বসুন্ধরার সঙ্গে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে একটা বিশেষ-জাতীয় ঐকাত্ম্যবোধের পরিচয় পাই। এই ঐকাত্ম্যবোধের স্পষ্ট পরিচয় আছে রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রের মধ্যে।—

"এক সময়ে যখন আমি এই পৃথিবীর সঙ্গে এক হয়ে ছিলুম, যখন আমার উপর সবুজ ঘাস উঠত, শরতের আলো পড়ত, সূর্যকিরণে আমার সুদূরবিস্তৃত শ্যামল অঙ্গের প্রত্যেক রোমকূপ থেকে যৌবনের সুগন্ধি উত্তাপ উত্থিত হতে থাকত, আমি কত দূরদূরান্তর কত দেশদেশান্তরের জল স্থল পর্বত ব্যাপ্ত করে উজ্জ্বল আকাশের নীচে নিস্তব্ধভাবে শুয়ে পড়ে থাকতুম, তখন শরৎ-

সূর্যালোকে আমার বৃহৎ সর্বাঙ্গে যে একটি আনন্দরস একটি জীবনীশক্তি অত্যন্ত অব্যক্ত অর্ধচেতন এবং অত্যন্ত প্রকাণ্ড বৃহৎভাবে সঞ্চারিত হতে থাকত, তাই যেন খানিকটা মনে পড়ে। আমার এই যে মনের ভাব, এ যেন এই প্রতিনিয়ত অঙ্কুরিত মুকুলিত পুলকিত সূর্যসনাথা আদিম পৃথিবীর ভাব। যেন আমার এই চেতনার প্রবাহ পৃথিবীর প্রত্যেক ঘাসে এবং গাছের শিকড়ে শিকড়ে শিরায় শিরায় ধীরে ধীরে প্রবাহিত হচ্ছে, সমস্ত শস্যক্ষেত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে, এবং নারকেল গাছের প্রত্যেক পাতা জীবনের আবেগে থর্থর্ করে কাঁপছে।"

রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র 'অহল্যার প্রতি' কবিতায় এই ভাবের আভাস আছে; 'সোনার তরী'র 'সমুদ্রের প্রতি' ও 'বসুন্ধরা' কবিতায় শুধু পৃথিবী নয়, বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই যোগ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। 'চৈতালি'র 'মধ্যাহ্ন' কবিতায় একই ভাবের রূপায়ণ দেখিতে পাই। 'পূরবী'র 'মাটির ডাকে'র মধ্যে ইহার আরও নিবিড় রূপ দেখিতে পাই। এই ভাবটি টুকরা টুকরা হইয়া কবির বিভিন্ন যুগের আরও অনেক কবিতার ভিতরে ছড়াইয়া আছে। এ-জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে সর্বত্রই লক্ষ্য করিতে পারি, বিশ্ব-প্রকৃতির সহিত নিবিড় আত্মীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে একটি পূর্ব-স্মৃতিকে অবলম্বন করিয়া। সেই পূর্বস্মৃতির সঙ্গে আবার যুক্ত হইয়া আছে একটি বিবর্তনবাদ। এই বিবর্তনবাদে আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের সকল সত্যই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সেই বিবর্তনের ভিতরে বহিঃপ্রকৃতিরই বিবর্তন ঘটে নাই, কবির ব্যক্তি-সত্তারও বিকাশ এবং বিবর্তন চলিতেছে সৃষ্টির সেই আদিকাল হইতে বিশ্বপ্রকৃতির বিবর্তনের সকল স্তরভেদের ভিতর দিয়া। কবির ব্যক্তিসত্তা একদিন ধূলির সঙ্গে ধূলি হইয়া ছিল, তৃণগুল্ম-বনস্পতির সঙ্গে তৃণগুল্ম-বনস্পতি হইয়া ছিল, সকল প্রাণিপর্যায়ের ভিতর দিয়া চলিয়াছে প্রাণের খেলা— তাহার পরে প্রবেশ মনোরাজ্যে— শেষ অভিব্যক্তি চেতনার বিকাশের অসীম সম্ভাবনা

লইয়া মানুষরূপে। মনের ভেদাত্মক বুদ্ধিতে আজ মানুষ বিশ্বপ্রকৃতি হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে, সেই ঐকাত্ম্যের চেতনার উপরে আবরণ পড়িয়া গিয়াছে। চিত্তের মধ্যে গভীর অবগাহনের ভিতর দিয়া যুগযুগান্তর-জন্মজন্মান্তরের সেই পূর্বস্মৃতি আজ আবার যেন চেতনার মধ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে।

এই জাতীয় একটি একাত্মক কবি-অনুভূতিকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ইহাকে কবি-অনুভূতির ভিতর দিয়া বুদ্ধি হইতে মনে, মন হইতে সহজাত-বৃত্তিতে পুনরাবর্তনের চেষ্টা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মনঃসমীক্ষণবাদিগণের ভাষায় ইহাকে ব্যক্তিচেতনার অচেতনের মধ্যে নিমজ্জন বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, অথবা ব্যক্তিচেতনার সাময়িক বিলীনতার সুযোগে সমগ্র অবচেতন এবং অচেতনের একটা সবেগ বাঁধভাঙা উৎসারণ বলিয়াও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। কবি এই সব কবিতার ভিতরে বা উক্তির ভিতরে মাঝে মাঝে যে একটি 'যেন' ব্যবহার করিয়াছেন সেই 'যেন'টি এই-জাতীয় সব ব্যাখ্যা গ্রহণে আমাদিগকে আরো উৎসাহিত করিয়া তুলিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'জন্মদিনে'র নবম সংখ্যক কবিতায় যেখানে বলিয়াছেন—

> মোর চেতনায়
> আদিসমুদ্রের ভাষা ওংকারিয়া যায় ;
> অর্থ তার নাহি জানি,
> আমি সেই বাণী।
> শুধু ছলছল কলকল ;
> শুধু সুর শুধু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল ;
> শুধু এ সাঁতার—
> কখনো এ পারে চলা, কখনো ও পার,
> কখনো বা অদৃশ্য গভীরে,
> কভু বিচিত্রের তীরে তীরে।

ছন্দের তরঙ্গদোলে
কত যে ইঙ্গিত ভঙ্গী জেগে ওঠে, ভেসে যায় চলে।
স্তব্ধ মৌনী অচলের বহিয়া ইশারা
নিরন্তর স্রোতোধারা
অজানা সম্মুখে ধায়, কোথা তার শেষ
কে জানে উদ্দেশ।

তখন মনঃসমীক্ষণবাদিগণ বলিবেন, আসল কথা চেতনার ঐ দুইটি দিক, একটি হইল 'নিরন্তর স্রোতোধারা', যেটা বহির্বস্তুর অবলম্বনে বা বহির্বস্তুর রূপকল্প অবলম্বনে ভাসমান চৈতন্যে বা মগ্নচৈতন্যে চিন্তা-চেষ্টার আলোড়ন জাগাইয়া চলিতেছে; অপরটি হইল ঐ 'স্তব্ধ মৌনী অচল', যেখানে সব-কিছু এক হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। চেতনার এই 'নিরন্তর স্রোতোধারা'র অংশটা লইয়াই হইল রবীন্দ্রনাথের বহুবিচিত্র বিশ্বলীলা, আর ঐ 'স্তব্ধ মৌনী অচল' অংশটা লইয়াই হইল বহুবিচিত্র লীলার অতলে শায়িত 'এক'। সেই 'একে'র পরিচয় কবির নিজের নিকটেই অত্যন্ত দুরবগাহ, চিত্তের অনেক স্তর পার হইয়া গিয়া শেষ স্তরে সেই 'ব্রাহ্মী স্থিতি'। কিন্তু জীবনে দুর্লভ শুভক্ষণ আসে— সকল আবরণ ভগ্ন করিয়া মুক্তি পায় সেই চিত্তগুহাহিত 'এক'— অতলের সেই স্তব্ধ মৌনী অচল, তখনই কবি-অনুভূতিতে জাগিয়া ওঠে এক ও বহুর লীলা।

এই পথে আরো অনেক দূর অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে লাভ নাই; তাহাতে শুধু পাশাপাশি দুইটি সমান্তরাল রেখা ধরিয়াই চলা হইবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মনকে যেভাবে বিশেষ করিয়া বলিতে চান সেই কথাটিকে বিশেষ করিয়া শোনা হইবে না। রবীন্দ্রনাথ যে বার বার বলিয়াছেন যে তাঁহার এ-জাতীয় সকল কবিচেতনাও তাঁহার অধ্যাত্মচেতনার সঙ্গেই যুক্ত সে কথার তাৎপর্য কবির কবিতার ভিতর দিয়াই বুঝিয়া লওয়া যায়। সমস্ত প্রাকৃতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই যে তাঁহার ব্যক্তিসত্তাও যুগযুগান্তর ধরিয়া

সেই পরম একের সুপরিকল্পনাতেই আবর্তিত এবং অভিব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে এবং এই ক্রমাভিব্যক্তির যে একটি বিশেষ প্রয়োজন এবং অর্থ আছে ইহা রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের একটি প্রধান বাণী। এই-জাতীয় কবিতার ভিতরেও সেই বাণী নিহিত আছে, ইঙ্গিতটি হয়তো অত্যন্ত গূঢ়। কিন্তু এই ইঙ্গিতটি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে কবির 'উৎসর্গে'র ভিতরকার একটি কবিতায়। কবিতাটিতে যেখানে দেখি—

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধরা
লুটায় আমার সামনে—
সে আমায় ডাকে এমন করিয়া
কেন যে কব তা কেমনে।
মনে হয় যেন সে ধূলির তলে
যুগে যুগে আমি ছিনু তৃণে জলে,
সে দুয়ার খুলি কবে কোন্ ছলে
বাহির হয়েছি ভ্রমণে।
সেই মূক মাটি মোর মুখ চেয়ে
লুটায় আমার সামনে।
নিশার আকাশ কেমন করিয়া
তাকায় আমার পানে সে।
লক্ষ যোজন দূরের তারকা
মোর নাম যেন জানে সে।
যে ভাষায় তারা করে কানাকানি
সাধ্য কি আর মনে তাহা আনি ;
চির দিবসের ভুলে-যাওয়া বাণী
কোন্ কথা মনে আনে সে।
অনাদি উষার বন্ধু আমার
তাকায় আমার পানে সে।

সে পর্যন্ত কবিতাটি পূর্বোল্লিখিত এই-জাতীয় কবিতাগুলির সহিত

এক সুরে গাঁথা ; সেই সৃষ্টির আদিম যুগে সৃষ্টির সকল বস্তুসত্তার সহিত কবির ব্যক্তিসত্তার একটা সম্ভাবনামাত্র রূপে এক হইয়া মিলিয়া থাকিবার কথা, তাহার পরে দীর্ঘদিনের আবর্তন ও বিবর্তন, আজ স্মৃতির অতল হইতে যেন সেই লক্ষযুগের সঞ্চিত কথারই আভাস। কিন্তু একটু পরেই গিয়া দেখিতে পাই—

ধূলা সাথে আমি ধূলা হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে।
ফুল মাঝে আমি হব ফুলদল
তাঁর পুজারতি-বরণে।
যেথা যাই আর যেথায় চাহি রে
তিল ঠাঁই নাই তাহার বাহিরে,
প্রবাস কোথাও নাহি রে নাহি রে
জনমে জনমে মরণে।
যাহা হই আমি তাহা হয়ে রব
সে গৌরবের চরণে।

এখানকার অধ্যাত্মসুর অনস্বীকার্য। এখানকার এই যে অধ্যাত্মসুর তাহাকে পূর্বোল্লিখিত সব কবিতার ভিতরেই প্রসারিত করিয়া দেওয়া চলিতে পারে, এবং এইভাবেই এ-জাতীয় কবিতার ভিতরেও অদ্বয়বোধের মধ্যে 'একে'র সত্যকে গূঢ় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু সে-জাতীয় গ্রহণ সত্ত্বেও স্বীকার করিতে হয়, এ-জাতীয় কবিতাগুলির মধ্যে যে-জাতীয় একটা বিশেষ অনুভূতি এবং বিশেষ বোধ রহিয়াছে তাহা উপনিষদের মধ্যে কোথাও নাই। আমার ব্যক্তিসত্তার সম্ভাবনা নিখিলপ্রকৃতির লক্ষ লক্ষ যুগের বিবর্তনের ভিতর দিয়া যে একদিন মানুষের মধ্যে চরম বিকাশ লাভ করিয়াছে ইহা কবি রবীন্দ্রনাথেরই একটি বিশেষ অনুভূতি। এই অনুভূতি আপনার খাতেই বিভিন্ন যুগে নানাপ্রকারের বিস্তার লাভ করিয়াছে। উপনিষদের 'এক'-এর বিশ্বাস বা অনুভূতি

হইতে এই অনুভূতি বা বোধ উৎসারিত হয় নাই, অভিজ্ঞতা-অনুভূতি হইতে গড়িয়া ওঠা বোধের মধ্যে অধ্যাত্মবোধের সঞ্চার ঘটিয়াছে।

৬

এ পর্যন্ত আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহার ভিতর দিয়া কবির সীমাবদ্ধ আমিকে অতিক্রম করিয়া একটি অখণ্ড জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হইবার কথাই দেখিলাম না, দেখিলাম এই অখণ্ডধারার সহিত যুক্ত আছেন যে এক অবিকারী সত্য তাহারই সহিত যুক্ত হইবার কথা। এ ক্ষেত্রে উপনিষদের সত্যানুভূতির মধ্যে দেখিতে পাই, হয় প্রথমে বহির্বিশ্বের মধ্যে বিরাজিত এক সত্যকে আবিষ্কার করা এবং তাঁহাকে নিজের ভিতরকার আত্মার সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করা; অথবা, প্রথমে নিজের মধ্যে সেই এককে অনুভব করা, তাহার পরে বাহিরের যাহা-কিছু সকলের ভিতরে সেই এককে আবিষ্কার করা। উভয় ক্ষেত্রেই এক ব্রহ্মকে অবলম্বন করিয়া আত্মা ও অনাত্মা এক হইয়া গেল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখি, সেই পরম একের সঙ্গে যোগে হয় নিজের মধ্যে তিনি বিশ্বকে অনুভব করিয়াছেন অথবা বিশ্বের মধ্যে নিজেকে অনুভব করিয়াছেন। উপনিষদের মধ্যে যেমন দেখিতে পাই, অহং যেখানে ব্রহ্মতাদাত্ম্য লাভ করে তখন সেই অহংই এত মহিমান্বিত হইয়া উঠে যে তখন সেই অহংই বিশ্বসংসারের স্থিতি হইয়া দাঁড়ায়; উপনিষদের ভিতরে এ-জাতীয় শ্লোক লইয়া আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আমরা স্থানে স্থানে এই-জাতীয় পরম সত্যের সহিত অভিন্ন অহং-এর সর্বব্যাপিত্বের বর্ণনা দেখিতে পাই।

ইহা তো গেল সত্য সম্বন্ধে বিশ্বাস-ধারণার কথা; সঙ্গে সঙ্গে সাধনার কথাও কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে। উপনিষদের

সাধনা কি ? প্রথমে আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করা এবং সেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধির ভিতর দিয়া ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করা। এই আত্মস্বরূপ-উপলব্ধির বা ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় কি ? সে উপায়ের জন্য উপনিষদে স্থানে স্থানে 'আবৃতচক্ষুঃ' হইবার কথা বলা হইয়াছে ; কিন্তু বর্ণনার ভিতর দেখিতে পাই, ঋষিগণ সত্যকে লাভ করিয়াছেন ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া নয়, মনকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হইতে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহৃত করিয়া নয়— বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলিকে সদাজাগ্রত রাখিয়া, বিমল চিত্তকে যথাসম্ভব সকলের মধ্যে প্রসারিত করিয়া ; ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা তাঁহাদের জাগ্রতও হইয়াছে প্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়াইয়া —জিজ্ঞাসার উত্তরও অনেক সময় মিলিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির নিকট হইতে। দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এখানে ছান্দোগ্য উপনিষদের জাবাল সত্যকামের উপাখ্যানের উল্লেখ করিতে পারি। জাবাল সত্যকামের উপাখ্যানের প্রথম অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মণ' কবিতার ভিতর দিয়া সকলেরই জানা আছে, কিন্তু উপাখ্যানটির পরবর্তী অংশগুলিকে অধিক তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। ঋষি গৌতম সত্য-কামকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া 'উপনীত' করাইলেন বটে, কিন্তু তাহার পরে নিজের কাছে রাখিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া বা মুখে উপদেশের দ্বারা সত্যকামকে ব্রহ্মজ্ঞান দিলেন না, তাঁহাকে কতকগুলি কৃশ গো দিয়া আদেশ করিলেন সেগুলিকে পালন করিয়া হৃষ্টপুষ্ট করিতে এবং তাহাদের সংখ্যা বাড়াইতে। সত্যকাম বহুবর্ষ যাবৎ এই গো-সমূহ লইয়া উন্মুক্ত আকাশের নীচে মাঠে মাঠে গোচারণ করিল ; একদিন এই মাঠের বৃষই সত্যকামকে ডাকিয়া বলিল—শোনো সত্যকাম, তোমাকে ব্রহ্মের এক পাদের কথা বলিতেছি। এই যে পূর্ব দিক্, ইহাই ব্রহ্মের এক কলা, এই যে পশ্চিম দিক্, ইহা ব্রহ্মের এক কলা, এই যে দক্ষিণ দিক্ ইহা হইল আর-এক কলা ; আর এই যে উত্তর দিক্ ইহা আর-এক কলা। এই যে তোমাকে ঘিরিয়া চারিটি দিক, ইহা লইয়াই ব্রহ্মের 'প্রকাশবান্' এক পাদ। গৃহাভিমুখে সন্ধ্যায় গো-

সকল লইয়া ফিরিয়া আসিল সত্যকাম ; গো-সমূহকে আবদ্ধ করিল, কাষ্ঠ সংগ্রহ করিল এবং অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া অগ্নির পশ্চাৎভাগে পূর্বাস্য হইয়া উপবেশন করিল। সায়ংকালে প্রজ্বলিত সেই অগ্নি সত্যকামকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—শোনো সত্যকাম, তোমাকে ব্রহ্মের অপর এক পাদের কথা বলিতেছি। এই যে পৃথিবী, ইহা ব্রহ্মের এক কলা, ঐ অন্তরিক্ষ ব্রহ্মের আর-এক কলা ; এই ভূলোক-দ্যুলোক, অন্তরিক্ষ-সমুদ্র জুড়িয়া ব্রহ্মের 'অনন্তবান্' আর-এক পাদ বিরাজিত। পরের দিন সায়ংকালে আকাশ হইতে উড়িয়া-আসা হংস সত্যকামকে বলিল—সত্যকাম, তোমাকে আমি ব্রহ্মের আর একটি পাদের কথা বলিব। শুশ্রূষু সত্যকাম বলিল—বলুন ভগবন্। হংস তাহাকে বলিল—সত্যকাম, অগ্নি সেই ব্রহ্মের এক কলা, সূর্য ব্রহ্মের এক কলা, চন্দ্র এক কলা, বিদ্যুৎ এক কলা। এই অগ্নি, সূর্য, চন্দ্র এবং বিদ্যুৎ লইয়া হইল ব্রহ্মের 'জ্যোতিষ্মান্' অপর পাদ। অপর দিবস জলচর মদ্‌গু (পানকৌড়ি) পাখী উড়িয়া আসিয়া সত্যকামকে ডাকিয়া বলিল—সত্যকাম, তোমাকে ব্রহ্মের অপর পাদের কথা বলিব। শুশ্রূষু সত্যকাম বলিল—বলুন ভগবন্। মদ্‌গু পাখী বলিল—এই যে প্রাণ, ইহা ব্রহ্মের এক কলা, এই যে চক্ষু ইহা এক কলা, এই শ্রোত্র এক কলা, আর এই মন এক কলা ; এই প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন—ইহা লইয়া হইল ব্রহ্মের 'আয়তনবান্' চতুর্থ পাদ।

অতঃপর সত্যকাম একদিন আচার্যের গৃহে উপস্থিত হইল। আচার্য সত্যকামকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেলেন, বিস্মিতকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—ব্রহ্মবিদিব বৈ সোম্য ভাসি, কোন্নু ত্বানুশশাস— তুমি ব্রহ্মবিদের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছ, হে সৌম্য, কে তোমাকে উপদেশ দিয়াছে ?

বিনয়কণ্ঠে সত্যকাম উত্তর করিল—'অন্যে মনুষ্যেভ্যঃ' মনুষ্যের নিকট হইতে আমি উপদেশ পাই নাই, মনুষ্য ছাড়া অন্যের নিকট হইতে পাইয়াছি !

উপনিষদের সাধনার আনুষ্ঠানিক যে কোনো দিক ছিল না, এ কথা বলিতেছি না ; কিন্তু এও মস্ত বড় একটা দিক ছিল—চিত্তকে সত্যান্বেষী করিয়া সকল ইন্দ্রিয়কে জাগ্রত রাখিয়া নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতি—বিশ্বজীবনের মাঝখানে আনিয়া রাখো—স্বপ্রকাশ সত্য ইহার সব-কিছুর ভিতর দিয়াই নিজেকে প্রকাশ করিতেছে—সেই স্বপ্রকাশ সত্যকে বীর্যের দ্বারা, মেধার দ্বারা, ধী দ্বারা, শুশ্রূষার দ্বারা হৃদয়ে গ্রহণ করো। উপনিষদের সাধনার এই ধারাটির সহিত রবীন্দ্রনাথের ছিল সারাজীবন প্রকৃতিগত মিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার *The Religion of Man* গ্রন্থে প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন—'The first stage of my realization was through my feeling of intimacy with Nature', 'আমার ধর্মানুভূতির প্রথম স্তর দেখা দিয়াছিল প্রকৃতির সঙ্গে একটা অন্তরঙ্গতার উদ্বোধে।' শুধু প্রথম স্তর নয়, সকল স্তরেই দেখিতে পাই, এক দিকে বিশ্বপ্রকৃতি, আর-এক দিকে বিশ্বমানবজীবন—এই উভয়ের সঙ্গে পরিপূর্ণ অন্তরঙ্গতায়ই রবীন্দ্রনাথের ধর্মসাধনা সার্থকতা লাভ করিয়াছে। আনুষ্ঠানিক ধর্মসাধনা তাঁহার কিছুই ছিল না তাহা নয়, কিন্তু তাহাও ছিল যেন কবির এই বৃহত্তর সাধনার ভিত্তিকে দৃঢ় রাখিবার জন্যই।

উপনিষদের সাধনার আরো একটি লক্ষণীয় দিক আছে। উপনিষদে যে আত্মোপলব্ধির কথা বলা হইয়াছে সে আত্মা কোনো অসঙ্গ কেবল আত্মা নয়, এ আত্মা হইল পরমাত্মা বা বিশ্বব্যাপী আত্মার সহিত যুক্ত এবং অভিন্ন আত্মা। মোক্ষ বা মুক্তি এখানে আত্মাকে বহির্বিশ্ব হইতে কোনো রকমে নির্লিপ্ত করিয়া ফেলা নয়—মোক্ষ হইল জীবাত্মাকে বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মার সহিত সর্বাংশে যুক্ত করিয়া সেই পরমাত্মা বা বিশ্বাত্মার ভিতর দিয়া 'ইদং সর্বং', বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাহা-কিছু, তাহার সকলের সঙ্গেই এক হইয়া যাওয়া। উপনিষদের সাধনার এই দিকটিকে ভালো করিয়া বুঝিতে

হইলে প্রাচীন ভারতীয় সাধনপন্থার আর একটি প্রধান ধারাকেও একটু বুঝিয়া লইতে হইবে, এই ধারাটি হইল সাংখ্যযোগের ধারা। পণ্ডিতগণ মনে করেন উপনিষদের যুগেই সাংখ্যমতের একটি ধারা চলিয়া আসিয়াছিল, পরবর্তী কালে ইহার সহিত সমজাতীয় যোগমতের মিলন ঘটিয়া সাংখ্যযোগের একটি মোটামুটি মিলিত মতের সৃষ্টি করে। সাংখ্যমতে দেখিতে পাইতেছি, পুরুষ স্বরূপে 'কেবল' এবং অসঙ্গ। প্রাচীন সাংখ্যমত নিরীশ্বর ছিল বলিয়াই মনে হয়; সুতরাং স্বরূপাবস্থিত যে পুরুষ তাহার যে প্রকৃতির সহিত কোনো যোগ নাই তাহা নহে—কোনো পরমপুরুষ বা বিশ্বপুরুষের সঙ্গেও তাহার কোনো যোগের কল্পনা নাই। প্রতিটি জীবই একটি একটি স্বতন্ত্র পুরুষ; এই পুরুষের বন্ধন হয় শুধু প্রকৃতিসান্নিধ্যে প্রকৃতির কতকগুলি গুণ পুরুষে উপচারিত হয় বলিয়া; সে ক্ষেত্রে মুক্তির একমাত্র আদর্শ হইল প্রকৃতি হইতে এই পুরুষকে একেবারে চিরতরে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলা; প্রকৃতি হইতে চিরবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারিলেই পুরুষ শুধু আপনাতে আপনি রহিল, ইহাই পুরুষের পরম অসঙ্গতা বা কৈবল্য—ইহাই পুরুষের মুক্তি। যোগমতের মধ্যেও দেখিতে পাই, চিত্তকে বৃত্তিহীন করিয়া একেবারে নির্বীজ করিয়া জীবের ভিতরকার বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ দ্রষ্টাকে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত করিয়া ফেলা; সেই পরা নির্লিপ্তি বা পরম ঔদাসীন্যই হইল দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান। এই স্বরূপাবস্থিতিতেই সর্বপ্রকার ক্লেশের ক্ষয়—ইহাই মোক্ষ। যোগমত একেবারে নিরীশ্বর কিনা ইহা লইয়া তর্ক থাকিতে পারে; কিন্তু যোগমত সেশ্বর হইলেও ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা এখানে ভালো করিয়া বোঝা যায় না; এই ঈশ্বর কোনো সর্বব্যাপী ব্রহ্ম বা পরমাত্মা নহেন, তিনিই একমাত্র পুরুষ যিনি সর্বকালে প্রকৃতির স্পর্শ হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে পারেন, তাঁহার বন্ধন কোনোদিনই সম্ভব নয়। কিন্তু জীবের যে ব্যক্তি-পুরুষ তাহার প্রকৃতি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া এই পুরুষের সহিত যুক্ত হইবার বা তাঁহার সহিত

এক হইয়া উঠিবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ভারতীয় বৌদ্ধমতের মধ্যে এই ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কোনো স্থান নাই, জৈনমতেও এই ব্রহ্ম বা পরমাত্মার কোনো স্থান নাই।

কিন্তু আমাদের উপনিষদ্ হইতে আগত যে ধারা তাহার ভিতরে জীবাত্মার এই রূপ সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গ বা কেবল হইয়া থাকিবার কোনো কথা নাই— এখানে জীবাত্মাকে পরম একের সহিত যোগে এক হইয়া উঠিতে হইবে। এই যে প্রবহমান জগৎ ইহার সব-কিছুকে ক্ষণিক মায়িক মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিয়া শুধু একের সঙ্গে নিঃশেষে এক হইয়া মিলিয়া যাওয়াই কি তাহা হইলে একমাত্র আদর্শ? মায়াবাদী বেদান্ত-উপনিষদ্‌কে সেইভাবেই গ্রহণ করিবে; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপনিষদ্‌কে কোনোদিন সেভাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এইজন্য মায়াবাদী বেদান্তমতের সহিত রবীন্দ্রনাথের আজন্মবিরোধ। এ সম্বন্ধে তিনি 'মানুষের ধর্মে' বলিয়াছেন—

"আমাদের দেশে এমন-সকল সন্ন্যাসী আছেন যাঁরা সোঽহংতত্ত্বকে নিজের জীবনে অনুবাদ করে নেন নিরতিশয় নৈষ্কর্ম্যে ও নির্মমতায়। তাঁরা দেহকে পীড়ন করেন মানবপ্রকৃতিকে অস্বীকার করবার স্পর্ধায়। তাঁরা অহংকে বর্জন করেন যে-অহং বিষয়ে আসক্ত, আত্মাকেও অমান্য করেন যে-আত্মা সকল আত্মার সঙ্গে যোগে যুক্ত। তাঁরা যাকে ভূমা বলেন তিনি উপনিষদে-উক্ত সেই ঈশ নন যিনি সকলকেই নিয়ে আছেন; তাঁদের ভূমা সব-কিছু হতে বর্জিত, সুতরাং তার মধ্যে কর্মতত্ত্ব নেই। তাঁরা মানেন না তাঁকে যিনি পৌরুষং নৃষু, মানুষের মধ্যে যিনি মনুষ্যত্ব, যিনি বিশ্বকর্মা মহাত্মা, যাঁর কর্ম খণ্ডকর্ম নয়, যাঁর কর্ম বিশ্বকর্ম; যাঁর স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ— যাঁর মধ্যে জ্ঞানশক্তি ও কর্ম স্বাভাবিক, যে স্বাভাবিক জ্ঞানশক্তিকর্ম অন্তহীন দেশে কালে প্রকাশমান।"

এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ— 'যাঁরা সত্যকে জানেন তাঁরা সর্বমেবাবিশন্তি—সকলের মধ্যেই প্রবেশ করেন।'

দেখা যাইতেছে, মোক্ষের দ্বারা যে আত্মায় স্থিতি তাহাই ব্রহ্মে স্থিতি। আমাদের কাম্য যিনি তিনি যে এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও আবার 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'— তিনি হইলেন সেই সত্য 'যস্মিন্ লোকা নিহিতাঃ', তিনি যে 'সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি', তিনি যে 'সর্বভূতগুহাশয়ঃ', 'সর্বভূতান্তরাত্মা'। এইখানে উপনিষদের ব্যাখ্যায় এবং গ্রহণে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের একটা গভীর মিল দেখিতে পাই। শ্রীঅরবিন্দও বলিয়াছেন, উপনিষদ্‌কে একদল মানুষ অনেকদিন পর্যন্ত ভুলভাবে পড়িয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ধারণা, উপনিষদ্ শুধু নেতিবাদ প্রচার করিয়াছেন— সত্য ইহা নয়, সত্য উহা নয়, সত্য আমরা যাহা কিছু দেখি শুনি জানি তাহার কিছুই নয়। বস্তুরূপে বহুভাবে প্রতিভাত বিচিত্র জগতের মধ্যে কোথাও কোনো সত্য নাই, আমাদের রক্তমাংসের দেহের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের জীবনপ্রবাহের মধ্যে সত্য নাই, আমাদের প্রক্ষোভ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিতরে সত্য নাই, আমাদের আনন্দ-বেদনার মধ্যে সত্য নাই, সত্য হইল সর্বপ্রকারের অস্তিত্ববর্জিত এক 'অসদ্'রূপী সত্য! শ্রীঅরবিন্দ বলিয়াছেন, উপনিষদে সত্য যে এইরূপে বর্ণিত হয় নাই তাহা নহে; কিন্তু শুধু এইরূপেই বর্ণিত হয় নাই। শুধু এইটুকু জানা হইল সত্যকে অর্ধেক করিয়া জানা, বাকি অর্ধেক না জানিলে সত্যকে পূর্ণ করিয়া জানা হয় না। উপনিষদের বর্ণনা 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' হইল সত্যের অর্ধেক বর্ণনা; এই 'একমেবাদ্বিতীম্' বাণীকে উপনিষদের অপর একটি বাণীর সঙ্গে এক সঙ্গে উচ্চারণ এবং অনুধাবন করিতে হইবে— তাহা হইল 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। সুতরাং শুধু নিজেকে জানিলে হইবে না—প্রথমে নিজেকে সর্বব্যাপী একের সঙ্গে যুক্ত করিয়া নিজের ভিতরকার 'একমেবা-দ্বিতীয়ম্'কে জানিতে হইবে, কিন্তু সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেই দেখা যাইবে, সেই একরে লইয়া আবার সকলের ভিতরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছি, একের সৌন্দর্যে সব-কিছুর সৌন্দর্য,

একের মাধুর্যে সব-কিছুর মাধুর্য— একের আনন্দে প্রেমে সব-কিছুর আনন্দ ও প্রেম।

উপনিষদ্‌কে অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত বেদান্তসাধনার যে ধারা তাহার সহিতও এই জন্য রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক যোগ ছিল না। একাকে চাই বটে, কিন্তু সর্বনাশী সর্বগ্রাসী কোনো একাকে চাই না, 'সর্বং ইদং'-এর মধ্যে সৌন্দর্যে মাধুর্যে প্রেমে আনন্দে পরিপূর্ণ একাকে চাই। তাই অধ্যাত্মানুভূতি বলিতে বেদান্ত যেখানে সর্বপ্রকারের জ্ঞাতৃত্ব-জ্ঞেয়ত্ব-বর্জিত আনন্দোপলব্ধির মধ্যে নিঃশেষে আত্মনিমজ্জনের কথা বলেন তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের কোনো লোভ ছিল না; তিনি ইহাকে পরিপূর্ণ ধর্মানুভূতি বলিয়া স্বীকারও করিতেন না। *The Religion of Man*-এর মধ্যে এক স্থানে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—Without disputing its truth I maintain that it may be valuable as a great psychological experience but all the same it is not religion— একটি মানসিক অভিজ্ঞতারূপে ইহার যথেষ্ট মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা ধর্ম নয়। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের সঙ্গে সাধনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যেরূপ মিল ছিল না, দ্বৈতবাদী বেদান্তের সঙ্গেও সেইরূপ মিল ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পরম সত্য এক দিকে যেমন অক্ষর, অপর দিকে তেমনই আবার অনন্ত লীলাময়। এই লীলাময়ত্বের দিক্ হইতে দ্বৈত বেদান্তবাদিগণের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল হইবার কথা ছিল, কিন্তু তাহাও মোটেই হইল না; কারণ, দ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ যেখানে লীলার কথা বলিয়াছেন সে লীলা হইল এক বিশেষ প্রকারের লীলা, অপ্রাকৃত ধামে বসিয়া নিজের স্বরূপের মধ্যে তাঁহার লীলা; প্রাকৃত জগৎ এবং প্রাকৃত জীবনের মধ্যে কোথাও কোনো লীলা নাই। দ্বৈতবাদিগণ জীব ও জগতের সৃষ্টিকারিণী মায়াকে অদ্বৈতবাদিগণের ন্যায় একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন না বটে, সেই মায়াকে

ব্রহ্মাশ্রিতা শক্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়া জীব এবং জগৎকে সত্য বলিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও তাঁহাদের সাধনায় জীব এবং জগতের কোনো সত্যমূল্য দিলেন না। তাঁহারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইলেন অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠে বা বৃন্দাবনে, যাঁহারা লীলা আস্বাদ করিতে চাহিলেন তাঁহারা পরিকরত্ব লাভ করিতে চাহিলেন সেইখানে। এই-জাতীয় ভগবৎ-লীলাও রবীন্দ্রনাথকে কোনোদিনই আকৃষ্ট করে নাই। তিনি যে লীলার কথা বলিয়াছেন তাহার সবটাই এই পরিদৃশ্যমান জগতে—অনাদিকালে এবং অসীম দেশে বিস্তৃত অনন্ত জীবকুলের বিচিত্র জীব লীলায়, তাহাকেই তিনি জীবন ভরিয়া দেখিতে শুনিতে জানিতে বুঝিতে আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন; সীমার মধ্যে যে অসীমের বিচিত্র লীলা তাহা আস্বাদন করাই হইল তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বড় সাধনা।

আসলে কবিধর্মই হইল রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম; সেই কবিধর্মের মূলকথা ছিল বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বজীবনের প্রতি নিবিড় প্রেম; তাঁহার ভিতরে যে অধ্যাত্মস্পৃহা গড়িয়া উঠিতে লাগিল তাহাও বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বজীবনের প্রতি সেই নিবিড় প্রেম লইয়াই গড়িয়া উঠিতে লাগিল। 'একে' প্রতিষ্ঠিত হইয়া না লইতে পারিলে এই লীলাদর্শনের যোগ্যতাই জন্মে না, কারণ, সেই একে প্রতিষ্ঠা ব্যতীত বিশ্বপ্রকৃতির এবং বিশ্বজীবনের যে আনন্দলীলা-রূপ তাহা চোখেই পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাই এই একের মধ্যে প্রতিষ্ঠার অর্থ একের মধ্যে আত্মবিসর্জন নয়, একে প্রতিষ্ঠা হইল বহুর ভিতর দিয়া বিচিত্রলীলাকে পরিপূর্ণভাবে আস্বাদ করিবার জন্য। তাঁহার ধর্মবোধ তাঁহার আপনার মধ্যে নিজে নিজে যেমন গড়িয়া উঠিতেছিল তাঁহার ধর্মসাধনাও তেমন করিয়াই আপনা আপনি তাঁহার ভিতরে গড়িয়া উঠিতেছিল; ধর্মবোধ সম্বন্ধেও পরে সহসা যেমন সচেতন হইয়া উঠিলেন, ধর্মসাধনা সম্বন্ধেও তিনি সেইভাবে সচেতন হইয়া উঠিলেন। যেদিন সচেতন হইলেন তখন উপনিষদের সঙ্গে তাঁহার

গভীর মিল তাঁহাকে সচকিত করিয়া দিল। এ-ক্ষেত্রেও তাঁহার নিজের সাধনাই যে উপনিষদের দ্বারা প্রভাবিত হইতে লাগিল তাহা নহে, নিজের বিশেষ সাধনপ্রবৃত্তি দ্বারাও তিনি উপনিষদ্‌কে তাঁহার সাধনার অনুরূপ করিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন, উপনিষদের সাধনাকেও সেইভাবে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। উপনিষদ্ যেমন তাঁহার মধ্যে অনেকখানি সৃষ্টি করিয়া লইল, তিনি নিজে আবার তেমনই উপনিষদ্‌কে অনেকখানি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া লইলেন। এই সকল গ্রহণ এবং রচনের মূলীভূত কথা হইল উপনিষদের সেই বাণী—'য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্বং ভবতি'—যে এইভাবে জানে যে আমিই ব্রহ্ম—সে এই সব হইয়া যায়।

সকলের ভিতর দিয়া একের স্পর্শলাভ করিবার স্পৃহা লইয়াই রবীন্দ্রনাথ 'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি'র পথকে নিজের জীবনে অস্বীকার করিয়াছিলেন, 'অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় মুক্তির স্বাদ'কেই জীবনের পরমকাম্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।—

এই বসুধার
মৃত্তিকার পাত্রখানি ভরি বারম্বার
তোমার অমৃত ঢালি দিবে অবিরত
নানাবর্ণগন্ধময়। প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির-মাঝে।

'ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসনে'র যে পন্থা সে হইল একেবারে নিবৃত্তির পন্থা; রবীন্দ্রনাথ যে চান প্রবৃত্তির পন্থা; 'এক'কে ছাড়িয়া যে প্রবৃত্তি তাহা পলে পলে বন্ধন, কিন্তু একেকে লইয়া যে প্রবৃত্তি তাহাতেই হইল পলে পলে মুক্তি।

যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।

এইজন্যই কবির চিরজীবনের প্রার্থনা—

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে
এসো গন্ধে বরনে এসো গানে॥
এসো অঙ্গে পুলকময় পরশে,
এসো চিত্তে সুধাময় হরষে,
এসো মুগ্ধ মুদিত দু নয়ানে॥

শুধু বাহিরের প্রকৃতির ভিতর দিয়া 'এসো' তাহাই নয়, জীবনের সব-কিছুর মধ্য দিয়া সর্বানুভূতির মধ্য দিয়াও 'এসো'—জীবনের ভিতর দিয়াও 'এসো'—মরণের ভিতর দিয়াও 'এসো'—

এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে,
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে,
এসো সকল কর্ম-অবসানে॥

'সোনার তরী'র 'দেউল' কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত ধর্মসাধনার বিরুদ্ধে চিত্ত-প্রতিক্রিয়া চমৎকার প্রকাশিত হইয়াছে। সেখানে দেবতার নিভৃত আরাধনার জন্য যে দেউল রচিত হইয়াছিল তাহাতে

রাখি নি তার জানালা দ্বার,
সকল দিক অন্ধকার
ভূধর হতে পাষাণভার
যতনে বহি আনি
রচিয়াছিনু দেউল একখানি।

সেই অন্ধকার দেউলের মধ্যে একাকী দেবতাটিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই দিকে সকল দৃষ্টি নিবদ্ধ করা গেল।—

বাহিরে ফেলি এ ত্রিভুবন
ভুলিয়া গিয়া বিশ্বজন
ধেয়ান তারি অনুক্ষণ
করেছি একপ্রাণে।

মোটের উপরে—

ধ্বনিত এই ধরার মাঝখানে
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে।
ব্যাঘ্রাজিন আসন পাতি
বিবিধরূপ ছন্দ গাঁথি
মন্ত্র পড়ি দিবসরাতি
গুঞ্জরিত তানে,
শব্দহীন গৃহের মাঝখানে।

কিন্তু সহসা—

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্র আসি পড়িল মোর ঘরে।

পাষাণের বাধা টুটিয়া গেল, অন্ধকার গৃহের মাঝখানে দিবস প্রবেশ করিল, নীরব ধ্যান চূর্ণ করিয়া 'সংসারের অশেষ সুর' ভিতরে ছুটিয়া আসিল; দেবতার পানে চাহিয়া দেখা গেল, আলোক আসিয়া তাঁহার মুখে পড়িয়া নূতন মহিমারাশি উদ্ভাসিত করিয়া দিয়াছে; সেদিন দেখা গেল—

যে গান আমি নারিনু রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারিধারে।
আমার দীপ জালিল রবি,
প্রকৃতি আসি আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি
কতই ছন্দহারে।

কবি এক সময়ে কিছুকালের জন্য সমাজপ্রচলিত আনুষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। সে ধর্মমত

সংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মমত ছিল না বটে, তথাপি তাহার মধ্যে অনুষ্ঠানের প্রথাবদ্ধতা ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই দেখা দিয়াছিল কবিচিত্তে একটা প্রতিক্রিয়া। সেই প্রথাবদ্ধ উপাসনার পথ ছাড়িয়া আবার তিনি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিলেন। মনে হয়তো কিছু সংশয় দেখা দিয়াছিল, সেই সংশয়ের উত্তর মিলিয়াছিল নিজের মনেই আবার এক রাত্রিবেলা 'নির্জন শয়ন-মাঝে'; নিজের মধ্যেই বাণী শুনিতে পাইলেন—

ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা,
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা;
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখশোক,
যত ভালোমন্দ, যত গীতগন্ধ লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।
দ্বার রুধি জপিতিস্ যদি মোর নাম
কোন্ পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম!

—নৈবেদ্য, ৩২

এই জন্যই 'চৈতালি'র একটি ক্ষুদ্র কবিতায় কবিকে একেবারে 'তত্ত্বজ্ঞানহীন' হইয়া উঠিবার জন্য পরম উৎসুক দেখিতে পাই—

যার খুশি রুদ্ধ চক্ষে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিম্বা ফাঁকি লভ সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বেরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে।

সত্যের এই অনুসন্ধিৎসায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই কবি সব-কিছুর সহিত যুক্ত হইয়াই মুক্ত হইতে চাহিয়াছিলেন—'যুক্ত করো হে সবার সঙ্গে মুক্ত করো হে বন্ধ'। কবি অনুভব করিয়াছিলেন উপনিষদের মধ্যে

যে 'যোগ' তাহাই সত্যকারের যোগ—কারণ, এই যোগপন্থা সবার সঙ্গেই যুক্ত করিয়া দেয়; মাঝখানে ভারতবর্ষের ধর্মের ইতিহাসে যোগপন্থার যে দীর্ঘদিনের একটা ধারা কবি সেই যোগপন্থার মধ্যে দেখিতে পাইয়াছেন কেবলই বিয়োগ-পন্থা; এই জন্য তিনি এই প্রচলিত যোগপন্থা হইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
—গীতাঞ্জলি

বলিলেন—

বিশ্বজনের পায়ের তলে ধূলিময় যে ভূমি
সেই তো স্বর্গভূমি।
সবায় নিয়ে সবার মাঝে লুকিয়ে আছ তুমি
সেই তো আমার তুমি।
—গীতালি

এই কবি-সাধনা লইয়াই কবি বলিয়াছেন—

ঐ যে ছাতিম গাছের মতোই আছি
সহজ প্রাণের আবেগ নিয়ে মাটির কাছাকাছি,
ওর যেমন এই পাতার কাঁপন, যেমন শ্যামলতা,
তেমনি জাগে ছন্দে আমার আজকে দিনের সামান্য এই কথা।
না থাক্ খ্যাতি, না থাক্ কীর্তিভার,
পুঞ্জীভূত অনেক বোঝা অনেক দুরাশার—
আজ আমি যে বেঁচেছিলেম সবার মাঝে মিলে সবার প্রাণে
সেই বারতা রইল আমার গানে।

৭

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের নিজস্ব ভাবধারার সহিত উপনিষদের ভাবধারার গভীর মিল থাকিলেও এবং রবীন্দ্রনাথের মানসিক সংগঠনের উপরে আশৈশব উপনিষদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাবের কথা সত্য হইলেও এই অনুরূপতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে কোথাও হারাইয়া ফেলিবার ভয় নাই। গভীর মিল থাকিলেও রবীন্দ্রনাথের মনের এবং উপনিষদগুলির ভিতর দিয়া প্রকাশিত মনের সর্বাংশে এক হইবার কথা নয়। মিলের দিকটা ভাবিবার সঙ্গে সঙ্গে পার্থক্যের দিকটাও আলোচনা করা যাইতে পারে। এই পার্থক্যের আলোচনা সর্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ হইয়া উঠিবে যদি যে যে অংশে মিল সেই সেই অংশেই পৃথক পরিণতি ও বিবর্তনের ধারা আমরা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করি।

প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের অদ্বয়ানুভূতির কথা আলোচনা করিতে পারি। পূর্বে বলিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ কোনও সুস্পষ্ট এবং স্থিরবদ্ধ মতবাদ বা বিশ্বাস গড়িয়াও তুলিতে চান নাই, তাহা দ্বারা কঠোর-ভাবে নিয়ন্ত্রিতও হইতে চান নাই; সর্বক্ষেত্রে নিজের বিচিত্র অনুভূতিকে লইয়াই কথা বলিতে চাহিয়াছেন। এই বিচিত্র অনুভূতি তাঁহাকে জীবনে বিচিত্র পথের পথিক করিয়া তুলিয়াছে। প্রধান পথের আশপাশ হইতে নব নব রহস্য তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়াছে, তিনি সেই আকর্ষণের বশে আলোছায়া-ভরা নূতন নূতন পথ ধরিয়া অনেক সময় খানিকটা দূরে দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন; দূরে সরিয়া একেবারে পথ ভুলিয়া যান নাই, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার আসিয়া প্রধান পথে পৌঁছিয়াছেন। এই জন্য রবীন্দ্রনাথের মনের প্রধান ধারার সঙ্গে আশপাশের বহু তির্যক্ ধারা তাঁহার জীবনানু-ভূতিতে আশ্চর্য ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অদ্বয়ানুভূতিও তাই চিরদিন একেবারে একটানা গতিতে প্রবাহিত

হয় নাই। সকল বৈচিত্র্যের পিছনে ঐক্য অবশ্য একটা নিশ্চয়ই আছে—যে ঐক্য এই বিচিত্র অনুভূতিধারার ভিতর দিয়াই রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের মধ্যে একটি বিশেষ ব্যক্তিপুরুষকে গড়িয়া তুলিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অদ্বয়ানুভূতি উপনিষদের অদ্বয়ানুভূতির সহিত কোথায় কতখানি অনুরূপ এ কথা লইয়া আমরা অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, কোথায় কোথায় এ-ধারা পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছে তাহারও বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় একটি ধারা হইল রবীন্দ্রনাথের মহা-মানবতার আদর্শের বিকাশের ধারা।

রবীন্দ্রনাথের অদ্বয়বোধের মধ্যে আমরা যে অখণ্ডজীবনের কথা দেখিতে পাই এই অখণ্ডজীবনের তিনটি দিক্ আছে, তিনটি দিক্ মিলিয়াই এক অদ্বয়বোধ। একটি দিক্ হইল ব্যক্তি-জীবনের অখণ্ডতা; এই একটি জীবনের প্রতিটি ক্ষণকে যুক্ত করিয়াই যে শুধু একটি অখণ্ড ব্যক্তি-জীবন গড়িয়া ওঠে তাহা নয়—তাঁহার ব্যক্তি-জীবনের ইতিহাস শুধু মানুষরূপে বা জীবরূপে জন্ম-জন্মান্তরেরই ইতিহাস নয়—রবীন্দ্রনাথের মতে তাহা হইল লক্ষ লক্ষ যুগের ইতিহাস; ব্যক্তি-জীবনের প্রতিটি সত্যকে ব্যক্তি-জীবনের এই অখণ্ডতার সঙ্গে যুক্ত করিয়া না দেখিতে পারিলে তাহা মিথ্যা হইয়া যাইবে, ব্যক্তি-জীবনের অখণ্ডদৃষ্টিই হইল ব্যক্তি-জীবনের সত্যদৃষ্টি।

অখণ্ডতার দ্বিতীয় দিক্ হইল মহামানবতার অখণ্ড ধারায়। প্রতিটি ব্যক্তি-জীবনের জন্ম-মরণ, উত্থান-পতন, কর্ম-মনন, প্রেম-প্রীতি সমস্ত জড়াইয়া যুগে যুগে দেশে দেশে এক মহামানবতার ধারা চলিয়াছে; ইহার মধ্যে কোনো মানুষটিই পৃথক্‌ভাবে সত্য নয়, নিখিল মানবের সঙ্গে অখণ্ডযোগে প্রতিটি মানুষ সত্য; মানুষের অতীত-বর্তমান-অনাগত সব জুড়িয়া যে অবিচ্ছিন্ন ইতিহাস তাহার

ভিতর দিয়াই মানুষের মহামানবতার অখণ্ডতা। ব্যক্তি-জীবনের অখণ্ডতার ধারা এইভাবে আসিয়া মহামানবতার অখণ্ডতার ধারা সৃষ্টি করিয়া দিল।

আবার এই মহামানবতার ধারা সমগ্র বিশ্বপ্রবাহের ধারার সঙ্গে যুক্ত। অনন্ত মহাকাশে লক্ষ লক্ষ সাবিত্রী-মণ্ডলের যে অনুবর্তন তাহা হইতে এই মহামানবতার বিবর্তন-ইতিহাসকে পৃথক্ করিয়া দেখিবার উপায় নাই। একই উদ্দেশ্য এবং অর্থের মধ্যে এই বিশ্ব-প্রবাহ বিধৃত হইয়া আছে; সুতরাং মানব-জীবনের অখণ্ডতা আবার বিশ্বজীবনের অখণ্ডতার সঙ্গে যুক্ত হইয়া কবির অদ্বয়বোধকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে।

উপনিষদের মধ্যে যে অদ্বয়বোধ দেখা যায় তাহা মোটামুটি ভাবে এই তৃতীয় স্তরের অদ্বয়বোধ; অপর দুই স্তরের অখণ্ডতাকেও রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের সঙ্গে নানাভাবে মিলাইয়া লইতে চাহিয়াছেন বটে, কিন্তু এই দুই স্তরের অখণ্ডতাবোধ রবীন্দ্রনাথের নিজের জিনিস। এই দুই স্তরের অখণ্ডতাবোধের ভিতরে ব্যক্তিজীবনের অন্তর্নিহিত অখণ্ডতার বোধ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও গানে একটি দীর্ঘ বিস্তার লাভ করিয়াছে, সেই দীর্ঘ বিস্তারের ইতিহাস পৃথক্‌ভাবে আলোচ্য, সুতরাং তাহার প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করিতে চাহি না। দ্বিতীয় স্তরে মহামানবতা লইয়া যে অখণ্ডতাবোধ তাহা লইয়াই এখানে বিষদ আলোচনা করিতে চাই।

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস প্রতিটি ব্যক্তি-জীবনের যে বিকশিত হইয়া উঠিবার ইতিহাস তাহার একটি বিশেষ অর্থ আছে, আবার প্রতিটি ব্যক্তি-জীবনের অর্থ একত্রিত হইয়া সমস্ত অতীত-বর্তমান ও অনাগতকে জুড়িয়া যে এক মানবজীবনের ইতিহাস তাহা তাহার একটি অখণ্ড অর্থ গড়িয়া তুলিতেছে। মানুষের অখণ্ড জীবনধারার এই যে অখণ্ড উদ্দেশ্য বা অর্থ তাহা প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের পৃথক্ পৃথক্ অর্থের একটি যোগফল মাত্র নহে; ইহা একটি অনাদি অখণ্ড

আদর্শ বা অর্থ। প্রতিটি ব্যক্তি-মানুষের জীবনধারার অর্থ যেমন নিহিত আছে এক 'মহাদেবে'র (মহান্ দেব) অনাদি স্বপ্নের মধ্যে বা আত্মপ্রকাশ এবং আত্মোপলব্ধির পরিকল্পনায়—তাঁহার ভাবের (idea) মধ্যে ; যাহা নিহিত ছিল ভাবের মধ্যে তাহাই ক্রমাভিব্যক্ত হইতেছে 'ভবে'র মধ্যে—প্রকাশের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসে আবার এই ব্যক্তি-মানুষের সকল পরিকল্পনা বিধৃত হইয়া রহিয়াছে মহামানবের মহাবিকাশের অর্থ ও পরিকল্পনার মধ্যে। এই মহামানবের মহাবিকাশের পরিকল্পনা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া তাই ব্যক্তি-মানুষের কখনও সত্য হইয়া উঠিবার উপায় নাই। যেখানে সে বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড সেইখানেই সে ক্ষুদ্র, সেইখানেই অর্থহীনতার নৈরাশ্য, সেইখানেই মৃত্যুর ভয়, সৃষ্টি-মহাসমুদ্রে মুহূর্তেজাত একটি বুদ্বুদের মত একেবারে হারাইয়া যাইবার ভয়। কিন্তু মহাকাশের এককোণে একটি ক্ষুদ্র তারকা মিট্‌মিট্ করিয়া যতক্ষণ পারে জ্বলিয়া যে নিভিয়া গেল, সে মহাকাশের শূন্যতায় হারাইয়া গেল না—সেও নিত্যকালের জন্য অর্থবান হইয়া উঠিল—কারণ ঐটুকু আলো-বিকিরণের আত্মবিসর্জনের দ্বারা সে বিশ্বজীবনের প্রকাশের ইতিহাসকে অভিব্যক্তির ইতিহাসকে যতটুকু পারে লিখিয়া দিয়াছে। মহামানবের ক্রমাভিব্যক্তির পশ্চাতে সেই 'মহান্ দেবে'র নিশ্চয়ই একটি বিশেষ পরিকল্পনা আছে। সে পরিকল্পনার পরম অর্থ একটা নিশ্চল স্থাবর জিনিস নয়—নিখিল মানব-জীবনপ্রবাহে তাহা একটা নিরন্তর 'হইয়া উঠিবার' অর্থ ; 'মহাদেবে'র পরিকল্পনার পথে নিখিল মানব তাই সকল অভিব্যক্তি লইয়া কেবলই মহামানব হইয়া উঠিতেছে।

নিখিল মানবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পরম শ্রদ্ধা—পরম বিশ্বাস ; কোনও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই তাই মানুষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই শ্রদ্ধা এই বিশ্বাসকে হারাইয়া ফেলেন নাই। মানবেতিহাসের কোনও বিপর্যয়ই এই কারণে রবীন্দ্রনাথকে মহামানবের ভবিষ্যৎ

সম্বন্ধে নৈরাশ্যবাদী করিয়া তুলিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ দেখিয়াছেন মানুষের চৈতন্যের ঐশ্বর্যে ও মহিমায় মানুষ মর্ত্যের সকল সীমা লঙ্ঘন করিয়া দেবমহিমার অধিকারী হইয়া উঠিয়াছে, সীমা-অসীমের—সান্ত-অনন্তের অপূর্ব মিলন ঘটিয়াছে এই মানুষের মধ্যে। মানুষের মধ্যে এই রূপ-অরূপের সীমা-অসীমের মিলন ঘটিবার ফলে আদিদেব মহাদেবের মহাস্বপ্ন বা মহাসঙ্গীত সর্বাপেক্ষা অর্থবান্ হইয়া উঠিয়াছে মানুষের মধ্যে—কারণ মানুষের মধ্যে তাঁহার প্রকাশ হইয়া উঠিয়াছে সুন্দরতম—মধুরতম—গভীরতম। আত্ম-প্রকাশের এই প্রথম স্পন্দন দেখা দিয়াছিল আলোকের প্রথম স্পন্দনে—তাহার পরে চলিতে লাগিল অনন্ত-কালস্রোতে অজস্র জীবনের জাল-বুনানি। কিন্তু সব সত্ত্বেও—

The mystery remains dumb,
the meaning of this pilgrimage,
the endless adventure of existence—
whose rush along the sky
flames up into innumerable rings of paths,
till at last knowledge gleams out from the dusk
in the infinity of human spirit,
and in that dim-lighted dawn
she speechlessly gazes through the
break in the mist
at the vision of Life and of Love
emerging from the tumult of profound
pain and joy.

সমগ্র সৃষ্টির ভিতর দিয়া এই যে অজস্র জীবনের তীর্থযাত্রা—এই যে অনন্ত অস্তিত্বের অভিযান—ইহা আপন রহস্য খুঁজিতেছিল—অর্থ খুঁজিতেছিল—সত্য খুঁজিতেছিল; কিন্তু সৃষ্টির রঙ্গমঞ্চে মানুষের আবির্ভাবের পূর্বপর্যন্ত এই অর্থের অভিব্যক্তি ঘটে নাই—সৃষ্টির সমস্ত রহস্য মৌন হইয়াছিল। তাহার পরে অস্পষ্টতার সকল কুজ্ঝটিকা বিদীর্ণ করিয়া ঘটিল মানুষের আবির্ভাব—দেখা

দিল তাহার মধ্যে প্রাণের বিচিত্র ধারা—মনের আনন্দলীলা—প্রেমের অতলস্পর্শ রহস্য.; মানুষের চেতনার মধ্যে দেখা দিল গভীর বেদনা ও আনন্দের যে আলোড়ন তাহার ভিতর দিয়াই উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল সৃষ্টির রহস্য! এই কথারই স্মরণ করিয়াছেন কবি তাঁহার 'জন্মদিনে'—

লক্ষ কোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।
এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়াছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি;
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়
অসংখ্য দিবসরাত্রি-অবসানে
মন্থরগমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে;
নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী;
অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,

পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা—
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।—৫ সং

সৃষ্টিপ্রবাহে স্তরে স্তরে জড়ের আবরণ ভেদ করিয়া ক্রমে ক্রমে যে প্রাণের প্রকাশ—সেই প্রাণের ভূমিতে যে আবার চৈতন্যের মহা অবতরণ—প্রকাশের পথে এইখানেই সৃষ্টির অগ্রগতি। এই চতন্যই জীবন-মহাদেবের মন্দিরের প্রজ্বলিত প্রদীপমালা—জীবন-মহাদেবের রহস্যকেও প্রকাশিত করিতেছে—মহিমাকেও ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছে।

'বলাকা'র একটি কবিতায় কবি তাই বলিয়াছেন—

স্বর্গ আজি কৃতার্থ তাই আমার দেহে,
আমার প্রেমে আমার স্নেহে,
আমার ব্যাকুল বুকে,
আমার লজ্জা, আমার সজ্জা, আমার দুঃখে সুখে।
আমার জন্ম-মৃত্যুরি তরঙ্গে
নিত্যনবীন রঙের ছটায় খেলায় সে-যে রঙ্গে।

এই চৈতন্যের অধিকারেই সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও বনের সুন্দরতম ফুলকেও মানুষ পরাজিত করিয়া দিয়াছে, কারণ ফুলের সৌন্দর্য সৌন্দর্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু মানুষের ভিতর চৈতন্যের স্পর্শে সৌন্দর্য আরও রহস্যান্বিত এবং মহিমান্বিত হইয়া রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে প্রেমে। বনের ফুল তাই নারীমুখ দেখিয়া তাহার অকুণ্ঠ স্বীকৃতি দিয়াছে—একদিন আদিম প্রভাতে প্রথম আলোকে জাগিয়া উঠিয়া একই প্রাণচ্ছন্দে সে এক সাথে নারীর সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিল—

অবশেষে দেখিলাম কত জন্ম পরে নাহি জানি
ওই মুখখানি।
বুঝিলাম আমি আজো আছি
প্রথমের সেই কাছাকাছি,
তুমি পেলে চরমের বাণী।
তোমার আমার দেহে আদিছন্দ আছে অনাবিল
আমাদের মিল।
তোমার আমার মর্মতলে
একটি সে মূল সুর চলে,
প্রবাহ তাহার অন্তঃশীল।
কী যে বলে সেই সুর, কোন্ দিকে তাহার প্রত্যাশা,
জানি নাই ভাষা।
আজ সখি, বুঝিলাম আমি
সুন্দর আমাতে আছে থামি,
তোমাতে সে হল ভালোবাসা।

—বিচিত্রিতা, পুষ্প

এই যে মহিমান্বিত মানুষ, চেতনার অসীম বিকাশে অফুরন্ত যাহার অধিকার শক্তিতে সৌন্দর্যে প্রেমে কল্যাণবোধে—সেই মানুষের ইতিহাসকে রবীন্দ্রনাথ কখনও একটা উদ্দেশ্যবিহীন প্রবাহমাত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই—নিখিল মানুষের জীবনযাত্রা সেই পরম উদ্দেশ্যের পথে কেবলই হইয়া উঠিবার ইতিহাস—ইহাই তাহার অগ্রগতি। ব্যক্তি-জীবনের সকল প্রসার এবং অগ্রগতি এই মহামানবের—শাশ্বত সর্বব্যাপী মানবের—প্রসার ও অগ্রগতির সঙ্গে যুক্ত; এই ব্যক্তি-মানব ও শাশ্বত সর্বব্যাপী মহামানব—ইহার সকল জুড়িয়া রহিয়াছে সেই এক সত্য যিনি 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'—আজকালের মানুষ নহে—এই দেশের মানুষ নহে—যে মানুষ নিত্য সত্য—সর্বত্র সত্য—সেই মানুষের প্রত্যেকের হৃদয়ে পরম সত্য পরম অর্থরূপে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন।

'প্রভাতসংগীত' হইতেই আমরা রবীন্দ্রনাথের কবি-মনে এই অখণ্ড মানবতাবোধের আভাস দেখিতে পাই এবং এই মহামানবের সঙ্গে নিবিড় যোগেই যে ব্যক্তি-মানবের মুক্তি এ কথারও আভাস পাই। আমরা এই সময়কার কবির বিশ্বৈক্যবোধের কথা পূর্বেই আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। সেই বিশ্বৈক্যবোধ ব্যবহারিক জীবনে সক্রিয় হইয়া উঠিতে চাহিয়াছে সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে যোগে আর প্রেমের ভিতর দিয়া নিখিল মানবের সঙ্গে যোগে। 'প্রভাতসংগীতে' কবি যেখানে বলিয়াছেন—

> হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
> জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
> ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
> আসিছে প্রাণে মোর, হাসিছে গলাগলি।

তখন প্রকাশভঙ্গির মধ্যে যতই একটা হঠাৎ উত্তেজনার আভাস থাক, সব জিনিসটাকেই একটা সস্তা হৃদয়োচ্ছ্বাস বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল করা হইবে; ইহার মধ্যে রহিয়াছে স্বধর্মের প্রথম আবিষ্কারের আনন্দ-স্পন্দন। এই স্পন্দনই প্রকাশলাভ করিতেছে উচ্ছ্বাস-আবেগের সুরেই 'কড়ি ও কোমলে'র অনেক কবিতার মধ্যে।

> যাত্রী সবে ছুটিয়াছে শূন্যপথ দিয়া
> উঠিছে সংগীত কোলাহল—
> ওই নিখিলের সাথে কণ্ঠ মিলাইয়া
> মা, আমরা যাত্রা করি চল্।

নিখিল মানুষের সঙ্গে যোগের আকাঙ্ক্ষা এখন পর্যন্ত অন্ধ আবেগেই প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু ছোট আমির মধ্যে যেখানেই বন্ধন সেখানে হৃদয়ের ক্রন্দন জাগিয়া উঠিতেছে, সে ক্রন্দন কৃত্রিম বিলাপ নহে—সে ক্রন্দন বিকাশপ্রার্থী আত্মার ক্রন্দন।—

> মগ্ন থাকি আপনার মধুর তিমিরে,
> দেখি না এ জগতের প্রকাণ্ড জীবন।

কেন আমি আপনার অন্তরালে থাকি !
মুদ্রিত পাতার মাঝে কাঁদে অন্ধ আঁখি।

ইহার পরে 'মানসী'র মধ্যে দেখিতে পাই, চঞ্চল হৃদয় লইয়া প্রথম প্রেমে উদ্বেল কবি ভোগের দৃষ্টিতে মানবের দিকে তাকাইয়াই আত্ম-সচকিত হইয়া উঠিয়াছেন, হৃদয়ে অনুভব করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেই মহামানবের মহিমান্বিত রূপ যাহা—

অতি সযতনে,
অতি সংগোপনে,
সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে,
বিপদে সম্পদে,
জীবনে মরণে
শত ঋতু আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি। —নিষ্ফল কামনা

পরবর্তী কালে কবি মহামানব সম্বন্ধে যে-সকল কথা বলিয়াছেন তাহার অনেক কথারই গূঢ় ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়াছে এই স্তবকটির মধ্যে ; প্রথমতঃ 'সুখে দুঃখে, নিশীথে দিবসে, বিপদে সম্পদে, জীবনে মরণে' মহামানবের নিরন্তর যাত্রা ; দ্বিতীয়তঃ সে যাত্রার ভিতর দিয়া মহামানবতার কালপ্রবাহে শতদলের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার কথা, মহামানবতা যে একটা নিশ্চল আদর্শ নয়— তাহা যে সকল লোকের জানার অগোচরে 'অতি সংগোপনে'— কিন্তু 'অতি সযতনে' যুগ যুগ ধরিয়া গড়িয়া উঠিতেছে তাহার কথা ; তৃতীয়তঃ দেখিতে পাই, এই ফুটিয়া ওঠা শুধু অন্ধশক্তির বিপুল আবেগে নয়, ইহার পশ্চাতে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, সেই জন্যই ইহা বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, 'বিশ্বজগতের তরে' এবং 'ঈশ্বরের তরে'।

'সোনার তরী'র কবিতার মধ্যেও কবির 'মহামানবে'র ধারণার

প্রকাশ দেখিতে পাই, এবং সেখানেই স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে পাই যে এই মহামানবের মানস সেই বিশ্বপ্রশাসনিকের প্রশাসনেই নিয়ন্ত্রিত হইতেছে যাহার প্রশাসন কাল-যন্ত্রের বিচিত্ররাগিণী রূপে নিরন্তর ছড়াইয়া পড়িতেছে।—

ওই কে বাজায় দিবস-নিশায়
বসি অন্তর আসনে।
কালের যন্ত্রে বিচিত্র সুর—
কেহ শোনে কেহ না শোনে।
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিন্তিছে তাই,
মহান মানব মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।—বিশ্বনৃত্য

এই 'সোনার তরী'তেই স্পষ্ট উক্তি দেখিতে পাই—

হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে। —খেলা

এই কথাই আরও গভীর জীবন-প্রত্যয়ের সহিত যুক্ত হইয়া এবং আত্ম-প্রতিক্রিয়ার অধিক বেগ সঞ্চয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে 'চিত্রা'র সুপ্রসিদ্ধ বাণীতে—

স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহা বিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।

'নৈবেদ্যে'র কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া কিছু দিন পর্যন্ত যখন কবিতায় ও গানে কবির অধ্যাত্মচেতনা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল, বিশ্বের কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত 'এক' যখন কবির চেতনা-কেন্দ্রকেও অধিকার করিয়া বসিল, তখনও কবি মানুষের জগৎ এবং

মানুষের জীবন হইতে দূরে সরিয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই, বিশ্বের ভিতর দিয়াই বিশ্বরাজকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন—

বিশ্বের সবার সাথে হে বিশ্বরাজন্,
অজ্ঞাতে আসিতে হাসি আমার অন্তরে
কত শুভদিনে ;

আবার অন্যটাও সত্য ; বিশ্বরাজা যখন আসেন তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের সকলেই অন্তরে প্রবেশ করে—

মহারাজ, তুমি যবে এস সেই সাথে
নিখিল জগৎ আসে তোমারি পশ্চাতে —৩৪সং

যত দিন যাইতে লাগিল ততই লক্ষ্য করিতে পারি, নিখিল মানবকে অবলম্বন করিয়া কবির যে একটা অধ্যাত্ম অদ্বয়বোধ তাহা ধীরে ধীরে তাঁহার ইতিহাসবোধের সঙ্গে যুক্ত হইয়া মানব-ইতিহাসকেই একটা অধ্যাত্ম-বিবর্তনের বহিঃপ্রকাশে রূপদান করিতে লাগিল। ইহার পূর্ব পর্যন্ত কবি নিখিল মানবের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু সে নিখিল মানব কবির মনে অনেকখানি যেন একটা অনির্দেশ্য সত্য ছিল, তাহার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ ছিল একটা অস্পষ্ট স্মরণে। কবি বিশ্বমানবপ্রেমের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে—ইতিহাসের রূঢ় সত্যের মধ্যে তাহা কি রূপ গ্রহণ করিবে—ইহা স্পষ্ট হইয়া ওঠে নাই। প্রথম প্রথম কবি ইতিহাসকে তাঁহার অধ্যাত্ম অদ্বয়বোধের সঙ্গে যেখানে যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন সেটা একটা গভীর রহস্যবাদের পন্থায়। 'উৎসর্গে'র মধ্যে একটি কবিতায় যখন এই ইতিহাসের কথা আসিয়াছে তখন দেখি মানুষের বাস্তব ইতিহাসকে বিশ্বপ্রবাহের সহিত অচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত একটি প্রবাহ বলিয়াই গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই বিশ্বপ্রবাহের ভিতর দিয়া নিশিদিন লীলা করিতেছে যেন একটি নিত্যকালের 'তুমি'—যিনি রবীন্দ্রনাথের 'অনাদি এক'—আর একটি

বিশ্বছন্দের সঙ্গে যুক্ত—বিশ্বছন্দের ভিতর দিয়া নিত্য প্রকাশমান ক্রমবর্ধনশীল 'আমি'। এই এক 'আমি'ই যেন মানব-ইতিহাসের সকল 'আমি'র ভিতর দিয়া বিকাশচ্ছন্দে এবং লীলাচ্ছন্দে বহিয়া আসিয়াছে—

প্রাচীন কালের পড়ি ইতিহাস
সুখের দুখের কাহিনী—
পরিচিত সম বেজে ওঠে সেই
অতীতের যত রাগিণী।
পুরাতন সেই গীতি
সে যেন আমার স্মৃতি,
কোন্ ভাণ্ডারে সঞ্চয় তার
গোপনে রয়েছে নিতি।
প্রাণে তাহা কত মুদিয়া রয়েছে
কত বা উঠিছে মেলিয়া—
পিতামহদের জীবনে আমরা
দুজনে এসেছি খেলিয়া।—১৩ সং

এই যে পিতামহদের জীবনের ভিতর দিয়া সেই নিত্যকালের 'তুমি' এবং নিত্যকালের 'আমি'র খেলিয়া আসা ইহার স্বরূপ যে কবির কি-জাতীয় রহস্যবোধের দ্বারা আবৃত তাহা এই স্তবকটির অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তবকটিকে অনুধাবন করিলেই বোঝা যাইবে—

তৃণরোমাঞ্চ ধরণীর পানে
আশ্বিনে নব আলোকে
চেয়ে দেখি যবে আপনার মনে
প্রাণ ভরি উঠে পুলকে।
মনে হয় যেন জানি
এই অকথিত বাণী,
মূক মেদিনীর মর্মের মাঝে
জাগিছে যে ভাবখানি।

এই প্রাণে ভরা মাটির ভিতরে
কত যুগ মোরা যেপেছি,
কত শরতের সোনার আলোকে
কত তৃণে দোঁহে কেঁপেছি।

ইহা কবির একটি বিশুদ্ধ মিস্টিক দৃষ্টি ; ইহা ততখানি ব্যাবহারিক অভিজ্ঞতা-নির্ভর নয় যতখানি একটা সহজাত-প্রবণতা-নির্ভর। এ মিস্টিক দৃষ্টি হইল সেই মিস্টিক দৃষ্টি—যে দৃষ্টি লইয়া কবি গান করিয়াছেন—

তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি—
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহু ডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

৮

কিন্তু যাহা কবিমনের মধ্যে নিহিত ছিল একটা গভীর রহস্য-বাদে—যাহা ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়া উঠিত স্মৃতিরূপে তাঁহার সহজাত-প্রবণতারই অনিবার্যতায় তাহাই ক্রমে ক্রমে একটা বলিষ্ঠরূপ ধারণ করিতে লাগিল তাঁহার কর্মজীবনের ভিতর দিয়া। স্বদেশী আন্দোলন, কংগ্রেস আন্দোলন, অস্পৃশ্যতাবর্জনের আন্দোলন, শান্তিনিকেতন এবং শ্রীনিকেতনকে কেন্দ্র করিয়া বহুমুখে মানব সেবার প্রয়াস কবিকে শুধু স্বপ্নে বা স্মৃতিতে বা একটা অস্পষ্ট আদর্শে মহামানবের সহিত যুক্ত করিল না, যুক্ত করিল বাস্তবজীবনের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায়। অনুভূতি ও মনন বাস্তব কর্মে বা কর্মপ্রেরণায় রূপান্তরিত হইয়া নূতন সত্যমূল্য লাভ করিতে

লাগিল। মানুষের সমগ্র ইতিহাস—সেই সমগ্র ইতিহাসজোড়া যে অখণ্ড মানুষ—তাহা আর কবিচিত্তে একটা অমূর্ত ভাবমাত্রে পর্যবসিত রহিল না, নিত্যকালের বিশ্বমানবও সত্যকারের ইতিহাসবোধের ভিতর দিয়া মূর্তিলাভ করিল। কবি নিজে বিশ্বজোড়া কর্মচেষ্টায় জড়াইয়া পড়িলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার দীর্ঘ জীবনে মানুষের ইতিহাসে যেখানে যে কর্মপ্রচেষ্টা মানবজীবনকে ধিক্কৃত করিয়া দিয়াছে বা মহিমান্বিত করিয়া দিয়াছে ধ্যান-মননে তাহার সহিত নিজেকে তিনি যুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যেখানে অশুভ-কর্মের দ্বারা মানুষের ইতিহাস ধিক্কৃত সেখানকার সে ধিক্কার রবীন্দ্রনাথের নিকটে তাঁহার নিজের জীবন-ধিক্কারের তীব্র অনুভূতি লইয়াই উপস্থিত হইয়াছে; মহৎ কর্মে মানুষের ইতিহাস যেখানে উজ্জ্বল সেই ঔজ্জ্বল্যে নিজের জীবনকেই মহিমান্বিত করিয়া দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই চেষ্টার পশ্চাতে যে কতখানি নিষ্ঠা, সততা এবং বিচক্ষণতা ছিল রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তরে' প্রকাশিত কতকগুলি প্রবন্ধের মধ্যে তাহার স্পষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। ইতিহাস-চিন্তা যে কবির পক্ষে বিলাসমাত্র ছিল না, মানুষের ইতিহাস যে কবির জীবনে অনুকূল-প্রতিকূল উভয়বিধ আলোড়নের উদ্বোধে কতখানি সত্য হইয়া উঠিয়াছে এই লেখাগুলি তাহারই প্রমাণ বহন করে।

কর্মে চিন্তায় এবং সেবাবোধের বিপুল আগ্রহে জীবনের সঙ্গে কবির যে যোগ, সে যোগ মহামানবতার সহিত অন্বয়যোগের দর্শনকে কবিচিত্তে একটি বলিষ্ঠরূপ দান করিল, সেই বলিষ্ঠরূপের পরিচয় প্রকাশিত হইয়াছে কবির অক্স্‌ফোর্ডে প্রদত্ত 'হিবার্ট লেক্‌চার্‌স্‌'-এ —যাহার বিষয়বস্তু ছিল *The Religion of Man*; এখানকার বক্তব্যেরই প্রসার দেখিতে পাই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'কমলা বক্তৃতামালা'য়—যাহার বিষয় ছিল 'মানুষের ধর্ম'।

হিবার্ট বক্তৃতা দিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথ প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে,

তাঁহার বক্তৃতার বিষয় হইল 'The idea of the humanity of our God, or the divinity of Man the Eternal', ভগবানের মানবীয়তা, অথবা শাশ্বত মানুষের ভগবত্তা। একটি অথবা দ্বারা দুইটি জিনিসকে যখন জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তখন বুঝিতে হইবে, কবির নিকটে এই উভয়ই সমার্থক। বেশ বোঝা যাইতেছে, এখানে কবির যে ভগবত্তার ধারণা তাহা কোনও নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, সন্মাত্রে পর্যবসিত ভগবত্তার ধারণা নয়; ভগবত্তা একটা নিত্যকালের সৃজনশীল শক্তি প্রতিমুহূর্তে যাহা সৃষ্টির ভিতর দিয়া নিজের অনন্ত সম্ভাবনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া দিতেছে। পূর্বেই দেখিয়াছি, ভগবত্তার অন্তর্নিহিত যে সৎ-চিৎ-আনন্দের সম্ভাবনা তাহার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ মানুষে—কোনও অবতারে নয়—কোনও নির্দিষ্ট ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষের ভিতরে নয়—যত মহান্‌ই হোন না কেন, অন্য কোনও ব্যক্তিবিশেষের ভিতর দিয়াও নহে—সে প্রকাশ মানুষের অখণ্ড ইতিহাসে—সেই অখণ্ড ইতিহাসে ব্যাপ্ত যে নিত্যকালের মানুষ তাহার ভিতর দিয়াই প্রকাশ ভগবত্তার ভিতরে নিহিত সকল মনুষ্য-সম্ভাবনা। নিখিল মানুষের নিরন্তর বিকাশের ভিতর দিয়াই ঘটিতেছে ভগবত্তার নিরন্তর অবতরণ, নিখিল মানুষই তাই হইল ভগবত্তার যথার্থ অবতার।

সৃষ্টিবিকাশের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও বিবর্তনবাদী; এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিবর্তনেই বিশ্বাসী, শুধু মৌলিক পার্থক্য হইল এইখানে, এই বিবর্তনের পিছনকার কারণকে তিনি শুধুমাত্র বস্তু-প্রকৃতির ভিতরকার 'আকস্মিক পার্থক্য', বা 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বা 'পরিবেশ পরিবর্তন' বলিয়া স্বীকার করিতেন না; রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধৃত ভগবত্তা একটি চৈতন্যময় সৃজনীশক্তি—এই চৈতন্যের ভিতরেই নিহিত আছে মানুষের জন্য একটি মঙ্গলের আদর্শ—একটি পূর্ণতার আদর্শ। এই পূর্ণতার আদর্শটি কি? রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসে পরিপূর্ণ মানবত্তা হইল বিধাতার বা বিশ্বের

অন্তর্নিহিত এবং বিশ্ববিধির পরিচালক চৈতন্যময় সৃজনীশক্তির চৈতন্যে ধৃত একটি চিরন্তন সত্য ; বিধাতার মানস-সরোবরে তাহার স্থিতি সম্ভাবনা রূপে ; সেই সম্ভাবনাই বিষয়ীকৃত নিখিল মানবের ইতিহাসে। মানুষের পক্ষে পূর্ণতার আদর্শ হইল বিধাতার মানস-ধৃত পরিকল্পনার সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে ফুটাইয়া তোলার আদর্শ। যুগ যুগ ধরিয়া সৃষ্টির ভিতরকার বিবর্তনধারা একদিন মানুষের ইতিহাসে আসিয়া নিজেকে বিকশিত করিয়াছে ; রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, সৃষ্টি-বিবর্তনের প্রত্যেকটি স্তরের তথ্যকে বিশ্লেষণ করিলেই বোঝা যাইবে, চৈতন্যসমৃদ্ধ মানুষকে গড়িয়া তুলিবার জন্যই মনুষ্যপূর্ববর্তী সৃষ্টি-বিবর্তনের সকল চেষ্টা ; মানুষ সৃষ্টি হইবার পরে সেই মানুষকে সর্বভাবে বিকশিত করিয়া তোলাই হইল বিশ্বপ্রকৃতির সকল চেষ্টার লক্ষ্য। বিশ্বপ্রবাহকে এইভাবেই মানুষের ইতিহাসধারার সঙ্গে যুক্ত করিয়া লইতে হইবে। মানুষের মধ্যে আসিয়া সৃষ্টি-বিবর্তন একটা নূতন মূল্য লাভ করিয়া পৃথক পথে যাত্রা আরম্ভ করিলেও বিশ্বপ্রবাহের ইতিহাস হইতে মানুষের ইতিহাস বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে নাই, কারণ বিশ্বপ্রবাহের সব কিছুই অর্থলাভ করিয়াছে মহামানবের মধ্যে। সুতরাং কবির মতে বৈজ্ঞানিকগণ যাহাকে বহির্বিশ্ব বলিয়া বর্ণনা করেন তাহাও আসলে হইল মানুষেরই বিশ্ব।

সৃষ্টির ভিতরে আমরা যে বস্তুপ্রবাহ দেখিতে পাই তাহার ভিতর দিয়া ভগবৎ-ইচ্ছার পরিচয় পাই-সকল বস্তুর অন্তর্নিহিত একটা পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতরে ; জড়বস্তুর ভিতরেও আমরা এই সত্য লক্ষ্য করি—এই সত্য নিহিত প্রথম যুগ হইতে জৈব-প্রবাহের ভিতরেও। মানুষের দেহের মধ্যে এই অন্তর্নিহিত পারস্পরিক সম্বন্ধের নীতি সর্বাপেক্ষা পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে মানুষ এই দেহস্থ পারস্পরিক সম্বন্ধে অনুভূতি অপেক্ষাও একটা প্রকাণ্ড বড় অনুভূতিলাভ করিল তাহার গভীর

সত্তায়—যেখানে সে দেখিল, নিজেকে যেখানে সে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে সেইখানেই সে নিজেকে সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিতেছে, —অন্যদিকে প্রেমে কর্মে সেবায় সে মানুষের সঙ্গে যতই নিজেকে যুক্ত করিয়া দিতেছে ততই তাহার ভিতরকার বৃহৎকে—মহৎকে—এক কথায় তাহার ভিতরকার 'ব্রহ্ম'কে উপলব্ধি করিতে পারিতেছে। জীবকোষের পারস্পরিক যোগে গঠিত তাহার দেহ জন্মে এবং মরে, কিন্তু বহুজনের মধ্যে ব্যাপ্ত তাহার মনুষ্যত্বের কখনও বিনাশ নাই। মানুষের সহিত এই মিলনের দ্বারাই মানুষ তাহার ভিতরকার নিত্যস্বরূপকে অনুভব করে—প্রেমে অনুভব করে তাহার স্বরূপের অসীমতা।

এই যুগে রবীন্দ্রনাথ এই যে মহামানবের ভিতরকার ঐক্যকে উপলব্ধি করিলেন, এই ঐক্য একটা ব্যক্তি-মানসে ধৃত চিন্তা বা ধারণা মাত্র নয়, এ ঐক্য তাঁহার কাছে জীবন্ত সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল, কারণ এই ঐক্যের বোধ তাঁহার ভিতরে জাগাইয়া দিয়াছিল বিপুল জীবন-প্রেরণা। জীবনে যাহা অফুরন্ত প্রেরণা দেয় তাহাই জীবনের পরম সত্য।

এস্থলে হয়ত বলা যাইতে পারে, মানুষের মধ্যে এই যে ঐক্যবোধ ইহাকে একটা অধ্যাত্মসত্যের রূপ দিবার প্রয়োজন কি? মানুষ স্বরূপতঃ একটি সামাজিক জীব; সেই সামাজিক জীব হিসাবে তাহার যে সমাজবোধ—সমাজের প্রতি তাহার যে আনুগত্য তাহা হইতেই তাহার এই ঐক্যবোধ প্রসূত হইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় উক্তির মুখোমুখী দাঁড়াইয়া কখনও প্রত্যুক্তি করেন নাই; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পূর্বাপর মত বিচার করিয়া এ কথার জবাব দিতে হইলে বলিতে হয়, এখানে গোড়াতেই মস্ত ভুল করা হইল। ঐ যে বলা হইল মানুষ প্রকৃতিতেই একটি সামাজিক জীব সেইখানেই স্বীকার করিয়া লওয়া হইল যে মানুষ প্রকৃতিতেই একটি অধ্যাত্ম জীব। প্রকৃতিতে সামাজিক জীব হওয়া শব্দের

অর্থই হইল প্রকৃতির মধ্যে আত্ম-অতিক্রম করিয়া অপর সকলের সহিত মিলিত হইবার একটা অনিবার্য ঝোঁক; মানুষের পক্ষে এই প্রকৃতিগত ঝোঁকটাই হইল একটা প্রকৃতিগত অধ্যাত্মপ্রেরণা—সেই অধ্যাত্মপ্রেরণা হইতেই আসে সকল ঐক্যবোধ। নিখিল মানবের সঙ্গে মিলনের এই চেতনাই হইল একটা পরম আধ্যাত্মিক সত্য; এই চেতনাকে সেবাবুদ্ধিপ্রণোদিত কর্মের দ্বারা জীবনে সার্থক করিয়া তোলাই হইল মানুষের ধর্ম। এই ধর্মই মানুষের সকল ইতিহাসকে ধারণ করিয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, বাহিরের জগতের সঙ্গে একটা দৃষ্টির সম্পর্ক স্থাপন করিবার জন্য যেমন আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয় রহিয়াছে, এইরূপ আমাদের ভিতরে এমন একটি অন্তরিন্দ্রিয় রহিয়াছে যাহা মানুষের পরমাত্মার সহিত—বিশ্বমানবতার সহিত আমাদিগকে যুক্ত করিয়া দিবার শক্তি রাখে। মানুষের এই যে উজ্জ্বল মনন—ইহার সর্বোত্তম স্তরটি শুধু মানুষের মধ্যেই সম্ভব। এই মনন আমাদের মধ্যে বিশ্বমানবতার সহিত যোগে একটা পূর্ণতার বোধ জাগাইয়া তোলে—এই পূর্ণতাবোধেই মানুষের অমরতা। ব্যক্তি-মানবের নিকটে এই যে একটা পূর্ণতাবোধ ইহা হয়ত একটা আদর্শমাত্র, কিন্তু 'আদর্শ' বলিয়া মানুষের জীবনে ইহা অলীক নয়। 'মানুষের ধর্মে'র ভিতরে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একটা নিগূঢ় নির্দেশ। কোন্ দিকে নির্দেশ। যেদিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, যেদিকে তার পূর্ণতা, যেদিকে ব্যক্তিগত সীমাকে সে ছাড়িয়ে চলেছে, যেদিকে বিশ্বমানব।"

পূর্ণতার আদর্শ শুধু নিখিল দেশ-কালে ব্যাপ্ত যে শাশ্বত মানুষ তাহাকে অবলম্বন করিয়াই সম্ভব হইয়া উঠিতে পারে; এ আদর্শ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে জাগায় শ্রদ্ধা প্রীতি ভালোবাসা—জাগায় এই পূর্ণতাকে লাভ করিবার তীব্র বাসনা। কিছু বুদ্ধি এবং অনেকখানি শারীরিক বল অনেক প্রাণীর মধ্যেই রহিয়াছে, কিন্তু

মানুষের মধ্যে যে বল ও বুদ্ধি রহিয়াছে তাহার সবটাকেই সে বিকশিত করিয়া তুলিতে চায় তাহার মধ্যে যে একটি অমর পূর্ণ নিত্য সত্তা রহিয়াছে তাহার উপলব্ধিকে গভীর এবং অনন্তপ্রসারী করিয়া তুলিবার জন্য। এই যে পূর্ণতার পথে অভিসারের অন্তর্গূঢ় বাসনা ইহাই মানুষকে প্রচোদিত করে সৃষ্টিকর্মের দিকে—যে সৃষ্টিকর্মের ভিতর দিয়া মানুষের ভিতরকার ভগবত্তাই প্রকাশিত হইতে থাকে। নিরন্তর কর্মের মধ্য দিয়া যে এই মানুষের ভিতরকার ভগবত্তার প্রকাশ—এই প্রকাশই মানুষের ভিতরকার মানবতার প্রকাশ। মানবতার এই প্রকাশ হইল সত্য শিব এবং সুন্দরের ভিতর দিয়া প্রকাশ; এই প্রকাশ শুধু স্বার্থসিদ্ধির জন্য নহে—এ প্রকাশ নিজেকে প্রকাশ করিবার জন্যই। 'মানুষের ধর্মে'র মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"মানুষও আপন অন্তরের গভীরতর চেষ্টার প্রতি লক্ষ্য করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত মানুষের একাত্ম। সেই বিরাট মানব 'অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্'। সেই বিশ্বমানবের প্রেরণায় ব্যক্তিগত মানুষ এমন সকল কাজে প্রবৃত্ত হয় যা তার ভৌতিক সীমা অতিক্রমণের মুখে। যাকে সে বলে ভালো, বলে সুন্দর, বলে শ্রেষ্ঠ; কেবল সমাজরক্ষার দিক থেকে নয়, আপন আত্মার পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির দিক থেকে।"

এই ভাবে ব্যক্তিকর্মের মধ্য দিয়া যে ব্যক্তি-প্রকাশ তাহাই মহামানবের ভিতর দিয়া মহামানবতার প্রকাশকে সম্ভব করিয়া তুলিতেছে। ব্যক্তি-মানুষকে বাঁচিতে হইবে মহামানবের জন্য, এবং তাহার ভিতর দিয়াই মহামানবের ক্ষুদ্রতম একটি অংশকে প্রকাশের দ্বারা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য তাহার নিজেকে প্রকাশ করিতে হইবে নিষ্কাম কর্মে, বিজ্ঞানে দর্শনে সাহিত্যে শিল্পে—সেবায় ও পূজায়। মানুষের মনে যত ধর্মমত জাগিয়া উঠিয়াছে তাহারা যে নাম এবং রূপই গ্রহণ করুক না কেন, সকল ধর্মের ভিতর দিয়া

মানুষ একমাত্র এই মহামানবত্তার প্রকাশচেষ্টা রূপ মূল সত্যকেই আশ্রয় করিয়াছে।

বাঙলাদেশের বাউলগণ যখন 'মনের মানুষে'র কথা বলিয়াছেন তখন রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে যুগযুগান্ত ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়া সুন্দরতম মধুরতম পূর্ণতম প্রকাশ খুঁজিতেছে যে মানুষ তাহার কথাই মনে করিয়াছেন। বাউল কবিগণের গানের পূর্বাপরের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া বিচার করিলে বাঙলার বাউলকবিগণ তাঁহাদের গানে 'মনের মানুষ' কথার ভিতর দিয়া মানুষের ভিতরকার এই প্রকাশমান মানুষ বা প্রকাশমান ভগবত্তার কথাই যে বলিয়াছেন একথা স্বীকার করা যায় না। কিন্তু বাউলগণের একতারার সুর রবীন্দ্রনাথের মনে গিয়া এই সুরেরই ঝঙ্কার তুলিয়াছে—এবং এই অর্থ বা ব্যঞ্জনা লইয়াই বাউল গান রবীন্দ্রনাথের নিকটে এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। গগন হরকরার যে গানটি রবীন্দ্রনাথের মন অধিকার করিয়াছিল এবং যে গানকে তিনি তাঁহার বহু লেখায় বা ভাষণে ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহার ভিতরকার—

আমি কোথায় পাব তারে
আমার মনের মানুষ যে রে!
হারায়ে সেই মানুষে
তার উদ্দেশে
দেশে বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।

এই পঙক্তি কয়টিই রবীন্দ্রনাথের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়াছিল; ইহা যেন মানুষের ভিতরে প্রকাশ খুঁজিতেছে যে আসল মানুষ—যে দেব-মানুষ—নিজের ভিতর দিয়া এবং তাহার সঙ্গে নিখিল মানুষের ভিতর দিয়া সেই 'মনের মানুষের' সন্ধানের ব্যাকুলতা। বাউলের 'ব্রহ্ম-কমলে'র কল্পনাটি রবীন্দ্রনাথের ভিতরে আনন্দোদ্বোধে একটি চিত্ত-প্রসার আনিয়া দিয়াছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষের

ভিতর দিয়া যেমন তাহার হৃদয়-কমল যুগ যুগ ধরিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তেমনই আবার সব দেশে সব কালে ব্যাপ্ত যে মহামানব এবং সেই মহামানবের চারিপাশে যে বিশ্বপ্রকৃতি—ইহার সব কিছুকে লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে বিশ্বের ব্রহ্ম-কমল। ব্রহ্ম-কমলের ফুটিয়া উঠিবার এই আদর্শের ভিতর দিয়াই—

দেখ না আমার পরমগুরু সাঁই,
যে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাড়াহুড়া নাই।

এই পদটি রবীন্দ্রনাথের নিকটে এত প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই দৃষ্টিতেই তাহার নিকটে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল বাউলের এই গান—

হৃদয় কমল চলতেছে ফুটে
কত যুগ ধরি',
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা,
উপায় কি করি।

'কমলা-বক্তৃতামালা'য় 'মানুষের ধর্ম' বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়াছেন তাহার মুখ্য প্রতিপাদ্যও হইল বৃহৎমানব বা মহামানবের ভিতর দিয়া এই ব্রহ্ম-কমলের পরিপূর্ণ বিকাশ, এবং সেই পূর্ণতার আদর্শে ব্যক্তির সহিত মহামানবের অন্বয়যোগের কথা। ভূমিকাতেই কবি বলিয়াছেন, "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম ক'রে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ'। তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তায় ভাবে কর্মে সর্বজনীনতার আবির্ভাব। মহাত্মারা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, তাঁর প্রেমে সহজে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম ক'রে মানবসীমায় উত্তীর্ণ হয়।…সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে, তাঁকেই বলেছে 'এষ দেবো বিশ্ব-

কর্মা মহাত্মা'। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে তাঁকে পাবে আশা ক'রে তাঁর উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়েছে—

স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।

সেই মানব, সেই দেবতা, য একঃ, যিনি এক, তাঁর কথাই আমার এই বক্তৃতাগুলিতে আলোচনা করেছি।"

মানুষের এই শাশ্বত অখণ্ড আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া কবি মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবন-সাধনার সম্বন্ধেও স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন,—

> "এই সর্বজনীন মনকে উত্তরোত্তর বিশুদ্ধ ক'রে উপলব্ধি করাতেই মানুষের অভিব্যক্তির উৎকর্ষ। মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎমানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎমানুষের সাধনা। এই বৃহৎমানুষ অন্তরের মানুষ। বাইরে আছে নানা দেশের নানা সমাজের নানা জাত, অন্তরে আছে এক মানব।"

শুভকর্ম-সাধনার পথই হইল মানুষের জীবন-সাধনার পথ। কর্মসাধনাকে এই শুভত্ব দান করে কিসে? শুভত্ব দান করে যোগ; কর্ম যখন কর্মযোগ হইয়া ওঠে তখনই কর্ম শুভ। কর্ম কর্মযোগ হইয়া ওঠে কখন? কর্ম যখন বৃহতের সঙ্গে—মহামানবের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেয় তখনই কর্ম হইয়া ওঠে কর্মযোগ। "ঈশোপনিষদ্ তাই বলেন, 'শত বৎসর তোমাকে বাঁচতে হবে, কর্ম তোমার না করলে নয়।' শত বৎসর বাঁচাকে সার্থক করো কর্মে, এমনতরো কর্মে যাতে প্রত্যয়ের সঙ্গে প্রমাণের সঙ্গে বলতে পারা যায় সোঽহম্। এ নয় যে, চোখ উলটিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বসে থাকতে হবে মানুষের থেকে দূরে। অসীম উদ্বৃত্ত থেকে মানুষের মধ্যে যে-শ্রেষ্ঠতা সঞ্চারিত হচ্ছে সে কেবল সত্যং ঋতং নয়, তার সঙ্গে আছে রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ ভূতং ভবিষ্যৎ। এই যে-কর্ম, এই যে-শ্রম, যা জীবিকার জন্যে নয়, এর নিরন্তর উত্তম কোন্

সত্যে। কিসের জোরে মানুষ প্রাণকে করছে তুচ্ছ, দুঃখকে করছে বরণ, অন্যায়ের দুর্দান্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বুক পেতে নিচ্ছে অবিচারের দুঃসহ মৃত্যুশেল। তার কারণ, মানুষের মধ্যে শুধু কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার মহিমা। সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষেরই মাথা তুলে বলবার অধিকার আছে, সোঽহম্।”

রবীন্দ্রনাথের ভিতরে এই মানবতাবোধ কোনও এক সময়ে বুদ্ধির পথে আবির্ভূত হইয়া স্পষ্ট একটি ‘থিওরি’র রূপ গ্রহণ করে নাই ; সারাজীবনের বিভিন্ন জাতীয় অনুভূতি দিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই জন্য ইহা ভাষণ-প্রবন্ধের ভিতর দিয়া যেমন প্রকাশলাভ করিয়াছে, তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়াও নানাভাবে তাহা প্রকাশলাভ করিয়াছে। কোথাও এককে অবলম্বন করিয়া নিখিল-মানবে গিয়া পৌঁছাইয়াছেন, কোথাও নিখিল মানবের ভিতর দিয়া এককে লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ‘প্রভাতসংগীতে’র মধ্যেই এই মহামানবের আহ্বান শুনা গিয়াছিল, ‘জগৎ ব্যাপিয়া, শোন রে, সবাই ডাকিতেছে আয় আয়’। ‘মানসী’র ‘জীবন মধ্যাহ্ন’ কবিতায় দেখি—

বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন কুহরে
মঙ্গল-আনন্দধ্বনি বাজে।

‘কড়ি ও কোমলে’র যুগেও যে ‘আহ্বানগীত’ দেখিতে পাই তাহার ভিতরে গভীরতা না থাকিলেও ব্যাপ্তি আছে।—

চারি দিকে তার মানব মহিমা
উঠিছে গগনপানে,
খুঁজিছে মানব আপনার সীমা
অসীমের মাঝখানে।…

চলো দিবালোকে, চলো লোকালয়ে,
চলো জনকোলাহলে—
মিশাব হৃদয় মানবহৃদয়ে
অসীম আকাশতলে।
তরঙ্গ তুলিব তরঙ্গের 'পরে,
নৃত্যগীত নব নব—
বিশ্বের কাহিনী কোটি কণ্ঠস্বরে
এক-কণ্ঠ হয়ে কব।

'উৎসর্গে'র মধ্যে দেখি, যখন জীবনে গভীর প্রশ্ন জাগিল 'কেন আমি বাঁচি, কেন আছি গো অর্থ না বুঝা যায়'।—তখন তাহার উত্তর মিলিল এই—

ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে, ভয় নাই,
কিছু নাই তোর ভাবনা।
যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পুরাবি কামনা,
আপন অর্থ সেদিন বুঝিবি—
জনম ব্যর্থ যাবে না।—৯নং

'পরিশেষে'র 'প্রণাম' কবিতায় দেখিতে পাই, এই মানবের ভিতর দিয়া একের চরণে প্রণাম—

নিখিলের অনুভূতি
সংগীতসাধনা মাঝে রচিয়াছে অসংখ্য আকৃতি।
এই গীতিপথপ্রান্তে হে মানব, তোমার মন্দিরে
দিনান্তে এসেছি আমি নিশীথের নৈঃশব্দ্যের তীরে
আরতির সান্ধ্যক্ষণে; একের চরণে রাখিলাম
বিচিত্রের নর্মবাঁশি,—এই মোর রহিল প্রণাম।

এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় 'পরিশেষে'র 'বর্ষশেষ' কবিতাটি; যেখানে 'আয়ুর পশ্চিমপথশেষে ঘনায় মৃত্যুর ছায়া এসে' সেইখানে

দাঁড়াইয়া কবি নিজের জীবনের মূল্য নিরূপণ করিতে গিয়া এবং মৃত্যুর হাত হইতে নিজেকে অমরত্বের গভীরতার উপলব্ধি করিতে গিয়া মানবজীবনের সহিত নিজেকে সর্বভাবে যুক্ত করিয়া নিজের অমর মূল্যকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—

যাঁহারা মানুষরূপে দৈববাণী অনির্বচনীয়
তাঁহাদের জেনেছি আত্মীয়।
কতবার পরাভব, কতবার কত লজ্জা ভয়,
তবু কণ্ঠে ধ্বনিয়াছে অসীমের জয়।
অসম্পূর্ণ সাধনায় ক্ষণে ক্ষণে ক্রন্দিত আত্মার
খুলে গেছে অবরুদ্ধ দ্বার।
লভিয়াছি জীবলোকে মানব জন্মের অধিকার,
ধন্য এই সৌভাগ্য আমার।
যেথা যে-অমৃতধারা উৎসারিল যুগে যুগান্তরে
জ্ঞানে কর্মে ভাবে, জানি সে আমারি তরে।
পূর্ণের যে-কোনো ছবি মোর প্রাণে উঠেছে উজ্জ্বলি
জানি তাহা সকলের বলি।
... ...
যেখানেই যে-তপস্বী করেছে দুষ্কর যজ্ঞভাগ,
আমি তার লভিয়াছি ভাগ।
মোহবন্ধমুক্ত যিনি আপনারে করেছেন জয়,
তাঁর মাঝে পেয়েছি আমার পরিচয়।
যেখানে নিঃশঙ্ক বীর মৃত্যুরে লঙ্ঘিল অনায়াসে,
স্থান মোর সেই ইতিহাসে।
শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠ যিনি, যতবার ভুলি কেন নাম,
তবু তাঁকে করেছি প্রণাম।
অন্তরে লেগেছে মোর স্তব্ধ আকাশের আশীর্বাদ;
উষালোকে আনন্দের পেয়েছি প্রসাদ।
এ আশ্চর্য বিশ্বলোকে জীবনের বিচিত্র গৌরবে
মৃত্যু মোর পরিপূর্ণ হবে।

ঈশ্বরকে মানুষের মধ্য দিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়া কবি তাঁহার 'পুনশ্চ'র কবিতায় ঈশ্বরপুত্র খৃস্টের নাম দিলেন 'মানবপুত্র'। মানুষের ব্যবহারে মর্মাহত হইয়া একদিন যিশুখৃস্ট ঊর্ধ্বে তাকাইয়া ঈশ্বরের নিকটে হৃদয়ের আর্তি জানাইয়াছিলেন, 'পিতা, হে আমার স্বর্গস্থ পিতা, কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে?' রবীন্দ্রনাথ আবার যেদিন দেখিতে পাইলেন, মানবের মধ্যে একদিন রক্ত-মাংসের দেহে বিষয়ীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল যে মহৎ মানব-আদর্শ যিশুখৃস্ট রূপে চারিদিকে মানুষের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে ধর্মের নামে ষড়্‌যন্ত্র সেই মানবপুত্রকে চরম লাঞ্ছনায় হত্যা করিতে—মানুষের মধ্যে একদিন একান্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছিল যে আদর্শ সেই আদর্শকে অবমানিত করিয়া ধ্বংস করিতে; সেদিন যেন আবার—

মানবপুত্র যন্ত্রণায় বলে উঠলেন ঊর্ধ্বে চেয়ে,
'হে ঈশ্বর, হে মানুষের ঈশ্বর,
কেন আমাকে ত্যাগ করলে।'

বাহিরের কর্মের যোগে মানুষের সঙ্গে যুক্ত হইবার নানাভাবে কবি যে চেষ্টা করিয়াছেন তাহার সঙ্গে তাঁহার কবি-অন্তরের যোগ তিনি কিভাবে মিলাইয়া দিতে চাহিয়াছেন তাহার পরিচয় আছে কবির 'পত্রপুট'এর পনেরো সংখ্যক কবিতায়। অনুভূতিতে ধ্যানে-মননে যে যোগ তাহাই তো প্রেরণা দিয়াছে সকল কর্মযোগের। এ-যোগকে একটা বস্তুবিয়োজিত চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া তাঁহার ব্যবহারিক কবিজীবনে এই যোগকে তিনি মানুষের প্রত্যেক স্তরে কিভাবে ছড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাহারই প্রকাশ এই কবিতায়—

লোকালয়ের বাইরে পেয়েছি আমার নির্জনের সঙ্গী
যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।

তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার সগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।
তারা সত্যের পথিক, জ্যোতির সাধক,
অমৃতের অধিকারী।
মানুষকে গণ্ডির মধ্যে হারিয়েছি
মিলেছে তার দেখা
দেশবিদেশের সকল সীমানা পেরিয়ে।
তাকে বলেছি হাতজোড় ক'রে,—
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখেছি তোমাকে
তামসের পরপার হতে
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা।

ইতিহাসবোধের এই গভীরতার প্রতিষ্ঠাতে 'আকাশপ্রদীপ'এর একটি কবিতায় কবিকণ্ঠে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এই বাণী—

মহেন্দজারোর কবি, তোমার সন্ধ্যাতারা
অস্তাচল পেরিয়ে
আজ উঠেছে আমার জীবনের
উদয়াচলশিখরে।

৯

রবীন্দ্রনাথ এইভাবে যে মহামানবতার কথা এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া একটা অন্বয়যোগের কথা বলিলেন এ-সম্বন্ধে একটা মস্ত বড় প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। আমরা কি তাহা

হইলে এই কথাই বলিব যে রবীন্দ্রনাথের পরিণত মনে 'মহামানব'ই 'ব্রহ্মে' রূপান্তরিত হইয়াছিল বা তাঁহার 'ব্রহ্ম'ই মহামানবতার রূপ ধারণ করিয়াছিল? সত্য বৃহৎ-বাচী বলিয়াই সত্য 'ব্রহ্ম'; এই বৃহত্ত্ব এবং মহত্ত্ব সবখানিই যখন রবীন্দ্রনাথ অতীত-বর্তমান-অনাগত জুড়িয়া প্রকাশমান অখণ্ড মানবতার মধ্যেই আবিষ্কার করিলেন তখন এই মহামানবের অন্তর্নিহিত সত্যই তো ব্রহ্ম। নিঃস্বার্থ কর্মের ভিতর দিয়া মানুষের সঙ্গে যে যোগ তাহাই যদি শ্রেষ্ঠ উপাসনা হয় তবে উপাসনাকে শুধু এই নিঃস্বার্থ শুভকর্মের মধ্যে পর্যবসিত করিতে কোনও আপত্তি আছে কিনা। আত্মসিসৃক্ষু চৈতন্যময় সৃজনীশক্তির মানুষই হইল যখন শ্রেষ্ঠ প্রকাশ বা মূর্তি তখন মানবপূজাই তো হইল শ্রেষ্ঠ পূজা। প্রশ্নটিকে আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝিবার জন্য দুইভাগ করিয়া লওয়া যাইতে পারে; প্রথম প্রশ্ন হইল দার্শনিক প্রশ্ন; মানবতার ভিতর দিয়া পরম সত্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ এইকথা স্বীকার করার ভিতর দিয়া পরম সত্য অখণ্ড মানবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ এই কথা স্বীকার করিতে হয় কিনা। দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল একটা ধর্মের প্রশ্ন; পরিণত জীবনে রবীন্দ্রনাথ উপাসনাকে কেবল বৃহৎমানবের সহিত যোগযুক্ত শুভকর্মের মধ্যেই পর্যবসিত রাখিতে চাহিয়াছেন কিনা; অথবা, এ কথাও বলা যাইতে পারে, তিনি তাহা করিতে না চাহিলেও তিনি যেসব কথা বলিয়াছেন তাহাতে তাহাই তাঁহার করা উচিত ছিল কি না।

এখানকার দার্শনিক প্রশ্নটি যাহা তাহার উত্তর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার *The Religion of Man* গ্রন্থেই দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি যে পুরুষকে সমস্ত পুরুষের মধ্য দিয়া প্রকাশিত সনাতন পুরুষ বলিয়াছেন (the Eternal Person manifested in all persons) সেই মহামানবরূপ সনাতন পুরুষই যে পরম সত্যের একমাত্র মূর্ত রূপ এ কথা সত্য নাও হইতে পারে; এই মূর্তি বা বিকাশ হয়ত ভগবানের অসংখ্য

বিকাশের মধ্যে এক রকমের একটি বিকাশ মাত্র—অসংখ্য মূর্তির এক মূর্তি মাত্র; কিন্তু এই মূর্তিই মানুষকে এবং মানুষের বিশ্বকে বিধৃত করিয়া আছে। আমরা যে পর্যন্ত মনুষ্যজাতীয় জীবই থাকিয়া যাইতেছি, সে পর্যন্ত আমরা এই পরম সত্যকে অন্য কোনও রূপে বিশ্বের মধ্যে প্রকাশিত বলিয়া জানিতে বা কল্পনা করিতে পারি না। এই জন্যই আমাদের রচিত বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব ভগবানের যত প্রকারের স্বরূপের কথাই কল্পনা করুক না কেন, বাস্তবপক্ষে তিনি আমাদের নিকট হইলেন মানবতার একটা সীমাহীন আদর্শ; মানুষ তাহার ঐক্যবদ্ধ ক্রমোন্নতির ভিতর দিয়া এই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছে; প্রতিটি প্রেম-মিলনের ভিতর দিয়া, পিতা সুহৃদ্ প্রেমাস্পদ প্রভৃতির আদর্শের ভিতর দিয়া তাহারই দিকে মানুষ ছুটিয়া চলিতেছে।

> "It may be one of the numerous manifestations of God, the one in which is comprehended Man and his universe. But we can never know or imagine him as revealed in any other inconceivable universe so long as we remain human beings. And therefore, whatever character our theology may ascribe to him, in reality he is the infinite ideal of Man towards whom men move in their collective growth, with whom they seek union of love as individuals, in whom they find their ideal of father, friend and beloved." (Ch. xii)

ধর্মানুষ্ঠানের দিক হইতে দেখিতে পাই, এই মানবতাবোধের বিকাশের ফলে রবীন্দ্রনাথ কর্মযোগের উপর জোর দিয়াছেন বটে, কিন্তু তদতিরিক্ত একান্তে ধ্যান, মন্ত্রোচ্চারণ বা প্রার্থনাকে বাদ দিবার কখনই পক্ষপাতী হইয়া ওঠেন নাই; কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠানের দ্বারা চিত্তে যে সত্যবোধ বা সত্যানুভূতি জাগ্রত হইবে সেই বোধ এবং অনুভূতিকে সকল কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোত-ভাবে যুক্ত করিয়া লইবার পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্মবোধ কখনও যেন

মানবতাবোধ হইতে বিচ্ছিন্ন না হইয়া পড়ে—কোনও ধর্মানুষ্ঠানই যেন বৃহৎমানবের সহিত যোগযুক্ত যে কর্ম তাহা হইতে একান্ত-ভাবে অতিরিক্ত না হইয়া ওঠে। ধর্মানুষ্ঠানও চিত্তকে শুভ-কর্মানুষ্ঠানের দিকে প্রচোদিত করিয়া তুলুক, সকল কর্মানুষ্ঠান 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ' যে পরম সত্য তাহার দিকে চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করুক—ইহাই ছিল তাঁহার আদর্শ।

আসলে রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কিছু লেখা—শুধু গদ্য নয়, কবিতাও—পড়িলে মধ্যে মধ্যে আমাদের মনে সংশয় জাগে, রবীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে নিজের অজ্ঞাতে পাশ্চাত্য 'হিউম্যানিস্ট্'গণের সহোদর হইয়া ওঠেন নাই তো? উনবিংশ শতাব্দীতে সাধারণভাবে সর্বত্রই ধর্মের উপরে মানবতাবাদের একটা প্রাধান্য দেখিতে পাই। পূর্ববর্তী কালে ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা মানবাতীত অধ্যাত্ম-সত্যকেই বড় করিয়া দেখিতে চাহিয়াছি; ধর্মের পথে যাইতে হইলে এই মাটির পৃথিবীকে এবং সেই পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে এই জীবনের অভিনয়কে পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীতে মনীষিগণের ধর্মচিন্তায় প্রায় সর্বত্রই ইহার বিরুদ্ধতা দেখিতে পাই; জীবনের জন্যই ধর্ম—ধর্মের জন্য জীবন নহে—এই কথাটাই দিকে দিকে বহুস্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে 'মানবতাবাদে'র এই বিকাশ এই ভাবে ধর্মাশ্রিত হইয়াই হয় নাই; অধ্যাত্ম-সত্যের সম্পূর্ণ বিরো-ধিতাই ঘটিয়াছে অনেক ক্ষেত্রে। আমরা যাঁহাদিগকে পাশ্চাত্য দেশের 'হিউম্যানিস্ট্' বলি তাঁহাদের অধিকাংশেরই ঝোঁক অনধ্যাত্মবাদের দিকে; মানবতাকে তাঁহারা অধ্যাত্মবাদের সর্বপ্রকার আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া সম্পূর্ণরূপে 'স্বে মহিম্নি' প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাহিয়াছেন। দু'এক স্থানে রবীন্দ্রনাথের উক্তি দেখিয়া মনে সংশয় জাগে, তিনিও কি ক্রমে ক্রমে শেষে নিজের অজ্ঞাতে এই মানবতা-বাদিগণের দলেই ভিড়িয়া পড়িয়াছেন? একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে

পাইব, এই সব দল মানুষের সম্বন্ধে যত কথা বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ নিজেও সেই সব কথা বলিলেও বা প্রকারান্তরে স্বীকার করিলেও সম্পূর্ণভাবে ঐ দলে কখনই ভিড়িয়া পড়েন নাই। ভিড়িয়া না পড়িবার কারণ তাঁহার বিশেষ মানসিক সংগঠন—যে সংগঠনের ভিতরে সকল ইতিহাস-প্রবাহের পিছনে একটি চৈতন্যময় মঙ্গলময় 'পরম এক'-এ বিশ্বাস ছিল একটি ধাতুগত সত্য। মন-ঘুড়ি তাই মানবতার আকাশে যত ঘুরিয়া বেড়াক, একের বন্ধনসূত্র কখনই ছিন্ন হইয়া যায় নাই।

মানবতাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের এই যে আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছিল ইহার সহিত ঐতিহাসিক রবীন্দ্রনাথের জীবন-পরিণতির একটা গভীর যোগ রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আশৈশব এই একটি প্রবল ঝোঁক ছিল যে, দুনিয়ার অপর সকল লোকের উপরে নানা রকম কাজের ভার পড়িয়াছে, কিন্তু রবীন্দ্র-নাথের জীবন-দেবতা তাঁহাকে নিভৃত নিরালায় একান্ত সুদূরে আপন মনে বসিয়া বাঁশী বাজাইবার একটি বিশেষ কাজ এবং অধিকার দিয়াছেন। কর্মময় সংসারের জটিল ঘূর্ণাবর্ত্ত হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়া খেয়াল-খুশিতে বাঁশী বাজাইবার একটি বিশেষ অধিকার যে তাঁহার আছে এ বিষয়ে কবি দীর্ঘদিন সচেতন ছিলেন, এবং তাঁহার গানে কবিতায় নাটকে কোনো কোনো সময়ে এই সচেতনতা অত্যন্ত হইয়া দেখা দিয়াছে। আশৈশব তাঁহার যে একটা বিশ্বাত্মবোধ ছিল এবং অখণ্ড মানবতার সহিত যোগের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাহার প্রমাণ আমরা পূর্বে বহুভাবে দিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষা কোথাও একটা ঝাপসা স্বপ্নবিলাসে, কোথাও গভীর মিস্টিক্ অনুভূতিতে এবং ক্ষণে ক্ষণে অনুস্মৃত কবিধর্মের বিরুদ্ধে একটা আত্মপ্রতিক্রিয়ায় দেখা দিয়াছে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত ইহা জীবনবোধের বলিষ্ঠতা লাভ করে নাই বলিয়া বিপরীতমুখীন ভাবটিই—অর্থাৎ এককভাবে বিশ্বরূপের বিশ্বলীলা 'আপনার

'নিকুঞ্জচ্ছায়' বর্ণে গন্ধে গানে রসে আস্বাদন করিবার বিশেষ অধিকারের দাবীটিই প্রবলতর রূপে ঘোষণা লাভ করিয়াছে। যে সকল কবিতায় গানে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাবটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহার অনেকগুলিই সে যুগে প্রকাশিত তাঁহার কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গান ও কবিতা। সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে তিনি 'একক' এবং এই একাকিত্বের তাঁহার যে অধিকার আছে—সেই অধিকারের পিছনে যে যুক্তি রহিয়াছে এ কথা বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহার গানে কবিতায় নাটকে প্রবন্ধে প্রকাশিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার দেখিতে পাই শুধু স্বপ্নবিলাস নয়—শুধু মিস্টিক্ অনুভূতি নয় —ঐতিহাসিক জীবনে একটা প্রবল প্রতিক্রিয়া—যে প্রতিক্রিয়ার সুরটি একটি অতিশয় তীব্র ভাবে শোনা গিয়াছে, 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতার মধ্যে। এই ফিরিবার চেষ্টা এইখানেই এই প্রথম নয়, 'প্রভাতসংগীত', 'কড়ি ও কোমল' প্রভৃতির সময় হইতেই এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বপ্নাচ্ছন্নতা হইতে জাগরণের অভীপ্সা উচ্চারিত হইয়াছে। সেই অভীপ্সাই রূপলাভ করিয়াছে এই মানবতাবাদে এবং মানবতার সহিত অদ্বয়যোগের বলিষ্ঠ উচ্চারণে।

অখণ্ড মানবতার সহিত এতটা অদ্বয়যোগের বোধ প্রথম জীবন হইতে থাকিলেও, তাঁহার বাস্তব কবিজীবনে বৃহৎ সমাজজীবন হইতে যে তিনি জ্ঞাতে অজ্ঞাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতেছেন এ বোধ রবীন্দ্রনাথকে থাকিয়া থাকিয়া পীড়া দান করিয়াছে। জীবনের বিভিন্ন বাঁকে তাই তিনি সমাজজীবনের যোগে নূতন করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু যে কাব্যজগতেই জাগ্রত হইতে চাহিয়াছেন তাহা নয়, নূতন নূতন কর্মপন্থার পরিকল্পনায় ও গ্রহণে এই জাগরণকে সত্যরূপ দান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন', 'শ্রীনিকেতন' এবং তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে অন্যান্য গঠনমূলক কাজের পরিকল্পনা এগুলিকে

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কবিজীবনের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেখিতে হইবে, নতুবা এই অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলির তাৎপর্যও ভাল করিয়া বোঝা যাইবে না, রবীন্দ্রনাথের জীবনের সমগ্রতাকেও বোঝা যাইবে না। কবিতা ও গানে বিশ্বজীবনের সঙ্গে যুক্ত হইবার যে পরম আকূতি 'বিশ্বভারতী' হইল তাহারই বাস্তব সাধন-পন্থা। এই জন্য যে সুর কবির কবিতায়, যে সুর কবির গানে, সেই সুরই হইল কবির 'বিশ্বভারতী'র পরিকল্পনায় এবং সমস্ত কর্মসূচীতে। স্বদেশী-আন্দোলন, কংগ্রেস-আন্দোলনের সঙ্গে কবি এক সময়ে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবেই যুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু সেই কর্মসূচীর ভিতরে কবির নিজের সুরকে সঞ্চারিত দেখিতেও পান নাই, নিজে সে সুরকে সেখানে সঞ্চারিত করিতেও পারেন নাই; ফলে আস্তে আস্তে কবি পিছনে পড়িয়া গেলেন—নিজেই তিনি আস্তে আস্তে দূরে সরিয়া গেলেন। অথচ বৃহৎ সমাজজীবন হইতে এই বিচ্ছিন্নতা তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল; তিনি খুঁজিতেছিলেন বিশ্বজীবনের সঙ্গে মিলনেব এমন আর একটি কর্মসূচী যে কর্মসূচীতে তাঁহাকে কোনও ভগ্নাংশে যোগ দিতে হয় না—সমগ্র সত্তা লইয়া সমগ্রভাবেই তিনি যোগ দিতে পারেন। এই আকূতির এবং ভাববীজের প্রথম অঙ্কুর 'বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম'; তাহার ক্রমপরিণতি 'শান্তিনিকেতন'-এর 'শ্রীনিকেতন'-এর বহুমুখী প্রসারে, তাহারই ব্যাপ্তি 'বিশ্বভারতী'তে। এই 'বিশ্বভারতী'তে তাই কাহাকেও বাদ পড়িলে চলিবে না; মানুষকে চাই সব দেশের, সব ধর্মের, সব জাতের; সব বৈচিত্র্য লইয়াই তাহারা এখানে আসিয়া বৈচিত্র্যের মধ্যেই মানবতার পরম 'এক'-এর মধ্যে এক হইয়া উঠিবে। এখানে যে ধর্ম, যে শিক্ষা তাহাকেও কোনও একটি দিকে ঝোঁক দিলে চলিবে না—সঙ্গীত, শিল্প, আনন্দানুষ্ঠান সকলের সঙ্গে এগুলিকে যুক্ত করিয়া লইতে হইবে। শ্রমশিল্পের কাজও এখানে বাদ যাইবে না, কৃষিকার্যও বাদ যাইবে না, কিন্তু এগুলিকে মন্ত্র, সঙ্গীত, শিল্প, নৃত্য—ইহার কোনটা

হইতেই পৃথক্ করিয়া দেখা চলিবে না, সবটার সঙ্গেই যুক্ত করিয়া লইতে হইবে। এখানকার ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি—সকল জিনিসেরই এক লক্ষ্য হইল অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ মানবতাকে অনন্তভাবে বিকশিত করিয়া তোলা। আবার এই যে বিশ্বমানবতার বিকাশের আয়োজন এ আয়োজনকে বিশ্বপ্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন একটা মানবীয় আয়োজন মাত্র বলিয়া গ্রহণ করিলে চলিবে না; মানবজীবনকে এখানে যথাসম্ভব বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে যোগে এক করিয়া লইতে হইবে, উভয়ক্ষেত্রেই বিকাশের ধারা যেন এক ছন্দে প্রবাহিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভিতরকার যে সমগ্র কবিপুরুষটি তাহার প্রকাশকে এই দুই দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে। একদিক হইল তাঁহার সকল সাহিত্যকৃতি ও সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি শিল্পকলা, অন্যদিক হইল রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী; ইহারা এ-পিঠ আর ও-পিঠ; কিন্তু পরস্পরবিরোধী এ-পিঠ ও-পিঠ নয়, দুই পিঠকে একসঙ্গে করিয়া তবে সমগ্র রবীন্দ্রনাথের প্রকাশ।

তাঁহার মানবতাবোধের দ্বারা প্রেরিত হইয়া এক সময়ে যে তিনি বিশেষভাবে বিচ্ছিন্নতার আত্মগণ্ডি অতিক্রমের জন্য উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিলেন এ কথার স্বীকৃতি কবি নিজেই দিয়া গিয়াছেন *The Religion of Man* গ্রন্থে। এ বিষয়ে তিনি এ পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, সাহিত্য-কর্ম লইয়া সমাজ-বিচ্ছিন্নতাই যে তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল তাহা নয়, বিরলে একাকী বসিয়া অসীমের ধ্যানে যে আনন্দ তাহাও তাঁহার চিত্তকে আর তৃপ্তি দিতে পারিতেছিল না; এমন কি এক সময়ে তিনি এমনও অনুভব করিলেন যে তাঁহার নীরব উপাসনায় তিনি যেসকল মন্ত্র মনে মনে আবৃত্তি করিতেন তাঁহার অজ্ঞাতেই তাঁহার চিত্তে সেসকল মন্ত্র প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তখন কবি অস্পষ্টভাবে ভিতরে ভিতরে অনুভব করিতে পারিলেন, তাঁহাকে তাঁহার অধ্যাত্ম স্বরূপকে উপলব্ধি করিতে হইবে মানুষের জীবনের মধ্যে—এবং তাহার সাধনা হইবে নিঃস্বার্থ

জনসেবা। তখনই তিনি স্থাপন করিলেন তাঁহার বোলপুর ব্রহ্মচর্যাশ্রম, যাহারই ক্রমপরিণতি 'বিশ্বভারতী'তে।

> "I am sure that it was this idea of the divine Humanity unconsciously working in my mind, which compelled me to come out of the seclusion of my literary career and take my part in the world of practical activities. The solitary enjoyment of the infinite in meditation no longer satisfied me, and the texts which I used for my silent worship lost their inspiration without my knowing it. I am sure I vaguely felt that my need was spiritual self-realization in the life of Man through some disinterested service. This was the time when I founded an educational institution for our children in Bengal." (Ch. xii)

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই মানবতাবোধকে কবিতায় ভাষণে প্রবন্ধে বিবিধভাবে উপনিষদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সহজেই বোঝা যায় এ মানবতাবাদের সঙ্গে উপনিষদের যোগ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা সর্বাংশে উপনিষদের বস্তু নয়, ইহা অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের নিজের বস্তু—এবং এ কথাও আমাদের বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, এই রবীন্দ্রনাথও হইলেন সেই উনবিংশ শতকে গড়িয়া-ওঠা একজন কবিপুরুষ—যে উনবিংশ শতাব্দীতে মানবতার বাণী উচ্চারিত পৃথিবীর দিকে দিকে বহুমনীষীর কণ্ঠে—বিশেষ করিয়া ইউরোপে। মননের ক্ষেত্রে এই মনীষিগণের মননের সহিত যে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ যোগ ছিল এ কথা অনস্বীকার্য।

উপনিষদের মধ্যে প্রথমে নিজের আত্মাকে উপলব্ধি করিবার এবং সেই আত্মোপলব্ধির ভিতর দিয়া সর্বব্যাপী 'এক'কে অনুভব করিবার কথা—এবং সেই সর্বব্যাপী 'এক'-এর ভিতর দিয়াই আবার সব কিছুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া একেবারে সব কিছু হইয়া যাইবার কথা বহুভাবে পাই এবং ইহার বিস্তৃত আলোচনা আমরা পূর্বেই

করিয়া আসিয়াছি। উপনিষদের এই জাতীয় বাণীর মধ্যে তিনটি বাণী বিশেষ করিয়া রবীন্দ্রনাথের মনকে নাড়া দিয়াছিল, তাহার ভিতরে একটি হইল—

এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা।
সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। (শ্বেতা, ৪।১৭)

'এই দেব বিশ্বকর্মা মহাত্মা—ইনি সদা জনসমূহের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট।'

দ্বিতীয়টি হইল—

তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা
যুক্তাত্মানঃ সর্বমেবাবিশন্তি॥ (মুণ্ডক, ৩।২।৫)

'সেই যুক্তাত্মা ধীরগণ সর্বগকে সর্বভাবে প্রাপ্ত হইয়া সবের মধ্যেই প্রবেশ করেন।'

তৃতীয় হইল একসঙ্গে ঈশোপনিষদের দুইটি শ্লোক—

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ (৬, ৭)

'যিনি সর্বভূতকে আত্মার মধ্যেই অবস্থিত দেখেন, সর্বভূতে আত্মাকে দেখেন, তিনি এই হেতু (এই জাতীয় উপলব্ধির ফলে) আর কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যে সময়ে সর্বভূত সেই জ্ঞানী ব্যক্তির আত্মাই হইয়া যায়, তখন একত্বদর্শনকারী সেই ব্যক্তির মোহই বা কি শোকই বা কি?'

উপনিষদের এই বিশেষ বাণীগুলিই রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনেকখানি ব্যঞ্জনা এবং বিস্তারলাভ করিয়া তাঁহার মানবতাবাদকে গড়িয়াছিল এ কথা বলা ঠিক হইবে না। শৈশব

হইতেই তাঁহার নিজের ভিতরে কিভাবে মানবতাবাদ গড়িয়া উঠিতেছিল সে কথা আমরা বিস্তৃতভাবে লক্ষ্য করিয়াছি। এই গড়িয়া উঠিবার প্রত্যেক স্তরেই উপনিষদের অদ্বয়বাদ নানাভাবে জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে রবীন্দ্রনাথকে অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিয়াছে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উপনিষদের প্রভাবই একমাত্র লক্ষণীয় বা প্রধান লক্ষণীয় বস্তু নয়; এ মানবতাবাদের অনেকখানিই রবীন্দ্রনাথের নিজের; উপনিষদের বাণীগুলির ব্যঞ্জনাকে বিস্তৃত করিয়া নিজের বাণীর সঙ্গেই তাহাদের মিলাইয়া লইয়া তিনি নিজের ভিতরকার মানবতাবাদকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

পূর্বে বলিয়াছি, উনবিংশ শতাব্দী জগৎ জুড়িয়াই humanism বা মানবতার যুগ। ইউরোপে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদ হইতেই দেবত্বের বা ভগবত্তার সকল মহিমা ঊর্ধ্বের স্বর্গ হইতে নামাইয়া আনিয়া সবটাই নিম্নের মর্ত্যভূমির মানুষের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইবার অজস্র চেষ্টা হইয়াছে। এ কথা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, তখনকার দিনের মননশীলতার ক্ষেত্রে এই মানবতাবাদ অনেকখানি জল-মাটি আলো-হাওয়ার সঙ্গেই মিশিয়াছিল এবং সেখান হইতে সেই উপাদান নানাভাবেই আসিয়া রবীন্দ্রনাথের মানসপরিমণ্ডলে প্রবেশলাভ করিয়াছে। এই সম্ভাবনাকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের এই হিবার্ট-বক্তৃতামালা এবং কমলা-বক্তৃতামালা দিবার পরে তাঁহার এই জাতীয় সকল মতবাদই যে কি করিয়া পাশ্চাত্যের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ 'হিউম্যানিস্ট্'গণের মতামতের একটি কবিসুলভ কৌশলী সার-সঙ্কলনমাত্র তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টাও সাময়িক পত্রের পাতায় যে না হইয়াছে তাহা নহে। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের এ-জাতীয় বহু বাণীর পাশেপাশেই যে পাশ্চাত্য মনীষিগণের বাণী হইতে অনুরূপ বাণী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যায় না তাহা নহে; কিন্তু উপনিষদ হইতে উদ্ধৃতি তুলিয়া তুলিয়া

বা পাশ্চাত্য 'হিউম্যানিস্ট্'গণের লেখা হইতে বচন তুলিয়া তুলিয়াই গোটা রবীন্দ্রনাথকে ব্যাখ্যা করা চলে না।

গ্রহণে রবীন্দ্রনাথের কোনোদিন সঙ্কোচ বা দ্বিধা ছিল না—তাহা তাঁহার কবিমনের আশ্চর্য গ্রহণ-ক্ষমতারই পরিচায়ক, তাঁহার চারিত্রিক বলিষ্ঠতারই চিহ্ন। ঋণস্বীকারে তাঁহার কোথাও কার্পণ্য ছিল না। আবার এ কথা সত্য যে, নিজের অন্তরের ঐশ্বর্য অনেক সময় তিনি ঢালিয়া দিয়াছেন উপনিষদের অনুকূল বাণীতে, মধ্য-যুগের উত্তর ও মধ্যভারতীয় সাধকগণের বাণীতে, বাঙলার নিরক্ষর বাউলের গানে গানে। তাঁহার ব্যাখ্যায়, তাঁহার গ্রহণে এই সকল বাণীর মধ্যে যে মানস ঐশ্বর্য এবং মহিমা দেখা দিয়াছে তাহার অনেকখানি প্রাপ্য রবীন্দ্রনাথের নিজের। তাঁহার চিত্তধৃত মানবতা-বাদের ক্ষেত্রেও এই কথাটিই সত্য বলিয়া মনে হয়।

১০

উপনিষদের পটভূমিকায় রবীন্দ্র-মানসের স্বাতন্ত্র্য কোন্ কোন্ ধারায় বিকাশ লাভ করিয়াছে তাহারই আলোচনা করিতেছিলাম। যিনি 'এক'কে প্রাপ্ত হন তিনি যে 'সর্বমেবাবিশন্তি'—এই আদর্শটি রবীন্দ্রনাথের ভিতরে কিভাবে একটি ব্যাপক মানবতাবাদে পর্যবসিত হইয়াছে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিলাম। এই মানবতাবাদের কথা আরও বহু প্রসঙ্গে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা দিবে সঞ্চারী ভাবরূপে; সব আলোচনাকে এক করিয়া তবে এবিষয়ে রবীন্দ্র-নাথের মনকে ভাল করিয়া বোঝা যাইবে।

রবীন্দ্রমানসের স্বাতন্ত্র্যের আর একটি ধারা আমরা লক্ষ্য করিতে পারি তাঁহার মুক্তির এবং অমরতার ধারণায়। একটু পরেই দেখিতে পাইব, এই ধারণাও গিয়া কবির মানবতাবাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথের কবিমানসে মানুষের মুক্তি ও অমৃতত্ব বা অমরত্বের ধারণা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল, কারণ উভয় ধারণাই মূলে প্রসৃত তাঁহার অন্তর্নিহিত একটি গভীর অন্বয়বোধ হইতে। কিন্তু এই মুক্তি এবং অমৃতত্বের ধারণা বিষয়ে উপনিষদের সহিত খানিকটা অংশে রবীন্দ্রনাথের মিল থাকা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের অনেকখানি পার্থক্য রহিয়াছে এবং সেই পার্থক্যের ভিতর দিয়াই রবীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য ব্যঞ্জিত।

অমৃতত্ব বা অমরত্ব বিষয়েও রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি-প্রবণতা কোনো একটানা পথে অগ্রসর হয় নাই। এ-ক্ষেত্রেও কোনও বিশিষ্ট মতবাদের পথ অনুসৃত হয় নাই বলিয়াই কোনো সোজা পথও দেখা দেয় নাই, অনুভূতি কবিকে বিচিত্রগামী করিয়া তুলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে মাঝে মাঝে তাঁহার যে অমরত্বের বিশ্বাস প্রকাশ পাইয়াছে তাহা খানিকটা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে অবলম্বন করিয়া। উপনিষদে বলা হইয়াছে, 'ঐ যাহা কিছু তাহা পূর্ণ, এই যাহা কিছু তাহাও পূর্ণ, পূর্ণ হইতেই পূর্ণ উদিত হয়; পূর্ণের পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।' এই পূর্ণ-স্বরূপের অসীমতার মধ্যে কিছুই হারাইয়া যাইবার ভয় নাই; ব্যক্তিকে নিজের ক্ষুদ্রসীমার মধ্যে খণ্ড করিয়া না দেখিয়া পূর্ণস্বরূপের অসীমতার মধ্যে প্রসারিত দেখিতে পাইলে আর মৃত্যুর প্রশ্ন থাকে না। এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া রচিত রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্বন্ধে অতি প্রচলিত জনপ্রিয় গানটি—

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথাও বিচ্ছেদ নাই।

পূর্ণস্বরূপের 'চরণের কাছে' 'যাহা কিছু সব' নিত্যকালের জন্যই 'আছে আছে আছে'; অতএব 'নাই নাই ভয়' শুধু ক্ষুদ্র আমিরই

ক্রন্দন; সেই পূর্ণস্বরূপের মধ্যে সকল 'অন্তর গ্লানি' এবং 'সংসার ভার' পলকের মধ্যে একাকার হইয়া যায়; সুতরাং জীবনের মধ্যে সেই পূর্ণস্বরূপকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই নিত্য অমৃতত্ব লাভ করা যায়।

এই গানে এবং এইজাতীয় অন্য গানে ব্যঞ্জিত যে প্রবণতা তাহা হইল সকল খণ্ডের পশ্চাতে পূর্ণস্বরূপ একের উপলব্ধির চেষ্টা; বহুত্ব হইতে খণ্ডত্ব হইতে ফিরিয়া পূর্ণস্বরূপ একে সমাহিত হইবার চেষ্টা। এখানে এই পূর্ণস্বরূপ 'এক'ই একমাত্র হইয়া দেখা দিয়াছেন, সেই একের ভিতর দিয়া বহুর ভিতরে যুক্ত হইবার কোনও স্পৃহা প্রবল হইয়া দেখা দেয় নাই। মৃত্যু-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আর একটি অতিজনপ্রিয় গান হইল,—

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়
জয় অজানার জয়।

এখানে কবিমন প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এখানেও 'অজানার জয়' ঘোষণা করিলেন বটে, কিন্তু এই অজানার মধ্যে যত অস্পষ্টভাবেই হোক, খানিকটা 'জানা' আসিয়া গিয়াছে। এই জীবন যেন 'দুদিন দিয়ে ঘেরা ঘর', মৃত্যুর দুয়ারের ভিতর দিয়া এঘর ছাড়িয়া গেলে যেখানে গিয়া পৌঁছানো যাইবে তাহা হইল 'চিরদিনের আবাস'। এই 'চিরদিনের আবাস'কেও 'একে'র মধ্যে নিহিত বিশ্বজীবনের প্রবাহ বলিয়া যে ব্যাখ্যা না করা যাইতে পারে তাহা নয়, কিন্তু অন্যত্র কবি সত্যের নিখিলসৃষ্টি-প্রবাহের ভিতর দিয়া যে নিরন্তর জায়মান রূপ দেখিতে চাহিয়াছেন এক্ষেত্রেও 'অজানা'র জয়ধ্বনির ভিতর দিয়া তাহার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে মনে হয় না। পরবর্তী কালের এই জাতীয় গানে রবীন্দ্রনাথ 'অজানা'কে খানিকটা প্রচলিত সুরঘেঁষা করিয়া 'চিরদিনের আবাস'

বলিয়া গ্রহণ করেন নাই ; খানিকটা সুরপরিবর্তন লক্ষ্য করিতে পারি—

সমুখে শান্তিপারাবার
ভাসাও তরণী হে কর্ণধার ॥

এই সঙ্গীতটির ভিতরেই। অধ্যাত্ম প্রেরণা এখানেও স্পষ্ট, কিন্তু এখানে যে 'চির-সাথী'কে ক্রোড় পাতিয়া কবিকে গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে সেই 'চির-সাথী'র পথ হইল অসীমের পথ, এবং 'ধ্রুব-তারকার জ্যোতিঃ' লাভ করিতে হইবে এই অসীমের পথেই। 'মর্ত্যের বন্ধন' যাহাতে ক্ষয় হয় কবি তাহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রার্থনা জানাইয়াছেন যেন মর্ত্যের বন্ধন ক্ষয় হইবার পরেই 'বিরাট বিশ্ব বাহু মেলি লয়' ; এই বিরাট বিশ্বের সঙ্গে এক হইয়াই অন্তরে 'মহা-অজানা'র 'নির্ভয় পরিচয়' লাভ করিতে হইবে। কিন্তু কবি এখানে 'অসীমের পথ' এবং 'বিরাট বিশ্বে'র কথা বলিলেও বেশ বোঝা যায়, তাঁহার দৃষ্টি পিপাসিত হইয়া উঠিয়াছে একটি 'ধ্রুব তারকা'র জ্যোতির জন্য—বিরাট বিশ্বের মধ্য দিয়া আপন লীলায় লুকোচুরি খেলিতেছেন যে মহা-অজানা কবির অন্তরের সকল রসের ধারা যেন সেই দিকেই বাসনার বাহু বাড়াইয়া দিতেছে।

যে কথাটি এখানে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে পারি তাহা হইল এই, এইজাতীয় গানগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ আমিকে এক অসীম পূর্ণস্বরূপের সঙ্গে যোগ করিয়া অমৃতত্ব বা অমরত্ব লাভের প্রবণতাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। এখানকার 'এক'কে নিরন্তর আত্ম-সর্জনের ভিতর দিয়া প্রকাশমান এক করিয়া তেমনভাবে পাইতেছি না যতখানি পাইতেছি বিশ্বসৃষ্টির চরমবিধায়ক 'এক'-রূপে। 'এক'কে অবলম্বন করিয়া 'সর্বং ইদং'কে জড়াইয়া ধরিবার ব্যাকুলতা এখানে প্রবল হইয়া উঠে না, আমি এবং 'সর্বং ইদং' এখানে 'এক অসীমে'র মধ্যে পূর্ণস্বরূপের মধ্যে প্রবেশ করিয়া

অমরত্ব লাভ করিতেছে সেইভাবে যেভাবে একটি নদীর ধারা গিয়া অমরত্ব লাভ করে বিরাট সমুদ্রের মধ্যে। এই 'একে'র মধ্যে অমরতা লাভের ধারণা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতনে' সঙ্কলিত একটি ভাষণের মধ্যে—

"মৃত্যু এই জগতের সহিত, বিচিত্রের সহিত, অনেকের সহিত, আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন করিয়া দেয়—কিন্তু সেই একের সহিত আমাদের সম্বন্ধের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না। অতএব যে সাধক সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত সেই এককে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি অমৃতকে বরণ করিয়াছেন; তাঁহার কোনো ক্ষতির ভয় নাই, বিচ্ছেদের আশঙ্কা নাই। তিনি জানেন, জীবনের সুখদুঃখ নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তাহার মধ্যে সেই কল্যাণরূপী এক স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছেন, লাভ ক্ষতি নিত্য আসিতেছে যাইতেছে, কিন্তু সেই এক পরমলাভ আত্মার মধ্যে স্তব্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছেন; বিপদসম্পদ্ মুহূর্তে মুহূর্তে আবর্তিত হইতেছে, কিন্তু—

এষাস্য পরমা গতিঃ, এষাস্য পরমা সম্পৎ,
এষো হস্য পরমো লোকঃ এষো হস্য পরম আনন্দঃ।

সেই এক রহিয়াছেন—যিনি জীবের পরমা গতি, যিনি জীবের পরমা সম্পৎ, যিনি জীবের পরম লোক, যিনি জীবের আনন্দ।"

—প্রাচীন ভারতের এক

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার গানে কবিতায় এবং অনেকগুলি নাটকে আবার অমরতার কথা বলিয়াছেন অদ্বয়ের মধ্যেই একটি দ্বয়বোধকে অবলম্বন করিয়া, যেখানে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস, তাঁহার ব্যক্তিজীবন একটি নিত্যকালের 'আমি'রূপে স্মরণাতীত কাল হইতে—

যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

এই যে ধূলির সহিত আরম্ভ করিয়া চলিতে চলিতে একদিন মানুষের মধ্যে বিবর্তন ইহা ত' এক দিনের কথা এক জীবনের কথা নয়—লক্ষ কোটি বৎসরের এই বিবর্তন মানুষ হইয়া ফুটিয়া উঠিবার ; মানুষ হইয়া একবার ফুটিয়া উঠিয়াই যাত্রার শেষ হয় নাই—জন্মজন্মান্তরের ভিতর দিয়া আমিও যে একটি চিরপ্রসার্যমাণ ব্যক্তিপুরুষে বর্ধিত হইতেছি। রবীন্দ্রনাথ এরূপ স্থলে বহুবার জীবন হইতে জীবনে চলিয়া যাইবার কথা বা জন্মজন্মান্তরের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই জন্মান্তরবাদ ঠিক আমাদের প্রচলিত পুনর্জন্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ নয় ; এই জন্মান্তর হইল একটা বিবর্তনধারার ক্রমস্তর মাত্র। রবীন্দ্রনাথের এই যে অদ্বয়ের মধ্যে দ্বয়বোধের আদর্শ ইহা একটি স্বতন্ত্র আলোচ্য বিষয়—ইহার বিস্তারিত আলোচনায় এখানে প্রবেশ করিতে চাহি না ; কিন্তু এই অদ্বয়ের মধ্যে দ্বয়কে অবলম্বন করিয়া কবির মধ্যে যে অমরতার ধারণা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহারই উল্লেখ করিতে চাহি। এই অমরতার পশ্চাতে রহিয়াছে ব্যক্তিজীবনে একটা নিরবচ্ছিন্ন বিবর্তন-ধারায় বিশ্বাস, এই বিবর্তন-ধারার মধ্যে ত মৃত্যু বলিয়া কোনও কিছু থাকিতে পারে না ; আমরা যাহাকে মৃত্যু বলি তাহা ত' কখনও এই বিবর্তন ধারায় কোনও ছেদ আনিতে পারে না, জীবন ও মৃত্যু উভয়ই যে এই 'আমি'র অনন্ত বিবর্তন ধারায় আগাইয়া চলিবার পদক্ষেপ মাত্র। চলিতে গেলে পা ফেলিতেও হয়, পা তুলিতেও হয়, উভয় জুড়িয়া চলার কাজ ; পা-ফেলা হইল জীবন, পা-তোলা হইল মৃত্যু। জীবনের ভিতর দিয়া প্রকাশের যে অধ্যায়টি আরম্ভ হইল মৃত্যুতে তাহার শেষ নয়, মৃত্যু তাহাকে টানিয়া লইয়া নূতন অধ্যায়ে পৌঁছাইয়া দিল। মৃত্যুর ভিতর দিয়া ছাড়া নূতন অধ্যায় আসিবে কি করিয়া ? নূতন নূতন অধ্যায় না আসিলে নিরন্তর হইয়া-ওঠা 'আমি'র সকল হইয়া ওঠাই যে বন্ধ হইয়া যায়।

বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া বিশেষভাবে এই একটি 'আমি'র যে

নিত্য বিবর্তন ইহাকে অবলম্বন করিয়া জীবন-মৃত্যুর একটি অচ্ছেদ্য সম্পর্কের কথা আমরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে প্রথমাবধি দেখিতে পাই ; জীবন-মৃত্যুর ভিতরকার অচ্ছেদ্য সম্পর্ককে বহু কবিতায় ও গানে রবীন্দ্রনাথ উমা-মহেশ্বরের নিত্য-প্রেমসম্বন্ধের অনুরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; কোথায়ও কবি এই দুইকে নটরাজের নৃত্যের দুই পদক্ষেপ বলিয়াছেন, কোথায়ও তিনি ইহাকে নটরাজের নৃত্যের লাস্য ও তাণ্ডব এই দুই ভঙ্গি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। জীবনের সকল অতীত বর্তমান অনাগতকে জুড়িয়া একই 'আমি'র বিবর্তন বা প্রকাশ চলিতেছে বলিয়া এক-জীবনের কোনো অসমাপ্ত পূজাও যেমন কখনও 'হারা' হয় না,—আবার জীবনান্তরের দ্বারাও কোথাও কিছু 'হারা' হইবার সম্ভাবনা নাই ; আমার জীবন যাঁহার হাতের বিশ্ববীণাতারের একটি বিশেষ ঝঙ্কারমাত্র সেই ঝঙ্কারের মধ্যেই আমার সমগ্র অর্থ নিহিত আছে—সেই ঝঙ্কারই নিজেকে ব্যাপ্ত করিয়া নিত্য অর্থবান্ হইয়া উঠিতেছে অনবচ্ছিন্ন বিবর্তনধারার ভিতর দিয়া। একজীবনে একরকমভাবে হইয়া উঠিবার পালা—মৃত্যুর মধ্য দিয়া আহ্বান আসিল আবার পুরাতন প্রথাকে ত্যাগ করিয়া নূতন করিয়া হইয়া উঠিবার পালার। 'প্রভাতসংগীতে'র অস্পষ্ট কবিচেতনার মধ্যেই মরণের মধ্য দিয়া চিরজীবনের কল্পনা জাগিয়া উঠিয়াছিল—

মরণ বাড়িবে যত কোথায়, কোথায় যাব,
বাড়িবে প্রাণের অধিকার,
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার।
উঠিবে জীবন মোর কত না আকাশ ছেয়ে
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশী,
যুগ-যুগান্তর যাবে নব নব রাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি। (অনন্ত মরণ)

এই যৌবন-অনুভূতিই পরিণতি লাভ করিয়াছিল 'বলাকা'র 'শা-জাহান' কবিতায় প্রকাশিত দৃঢ় প্রত্যয়ে—

প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ,
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে।
প্রভাতের সিংহদ্বারপানে।

কালে কালে স্তরে স্তরে জীবনের এই অবিরাম ধারাকে প্রথম প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেও এক জীবন-দেবতা, এই ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিত্য আত্মবিকাশের অগ্রগতির পথেও আগাইয়া লইয়া যাইতেছে এক জীবন-দেবতা; জীবনে জীবনে বিচিত্র পরিবেশের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া সেই একই জীবন-দেবতার সহিত পরিচয়; সকল নূতন পরিবেশের ভিতর দিয়া তাই খেলা করিতেছে একই পুরাতন 'আমি' আর সেই একই পুরাতন জীবন-দেবতা। এই জীবন-দেবতা ঠিক বিশ্বদেবতা নন; ইনি হইলেন বিশ্বদেবতারই ব্যক্তিজীবন-কেন্দ্রে প্রতিফলিত একটি বিশেষ রূপ, বিশেষ জীবন-ধারার সঙ্গে যুক্ত হইয়া বিশেষ জীবন-ধারা দ্বারা অবচ্ছিন্ন বিশেষ দেবতা। এই জীবন-দেবতা রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনও জীবনের নিরুদ্দেশ যাত্রায় নীরবে অঙ্গুলি তুলিয়া ইঙ্গিত-দানকারিণী মধুরহাসিনী বিদেশিনী হইয়া দেখা দিয়াছেন, কখনও কবিজীবনের অনন্তকৌতুকময়ী অন্তর্যামিনীরূপেও দেখা দিয়াছেন, কখনও 'পউষ প্রখর শীতে জর্জর' মৃত্যুরজনীতে কৃষ্ণ অশ্বে আরূঢ়া অবগুণ্ঠনবতী চিররহস্যময়ী নারী হইয়া দেখা দিয়াছেন, কখনও তাঁহার কাব্যজীবনের 'মহারানী' হইয়া দেখা দিয়াছেন, কখনও দেখা দিয়াছেন সমগ্র জীবনযাত্রায় অন্তরতমরূপে, আবার কখনও দেখা দিয়াছেন এক পরম অধ্যাত্ম দয়িত রূপে—যাঁহাকে কবি

কোথাও ভগবান্ বা ঈশ্বর নাম দেন নাই, বন্ধু বলিয়াছেন, নাথ বলিয়াছেন, সখা বলিয়াছেন, মিতা বলিয়াছেন, দোসর বলিয়াছেন, সুন্দর বলিয়াছেন, হৃদয়-রাজা বলিয়াছেন—আর বলিয়াছেন সকল আনন্দে সকল বেদনায় এক লীলাময় 'তুমি'। চিরন্তনের প্রবহমাণ এই 'আমি'-ধারার উপরে নিত্য 'তুমি'র স্পর্শই জীবনকে অমৃতত্ব দান করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের গানগুলির ভিতর দিয়া এই অমৃতত্ব বা অমরত্বই রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে নির্ভয় দান করিয়াছে—সান্ত্বনা দান করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মবিশ্বাসের অনুসরণ করিলে অমরত্বের এই বিশ্বাসই প্রধান হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু পূর্বেই দেখিয়াছি, কবি ব্যক্তি-জীবনের এই ধারাকে সম্পূর্ণ একটি পৃথক্ ধারা না রাখিয়া ক্ষণে ক্ষণে ইহাকে বিশ্বমানবের জীবনধারার মত মিলাইয়া লইবার প্রেরণা অনুভব করিয়াছেন। যেখানে তিনি তাঁহার বিশেষ 'আমি'-ধারার সঙ্গে একটি 'তুমি'কে যুক্ত করিয়া বিরলে এই 'আমি-তুমি'র নিত্যবিচিত্র রহস্য-লীলা আস্বাদ করিতে চাহিয়াছেন সেখানেই কবির মধ্যে 'একাকিত্বে'র ঝোঁক প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানেই কবি বিশ্বজনের আড়ালে একা একা একটি 'তুমি'কে গান শুনাইতে চাহিয়াছেন; যেখানে এই বিশেষ আমিকে আবার সকল আমির সহিত যুক্ত করিবার প্রেরণা লাভ করিয়াছেন সেখানে আবার 'তুমি'কেও সকলের ভিতরকার অন্তর্যামী 'তুমি'কে মিশাইয়া যে এক 'তুমি' তাহার সহিত যুক্ত করিয়া লইয়াছেন। এই এক 'আমি'কে সকল 'আমি'র সহিত যুক্ত করিয়া লইবার প্রেরণাই রবীন্দ্রনাথের ভিতরে নূতন করিয়া এক মানবতাবোধ গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই মানবতাবোধকে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অমরতাবোধের একটি নূতন রূপ লক্ষ্য করিতে পারি; সে রূপটি স্পষ্ট হইয়া দেখা দিয়াছে যেখানে তিনি তাঁহার *The Religion of Man* গ্রন্থে বলিলেন, "his multi-personal

humanity is immortal"—মানুষের মধ্যে বহুব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে গঠিত যে মানবতা তাহাতেই হইল মানুষের অমরতা। এই মানবতার মধ্যে যে পূর্ণতার আদর্শ বিদ্যমান সেই মানবীয় পূর্ণতার আদর্শের মধ্যেই নিহিত মানবের অমরতা। এই কথাই কবি বার বার করিয়া বলিয়াছেন তাঁহার 'মানুষের ধর্ম' ভাষণে, "মানুষ যেদিকে সেই ক্ষুদ্র অংশগত আপনার উপস্থিতকে প্রত্যক্ষকে অতিক্রম ক'রে সত্য, সেইদিকে সে মৃত্যুহীন"।

এই মানবতাবোধের জাগরণে রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক একের বোধ নূতন বিস্তার এবং নূতন ব্যাখ্যা লাভ করিয়াছে। আমরা কিছু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের পথে যে অমরতাবোধ তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে 'শান্তি-নিকেতনে' সঙ্কলিত একটি ভাষণের ('প্রাচীন ভারতের এক') কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছি; সেখানে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের 'এষাস্য পরমা গতিঃ এষাস্য পরমা সম্পৎ, এষো ঽস্য পরমো লোক এষো ঽস্য পরম আনন্দঃ' বাণীটি উদ্ধৃত করিয়া কি করিয়া সৃষ্টির মধ্যে 'স্তব্ধ' একের মধ্যে অমৃতত্ব বা অমরতার সন্ধান লাভ করিতে হইবে তাহারই কথা বলিয়াছেন। কবি উপনিষদের এই বাণীটি তাঁহার 'মানুষের ধর্ম' ভাষণটির ভিতরেও উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সেখানে তিনি বলিয়াছেন—

"এখানে উনি এবং এ, দুইয়ের কথা। বলছেন, উনি এর পরম গতি, উনি এর পরম সম্পদ, উনি এর পরম আশ্রয়, উনি এর পরম আনন্দ। অর্থাৎ, এর পরিপূর্ণতা তাঁর মধ্যে। উৎকর্ষের পথে এ চলেছে সেই বৃহতের দিকে, এর ঐশ্বর্য সেইখানেই, এর প্রতিষ্ঠা তাঁর মধ্যেই, এর শাশ্বত আনন্দের ধন যা কিছু সে তাঁতেই।"

এখানকার এই 'এ' কে? আর 'উনি'ই বা কে? 'এ' হইল ব্যক্তি-মানব, আর 'উনি' হইলেন মহামানব বা মানবব্রহ্ম—এবং "আমাদের ঋতে সত্যে তপস্যায় ধর্মে কর্মে সেই বৃহৎ মানবকে আমরা বিষয়ীকৃত করি।"

এই মানবতাবোধ যেমন কবির মধ্যে জীবনের কোনও বিশেষ কালে বিশেষ প্রভাবে উদ্ভূত সত্য নয়—ইহা যেমন তাঁহার শৈশবের যুগ হইতেই তাঁহার মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছিল এবং অস্পষ্ট চেতনার আবরণ মুক্ত হইয়া কর্মযোগে পরিণত বয়সে বলিষ্ঠরূপ ধারণ করিয়াছিল, মানবতাবোধের সঙ্গে যুক্ত অমরতাবোধের ক্রমবিকাশও ঠিক সেই একই সঙ্গে একইভাবে। 'প্রভাতসংগীতে'র 'অনন্ত জীবন' কবিতাতেই দেখিতে পাই, 'এ আমার গানগুলি দু-দণ্ডের গান, রবে না রবে না চিরদিন' এই বেদনা প্রথম যৌবনেই কবিচিত্তকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল; কিন্তু আপনার মধ্যেই তিনি এ সংশয়ের উত্তর পাইয়াছিলেন—

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।
নদী স্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা,
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
জান না কোথায় তারা যায়!
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ।

এই রকম প্রতিটি ব্যক্তি-হৃদয়ের গান মিলিয়া মিশিয়া মানুষের মহা-সঙ্গীত রচিত হইয়া উঠিতেছে। প্রতিনিয়ত স্নেহ-ভালোবাসা লইয়া মানুষের ঘরে ঘরে আমরা কত ছবি দেখিতেছি; জীবনের দেখা সব ছবিই যে আমরা সব সময় মনে করিয়া রাখিতে পারি তাহা নয়—

কত কী যে দেখেছিনু হয়তো সে-সব ছবি
আজ আমি গিয়েছি পাসরি।
তা বলে নাহি কি তাহা মনে
ছবিগুলি মেশে নি জীবনে?

জীবনের যখন যেখানে মানুষের যত ছবি দেখিয়াছি, যত গান শুনিয়াছি তাহা সব আমার মনে-প্রাণে মিশিয়া গিয়া আমার জীবনকে মুহূর্তে মুহূর্তে গড়িয়া তুলিয়াছে, এবং এই পদ্ধতিতেই মহামানবের মহাজীবন গড়িয়া ওঠে।

সকলি মিশিছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা,
এই যে যা কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলে খেলা।

'প্রভাতসংগীতে'র এই 'অনন্তজীবনে'র আদর্শ অবশ্য রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তি-জীবনের অনন্তপ্রবাহের ভিতর দিয়া যে অখণ্ডতার আদর্শ তাহারই সহিত যুক্ত; কিন্তু এখানেও এই ব্যক্তিজীবনের ধারাগুলি মিলিয়া মিশিয়া যে একটি মহামানবের সত্য গড়িয়া তুলিতেছে এবং মহামানবের সেই গড়িয়া ওঠার মধ্যে ব্যক্তি-মানবের অমরতা লুকায়িত রহিয়াছে এ-কথার আভাস রহিয়াছে। 'প্রভাতসংগীতে' যাহা আছে আভাসে 'কড়ি ও কোমলে' তাহা কুঁড়ি হইয়া ফুটিয়া উঠিল।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

*　　*　　*

ধরার প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সংগীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়।

মানবের সুখ-দুঃখের মধ্যেই অমর আলয় রচনা করিবার যে আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রথম স্পষ্ট উচ্চারণ দেখিতে পাইলাম এইখানে। যৌবনের এই আকাঙ্ক্ষার চমৎকার পরিণতি লক্ষ্য করিতে পারি, 'পরিশেষে'র 'আমি' কবিতাটির ভিতরে। স্মরণ রাখিতে হইবে, 'পরিশেষে'র

কবিতা রচনার পূর্বে কবি *The Religion of Man* এই ভাষণ দিয়া আসিয়াছেন; সুতরাং শাশ্বত মানুষ বা মানব-ব্রহ্মের আদর্শ তখন তাঁহার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; শুধু মননে নহে কর্মযোগে বিশ্ব-মানবের সহিত মিলনেও এ আদর্শ তাঁহার জীবনে সত্য হইয়া উঠিয়াছে। যে কথা দেখিতে পাই এই যুগের বিভিন্ন ভাষণে সেই কথাই দেখিতে পাই এই যুগের কবিতাতেও।—

জানি তাই, সে-আমি তো বন্দী নহে আমার সীমায়,
পুরাণে বীরের মহিমায়
আপনা হারায়ে
তারে পাই আপনাতে দেশকাল নিমেষে পারায়ে।
যে-আমি ছায়ার আবরণে
লুপ্ত হয়ে থাকে মোর কোণে
সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।
যুগে যুগে কবির বাণীতে
সেই আমি আপনারে পেয়েছে জানিতে।
দিগন্তে বাদলবায়ু বেগে
নীল মেঘে
বর্ষা আসে নাবি।
বসে বসে ভাবি
এই আমি যুগে যুগান্তরে
কত মূর্তি ধরে,
কত নামে কত জন্ম কত মৃত্যু করে পারাপার
কত বারম্বার।
ভূত ভবিষ্যৎ লয়ে যে বিরাট অখণ্ড বিরাজে
সে মানব-মাঝে
নিভৃতে দেখিব আজি এ আমিরে,
সর্বত্রগামীরে।

অবশ্য পূর্বেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, মহামানবের কথা বলিতে গিয়া কবি মহামানবের ধারাকে বিশ্বসৃষ্টির সমগ্রধারা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন নাই; মানবধারাকে বিশ্বধারার সঙ্গেই মিলাইয়া লইয়াছেন. কিন্তু বিশ্বধারার বুকে অমৃতের বাণী যে ফুটিয়া উঠিয়াছে মানবধারার ভিতর দিয়াই—এবং বিশ্বপ্রকৃতির আর যাহা কিছু সব যে এই মানবধারার ভিতর দিয়া অমৃতের বাণী জাগাইয়া তুলিবারই সাধনা করিতেছে এ সত্য কবির মনকে পরিপূর্ণভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। 'পুনশ্চে'র 'শিশুতীর্থ' কবিতাটির শেষভাগে দেখিতে পাই—

> প্রভাতের একটি রবিরশ্মি রুদ্ধদ্বারের নিম্নপ্রান্তে তির্যক হয়ে পড়েছে।
> সম্মিলিত জনসংঘ আপন নাড়ীতে নাড়ীতে যেন শুনতে পেলে
> সৃষ্টির সেই প্রথম পরমবাণী, মাতা, দ্বার খোলো।

এই মাতা কে? মাতা বসুন্ধরা। সমস্ত সৃষ্টি আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া আছে কবে মাতা বসুন্ধরা তাঁহার তৃণশয্যায় মানবশিশু কোলে করিয়া বসিয়া থাকিবেন, সেই মানবশিশুর মধ্যে ঘনীভূত হইয়া রূপ লাভ করিবে সৃষ্টির সকল অর্থ।—

> দ্বার খুলে গেল।
> মা বসে আছেন তৃণশয্যায়, কোলে তাঁর শিশু,
> উষার কোলে যেন শুকতারা।
> দ্বারপ্রান্তে প্রতীক্ষাপরায়ণ সূর্যরশ্মি শিশুর মাথায় এসে পড়ল।
> কবি দিলে আপন বীণার তারে ঝংকার, গান উঠল আকাশে:
> জয় হোক মানুষের, ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।
> সকলে জানু পেতে বসল, রাজা এবং ভিক্ষু, সাধু এবং পাপী, জ্ঞানী এবং মূঢ়;
> উচ্চস্বরে ঘোষণা করলে: জয় হোক মানুষের,
> ওই নবজাতকের, ওই চিরজীবিতের।

এই কথাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন তাঁহার 'শান্তিনিকেতনে' 'সত্য হওয়া' নামক ভাষণটিতে—

"মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করেন বলে বিশ্বের সূতিকা গৃহে অনেক দিন ধরে চন্দ্র সূর্য তারায় মঙ্গলপ্রদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ।"

'বীথিকা'র 'নব পরিচয়ে'র মধ্যে দেখি, নব নব জন্ম বহিয়া এক খেয়াতরীতে করিয়া যে একটি 'আমি'র বার বার আনাগোনা এই আমির পরিচয় লইতে গিয়া কবি অনুভব করিতে পারিয়াছেন—

অনন্তের হোমানলে
যে-যজ্ঞের শিখা জ্বলে,
সে-শিখা হতে এনেছে দীপ জ্বালি।

অনন্তের বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে আত্মাহুতির হোমানলের শিখা হইতে এই যে একটি জীবনের দীপ জ্বালাইয়া লওয়া গিয়াছে ইহার গতি কোন্ দিকে?

এ-সংসারে সব সীমা
ছাড়ায়ে গেছে যে-মহিমা
ব্যাপিয়া আছে অতীতে অনাগতে,
মরণ করি অভিভব
আছেন চির যে-মানব
নিজেরে দেখি সে-পথিকের পথে।

এই চিরমানবপথের পথিক হইয়া চিরমানবের চলার মধ্যেই হইল অমরত্বের আশ্বাস। 'বীথিকা'র মধ্যে এই দৃষ্টিতে কবি মরণকে 'মাতা' বলিয়া দেখিতে পাইয়াছেন—

চলে যে যায় চাহে না আর পিছু,
তোমারি হাতে সঁপিয়া যায় যা ছিল তার কিছু।
তাহাই লয়ে মন্ত্র পড়ি
নূতন যুগ তোল যে গড়ি—
নূতন ভালো মন্দ কত, নূতন উঁচুনিচু।

রোধিয়া পথ আমি না রব থামি ;
প্রাণের স্রোত অবাধে চলে তোমারি অনুগামী।
নিখিল ধারা সে স্রোত বাহি
ভাঙিয়া সীমা চলিতে চাহি
অচলরূপে রব না বাঁধা অবিচলিত আমি।

সহজে আমি মানিব অবসান,
ভাবী শিশুর জনমমাঝে নিজেরে দিব দান।
আজি রাতের যে-ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল দুলি
ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

নিজের জীবনে ফুল ফুটাইয়া যদি তাহা দ্বারা আগামী দিনের মানবের জীবনের কোনও ফুল ফুটাইতে সাহায্য করিতে পারি তবে তাহাই জীবনকে দিবে অমরত্বের সন্ধান। একদিন কবি নিজের জীবনের যত গান, কবিতা, অন্য যাহা কিছু তাঁহার সৃষ্টি সকলকেই আত্মানন্দের চরমমূল্যেই সার্থক বলিয়া দেখিতে চাহিয়াছিলেন ; কিন্তু শেষের দিকে অন্য বোধটাই যেন কবির আত্মপুরুষকে সর্বাবস্থায় ধারণ করিয়া রাখিতেছিল ; যাহা কিছু তাঁহার দান তাহা দ্বারা নিজের ভিতর দিয়া মহামানবকে যতখানি বিকশিত করিয়া যাইতে পারিয়াছেন এবং তাহা দ্বারা ভাবিকালের মানুষকে তাহাদের নিজেদের মধ্যে মহামানবতাকে বিকশিত করিয়া তুলিতে যতখানি সাহায্য করিতে পারিয়াছেন সেইখানেই তাঁহার জীবনের সকল সার্থকতা, সেইখানেই তিনি মৃত্যুঞ্জয় হইয়া মহামানবের মধ্যে বাঁচিয়া রহিলেন।

মানুষের জীবনের একটা যে প্রাত্যহিক দিক আছে এই দিকটাতেই হইল মানুষের অনিত্য লীলা ; এই প্রাত্যহিকতার অনিত্যলীলার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে চাহিতেছে মানুষের

নিত্য ; যেখানে ফুটিয়া ওঠে সেই নিত্যলীলার আভাস—সেইখানেই মানুষের মধ্যে আবির্ভাব দেবতার।

দেবতা মানবলোকে ধরা দিতে চায়
মানবের অনিত্য লীলায়।— বীথিকা, দেবতা ।

এইরূপেই কোনও কোনও মানুষের মধ্যে আবির্ভূত হন 'দেবসেনাপতি'; তিনি মৃত্যুপণে সর্ব অমঙ্গলের উপরে হানেন আঘাত—বিকীর্ণ করিয়া দেন দিব্যজ্যোতি ; তাহারই প্রেরণায়—

ত্যাগের বিপুল বল
কোথা হতে বক্ষে আসে,
অনায়াসে।
দাঁড়াই উপেক্ষা করি প্রচণ্ড অন্যায়ে
অকুণ্ঠিত সর্বস্বের ব্যয়ে।
তখন মৃত্যুর বক্ষ হতে
দেবতা বাহিরি আসে অমৃত-আলোতে ;
তখন তাহার পরিচয়
মর্ত্যলোকে অমর্ত্যেরে করি তোলে অক্ষুণ্ণ অক্ষয়।—বীথিকা, দেবতা।

মানবতার মধ্যে এইভাবে যখন দেবত্বের মহাবতরণ তখনই মর্ত্য অমর্ত্য হইয়া ওঠে ; সেই দিকটাই হইল শাশ্বতের দিক। মহামানবতার অবতরণেই মানুষের অমরত্ব। এইবোধে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই কবি 'আকাশ প্রদীপে'র 'ভূমিকা'য় বলিয়াছেন—

আমি বদ্ধ ক্ষণস্থায়ী অস্তিত্বের জালে,
আমার আপন-রচা কল্পরূপ ব্যাপ্ত দেশে কালে;
এ কথা বিলয় দিনে নিজে নাই জানি
আর কেহ যদি জানে তাহারেই বাঁচা ব'লে মানি।

'জন্মদিনে'ও কবির মধ্যে দেখি সেই বিশ্বাস এবং আশ্বাস।—

খেলাঘরে আজ যবে খুলে যাবে দ্বার
ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম,
দিয়ে যাব জীবনের সে নৈবেদ্যগুলি
মূল্য যার মৃত্যুর অতীত। (১৩ সং)

জীবনের অমৃতত্বের সহিত কবির মানবতাবোধ কিভাবে মিশিয়া গিয়াছিল 'আরোগ্যে'র শেষের দুইটি কবিতার মধ্যে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। ৩২শ সংখ্যক পদে কবি অনুভব করিতেছেন—

এক আদি জ্যোতি-উৎস হতে
চৈতন্যের পুণ্যস্রোতে
আমার হয়েছে অভিষেক,
ললাটে দিয়েছে জয়লেখ,
জানায়েছে অমৃতের আমি অধিকারী ;
পরম-আমির সাথে যুক্ত হতে পারি
বিচিত্র জগতে
প্রবেশ লভিতে পারি আনন্দের পথে।

কিন্তু এই 'পরম আমি' কে? তাহার উত্তর লাভ করা যায় ঠিক পরের কবিতাটিতেই—

এ আমির আবরণ সহজে স্খলিত হয়ে যাক ;
চৈতন্যের শুভ্র জ্যোতি
ভেদ করি কুহেলিকা
সত্যের অমৃত রূপ করুক প্রকাশ।
সর্ব মানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দ কিরণ
চিত্তে মোর হোক বিস্তারিত।

অমরতা রবীন্দ্রনাথের কাছে ন্যায়-যুক্তির পথে লব্ধ স্পষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত নহে, একটি বিশ্বাসমাত্র, কোনও জাতিগত সংস্কারের দ্বারা লব্ধ বিশ্বাসও নহে—নিজের বিচিত্র অনুভূতির ভিতর দিয়া নানাভাবে

গড়িয়া ওঠা একটা গভীর বোধ। গভীর বোধ মানুষের চিত্তে যখন একটা স্থিরতা লাভ করে—এবং বোধের সেই স্থিরতা যখন মানবচিত্তের মধ্যে জড়তাদ্রোহী প্রবল একটা প্রেরণা রূপে দেখা দেয় তখনই আমরা বলিয়া থাকি যে বোধ সেখানে বিশ্বাসের রূপ ধারণ করিয়াছে। অমরতা রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে এই জাতীয়ই একটি বিশ্বাস। এ-বিশ্বাসের মূল্য বাস্তবজীবনে ইহার সক্রিয়তায়। অমরতার কোন্ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে ইতিহাসের প্রতিক্রিয়ায় মুহ্যমান চেতনার মধ্যে নূতন তেজ ও তাপের সঞ্চার করিয়াছিল? নিস্তরঙ্গ নঙর্থক সন্মাত্রে পর্যবসিত কোনও পূর্ণস্বরূপের মধ্যে আত্ম-বিসর্জনের অমরতা নয়—মহামানবের ব্রহ্মকমলে বিকশিত পূর্ণস্বরূপের ভিতরে নিত্য-আত্ম-প্রবহণের অমরতা। এই নিত্যকালের মহামানবতার বোধই রবীন্দ্রনাথের চিত্তে এক গভীর অধ্যাত্মবোধ রূপেই দেখা দিয়াছিল, এইজন্য তাঁহার অধ্যাত্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই তিনি গভীর উল্লাসে এই মহামানবের আগমনী-গান গাহিতে পারিয়াছিলেন—

ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।

* * * *

উদয় শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ
নবজীবনের আশ্বাসে।
'জয় জয় জয় রে মানব অভ্যুদয়'
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।

এই চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই রবীন্দ্রনাথ অমর মানুষ সম্বন্ধে এমন করিয়া গাহিতে পারিয়াছিলেন—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি।

নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর,
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক—
তোমাদের স্মরি ॥

॥ ১১ ॥

রবীন্দ্র-মানসের স্বাতন্ত্র্যের ধারা লক্ষ্য করিলাম প্রথমে তাঁহার গভীর মানবতাবোধে, পরে সেই মানবতাবোধের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত তাঁহার অমরতাবোধে; এবার লক্ষ্য করিব কবির মুক্তির আদর্শের মধ্যে। কবির এই মুক্তির আদর্শও সম্পূর্ণ একটা পৃথক্ আদর্শ নয়, কবির মানবতার ধারণার সঙ্গে জাগিয়া উঠিয়াছে যে অমরত্বের বিশ্বাস তাহারই সঙ্গে লক্ষ্য করা যাইতে পারে মানবতার ধারণার সঙ্গে যুক্ত তাঁহার মুক্তির বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের অমরত্বের বিশ্বাসের সহিত তাঁহার মুক্তির বিশ্বাসও একই অদ্বয়বোধ হইতে জাত; কিন্তু এই মুক্তির বিশ্বাসের মধ্যে তাঁহার অদ্বয়বোধ কি রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তাহাই লক্ষ্য করি।

রবীন্দ্রনাথের সত্যদৃষ্টির সহিত জীবনের যে সাধনার পথ তাঁহার সহজাত প্রেরণায় তিনি বাছিয়া লইয়াছিলেন তাহার ভিতরেই বেশ দেখা যায়, নিবৃত্তির পথ তাঁহার সাধনপথ নহে। সত্য-দর্শনের জন্য তিনি যে অহং ত্যাগ ও প্রাত্যহিকতার আবরণ ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন তাহা শুধু একের বোধে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য; কিন্তু একের বোধে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর আবার ফিরিয়া আসিতে হইবে এই রূপের জগতে—সীমার জগতে—আনন্দ-লীলার জগতে। চেষ্টা করিতে হইবে ইহার সব কিছুর ভিতর দিয়াই সেই একের স্পর্শ লাভ করিতে। সকলের ভিতর দিয়াই এই একের স্পর্শলাভের কবির এই যে বাসনা, তাহা তাঁহার জীবনে দুইটি ধারা গ্রহণ করিয়াছে,—একটি হইল সৌন্দর্যসাধনায় মুক্তি, অপরটি হইল

প্রেমসাধনায় মুক্তি। উভয়ে পরস্পরের প্রতিস্পর্ধী নহে, উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, প্রাণের প্রথম যাত্রাক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া নিরন্তর আবর্তন-বিবর্তনের ভিতর দিয়া প্রাণের চরম প্রকাশ ঘটিয়াছে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে অনন্ত সৌন্দর্যে; কিন্তু বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে প্রাণের বিকাশ এই সৌন্দর্যেই থামিয়া আছে—তাহার নূতন যাত্রা চলিয়াছে মানুষের মধ্যে—সেখানে সৌন্দর্য রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে অনন্ত প্রেমে। রবীন্দ্রনাথ মুক্তি লাভ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এই দুই দিকেই। সৌন্দর্যের ভিতর দিয়া বিশ্বপ্রাণের সহিত নিবিড়ভাবে যুক্ত হইয়া—আবার প্রেমের ভিতর দিয়া দিয়া নিখিল মানবের সঙ্গে যুক্ত হইয়া। বহুদিন কবি নিজের মধ্যে এই সৌন্দর্যের এবং প্রেমের একটি দোটানা অনুভব করিয়াছেন। সৌন্দর্যের আহ্বান তাঁহাকে অনেকখানি যেন মানববিমুখী করিয়া অশেষ আকর্ষণে প্রকৃতির দিকেই টানিয়া লইতে চাহিয়াছে,—আবার মানবের আহ্বানকেও তিনি উপেক্ষা করিতে পারেন নাই—প্রেমের প্রেরণায় 'সম্মুখেতে কষ্টের সংসার'কেও অবজ্ঞা করিতে পারেন নাই। বিশ্বপ্রকৃতির ভিতর দিয়া বিচিত্র লীলাময়ী অনন্ত রহস্যময়ী এক মোহিনীর যে সর্বনাশা আহ্বান, তাহার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির 'সোনার তরী'র 'মানসসুন্দরী'তে, 'গীতিমাল্যে'র 'বিদেশিনী' কবিতার মধ্যে, 'পূরবী'র 'লীলাসঙ্গিনী' কবিতায়, 'বিচিত্রিতা'র 'ছায়াসঙ্গিনী' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে এই রহস্যাবগুণ্ঠিতা নারী যে তাহার চরম আকর্ষণে কবির সবটুকু হৃদয়কেই অধিকার করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল—বিশ্বসংসার হইতে তাঁহাকে একান্ত সুদূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতে চাহিয়াছিল—কবিও যে ক্ষণে ক্ষণে বিবাগী হইয়া তাহারই হাতে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার মদির স্মৃতি শেষ বয়স পর্যন্ত তাঁহাকে ব্যাকুল এবং উন্মনা করিয়া তুলিয়াছে। জীবনে মানুষ যে-নারীর আকর্ষণে মত্ত হইয়া সব কিছু হইতে দূরে সরিয়া একমাত্র তাহারই

রূপে হৃদয় ভরিতে চাহে, তাহার রূপকেই প্রেমে পরিণতি দান করিয়া তাহাকে আবার সংসারের মধ্যে লইয়া আসে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করিয়া। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার এই অনন্ত সৌন্দর্য-পিপাসাকে ক্রমে ক্রমে সংসারের মধ্যে—কর্মময় জীবনের মধ্যেই সাদরে বরণ করিয়া লইবার চেষ্টা করিলেন। সেই চেষ্টারই বাস্তব রূপ তাঁহার শান্তিনিকেতনে। শান্তিনিকেতনের পরিকল্পনা এবং রূপায়ণের মধ্য দিয়া সৌন্দর্য ও প্রেমের এই ভিন্নমুখী টান একটি অপূর্ব সামঞ্জস্য লাভ করিল, এই সামঞ্জস্য রবীন্দ্রনাথের জীবনেরই গভীর সামঞ্জস্য, ইহার ভিতর দিয়া সৌন্দর্য ও প্রেম তাঁহার জীবনে একটা একমুখী গতি লাভ করিল। সৌন্দর্যের আকর্ষণের মধ্যে যে সর্বদা একটা ঘর-পালানো ভাব ছিল তাহা পরিবর্তিত হইল ঘরের মধ্যেই সৌন্দর্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টায়—অর্থাৎ মানুষকে বাদ দিয়া সৌন্দর্য নয়, যতটা সম্ভব মানুষকে লইয়াই সৌন্দর্য।

এই সৌন্দর্য ও প্রেম, প্রকৃতি ও মানুষ—এই উভয় জুড়িয়া অনন্ত মুক্তি। ইহারই আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে। এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রসিদ্ধ গান হইল 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে'। গানটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই জন্য যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মুক্তির মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতি এবং বিশ্বমানব উভয়কেই কিভাবে যুক্ত করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন, তাহারই ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে গানটির মধ্যে। গানটির প্রথম অংশে দেখিতে পাই—

আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে,
আমার মুক্তি ধুলায় ধুলায় ঘাসে ঘাসে ॥
দেহ মনের সুদূর পারে
হারিয়ে ফেলি আপনারে,
গানের সুরে আমার মুক্তি ঊর্ধ্বে ভাসে ॥

এই পর্যন্ত আসিয়াই শেষ হইলে ইহাকে ঘর-পালানো মুক্তি

বলিতাম—অর্থাৎ মানুষকে ত্যাগ করিয়া শুধু প্রকৃতির মধ্যে মুক্তি; কিন্তু গানটির পরের অর্ধে দেখিতে পাই—

আমার মুক্তি সর্বজনের মনের মাঝে,
দুঃখবিপদ-তুচ্ছ-করা কঠিন কাজে।
বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা,
আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা—
জীবন যেন সেই আহুতি মুক্তি-আশে॥

এই দুই অর্ধ জুড়িয়া তবে তাঁহার অখণ্ড মুক্তি।

অনন্ত সৌন্দর্যপিপাসা এবং প্রেমপিপাসা লইয়াই রবীন্দ্রনাথ এক নূতন মুক্তির বাণী শুনাইলেন। আমরা সাধারণতঃ যতপ্রকার মুক্তির সহিত পরিচিত তাহা হইল এই তৃষ্ণা ত্যাগ করিয়া; কিন্তু তৃষ্ণাকে অনন্ত ব্যাপ্তি ও গভীরতা দান করিয়াই মুক্তি লাভ করিতে হয়, 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ' এই কথাটাকেই সমগ্র জীবন ধরিয়া বলিতে দেখিলাম রবীন্দ্রনাথকে।

এই যে 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মুক্তির স্বাদে'র কথা—এই কথাটাই রবীন্দ্রনাথের মুক্তি-সাধনার সর্বাপেক্ষা বড় কথা। বন্ধনের মধ্যেই মুক্তি কেন? রবীন্দ্রনাথের মতে সমগ্র সৃষ্টির বাণীই ত হইল এই এক বাণী। সৃষ্টি ত একদিকে পাকে পাকে বন্ধন—আবার সেই বন্ধনের ভিতর দিয়াই ত অনন্ত প্রকাশ—সেই অনন্ত প্রকাশেই অনন্ত মুক্তি। মুক্তির জন্যই ত বিধাতাপুরুষ এই সৃষ্টির বন্ধন গ্রহণ করিয়াছেন, 'আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে বাঁধা সবার কাছে'। এই সৃষ্টির বন্ধন যদি গ্রহণ না করিতেন তবে আদিতে যিনি এক, তিনি ত অপ্রকাশে আত্মচৈতন্যের অভাবে চিরকাল অসৎরূপে অবস্থান করিতেন। তিনি সৎ হইয়া উঠিবার জন্যই এক-স্বরূপতা ছাড়িয়া বহু হইলেন—এক অবর্ণ হইয়াও বহুধা শক্তিযোগে অনেক বর্ণকে সম্ভব করিয়া তুলিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে সৃষ্টির অর্থই হইল আত্ম-সর্জন, আত্ম-ত্যাগ। নিজের মধ্যে যাহা কেবল সম্ভাবনারূপে

নিহিত ছিল—অমূর্ত ছিল—তাহাকে রূপে রসে শব্দে গন্ধে স্পর্শে কেবলই মূর্তি দান করিয়া অনন্ত দেশে কালে ছড়াইয়া দেওয়া। ইহাকেই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন বিশ্বধাতার বিশ্বহোম, সমস্ত সৃষ্টিই হইল 'বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা', এ যজ্ঞে নিজেই নিজেকে শুধু আহুতি দিতেছেন রূপে রসে বর্ণে গন্ধে কেবলই আত্ম-সর্জন বা আত্ম-প্রকাশের ভিতর দিয়া ; তাই এই যজ্ঞশালায় কেবল 'আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা'। এই আত্ম-ত্যাগের দ্বারাই ত আত্মবিকাশ। আত্ম-বিকাশেই ত সর্বাধিক আত্ম-উপলব্ধির আনন্দ—এই আনন্দই মুক্তির আনন্দ। এই জন্য রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, মুক্তির বাণী তিনি কোনও শাস্ত্র হইতে গ্রহণ করিতে রাজি নন, মুক্তির বাণী তিনি গ্রহণ করিতে চান স্বয়ং নটরাজের নিকট হইতে।

আমি নটরাজের চেলা
চিত্তাকাশে দেখছি খেলা,
বাঁধন খোলার শিখছি সাধন
মহাকালের বিপুল নাচে।
দেখছি, ও যার অসীম বিত্ত
সুন্দর তার ত্যাগের নৃত্য,
আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ
আপনাতে যার আপনি আছে।
যে-নটরাজ নাচের খেলায়
ভিতরকে তার বাইরে ফেলায়,
কবির বাণী অবাক মানি'
তারি নাচের প্রসাদ যাচে।

কবি তাহা হইলে নটরাজের নিকট হইতে এই দীক্ষা লাভ করিলেন, অনন্ত প্রকাশের ভিতর দিয়া নিজের সত্তায় নিহিত আছে যাহা কিছু সম্ভাবনা তাহাকে কেবল 'বাইরে ফেলা'তেই হইল মুক্তি। বন্ধনে বন্ধনে না জড়াইয়া ত প্রকাশ হয় না—বন্ধনের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশেই তাই মুক্তি।

শুনবি রে আয়, কবির কাছে
তরুর মুক্তি ফুলের নাচে,
নদীর মুক্তি আত্মহারা
নৃত্যধারার তালে তালে।
রবির মুক্তি দেখ্‌না চেয়ে
আলোক-জাগার নাচন গেয়ে,
তারার নৃত্যে শূন্য গগন
মুক্তি যে পায় কালে কালে।
প্রাণের মুক্তি মৃত্যুরথে
নূতন প্রাণের যাত্রাপথে,
জ্ঞানের মুক্তি সত্য-সূতার
নিত্য-বোনা চিন্তাজালে।

—মুক্তিতত্ত্ব, নটরাজ।

'নটরাজ' ও তাঁহার 'ঋতুরঙ্গশালা'কেই কবি তাঁহার এই নূতন মুক্তিতত্ত্বের অভিনব শাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছেন। বাহিরে বিশ্বজীবনের ভিতর দিয়া কেবলই প্রাণের কেবলই মুক্তির বাণী মূর্ত হইয়া উঠিতেছে; এই মুক্তির লীলাকে যদি অন্তরে ধারণ করা যায় তবে মানুষের অন্তরও সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করে। এইজন্য 'নটরাজে'র সংক্ষিপ্ত প্রাক্‌কথনে কবি বলিয়াছেন—

"নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপ-লোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।"

'নটরাজে'র 'উদ্বোধন' কবিতাটিও এই মুক্তিতত্ত্বের নবসূক্ত; এখানেও কবির দীক্ষাগুরু নটরাজের নিকটেই প্রণতি—

নটরাজ, আমি তব
কবি শিষ্য, নাটের আসনে তব মুক্তিমন্ত্র লব।

তোমার তাণ্ডবতালে কর্মের বন্ধনগ্রন্থিগুলি
ছন্দবেগে স্পন্দমান পাকে পাকে সন্ত যাবে খুলি ;

ইহার পরেই প্রার্থনা—

নৃত্যের তালে তালে, নটরাজ
ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও
মুক্ত সুরের ছন্দ হে।
... ...
নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ,
নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে
কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
... ...
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায়
বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়,
যুগে যুগে কালে কালে
সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময়
তোমার পরমানন্দ হে।

নিরন্তর আত্ম-প্রকাশের নৃত্যচ্ছন্দে চঞ্চল নটরাজের এই নৃত্য-ছন্দটি হইল একটি জটিল ছন্দ, সে ছন্দে ভালো-মন্দ, হাসি-কান্না, জন্ম-মরণ সবই একটি বিরাট প্রবাহের মধ্যে আবর্তিত হইতেছে। এই জন্যই কবি নটরাজের নৃত্যে যোগ দিবার উন্মুখতা লইয়া বার বার গাহিয়াছেন—'জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে'। ইহাকেই অন্যভাবে বলিয়াছেন, 'কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে'। দুই হাতের মন্দিরায় কখনো দুই সুর বাজে নাই, দুই মন্দিরার আঘাতে আঘাতে বাজিয়া ওঠে এক সুর—

তালে তালে সাঁঝ-সকালে
রূপ-সাগরে ঢেউ লাগে।
সাদা-কালোর দ্বন্দ্বে যে ওই
ছন্দে নানান্ রঙ জাগে।
এই তালে তোর গান বেঁধে নে—
হাসিকান্নার তান সেধে নে,
ডাক দিল শোন্ মরণ বাঁচন
নাচন-সভার ডঙ্কাতে ॥

অন্য গানে বলিয়াছেন—

হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে ॥
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ ॥
কী আনন্দ, কী আনন্দ, কী আনন্দ—
দিবারাত্রি নাচে মুক্তি, নাচে বন্ধ—
সে তরঙ্গে ছুটি রঙ্গে পাছে পাছে
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ ॥

নটরাজের এই অখণ্ড নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জন্ম ও মৃত্যুকে পরস্পরবিরোধী দুইটি গতি বলিয়া মনে হয় না, উভয় জুড়িয়া একই ছন্দ একই গতি—উভয়ে নিরন্তর আগাইয়া দিতেছে একই পথে—নিত্য নূতন সম্ভাবনায় প্রকাশের পথে। এই ভাবটিই একটি অপূর্ব উন্মাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে কবির 'পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দেরে' গানটির মধ্যে। 'খসে যাবার, ভেসে যাবার, ভাঙবার' যে আনন্দ তাহাও ত নিরন্তর 'পাগল-করা গানের তানে' ধাবমান প্রবাহে হইয়া উঠিবার আনন্দ। কবি একদিকে বলিতেছেন—

পাতিয়া কান শুনিস্ না যে
দিকে দিকে গগন মাঝে

মরণবীণায় কী সুর বাজে
তপন-তারা-চন্দ্রে রে
জালিয়ে আগুন ধেয়ে ধেয়ে
জলবারই আনন্দে রে।

এই 'জ্বলবার আনন্দ' কোথায়? আত্ম-প্রজ্বলনের মধ্য দিয়াই যে লিখিত হইবে আত্ম-জীবনের ইতিহাস—আবার সেই আত্ম-জীবনের অগ্নি-অক্ষরে লিখিত ইতিহাসেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে বিশ্ব-জীবনের যত ক্ষুদ্র হোক্ কোনও একটি প্রান্ত। আবার এই মরণবীণায় যে সুরের আনন্দ,—

সেই আনন্দ-চরণ-পাতে
ছয় ঋতু যে নৃত্যে মাতে,
প্লাবন বহে যায় ধরাতে
বরণ-গীতে গন্ধে রে—।

ধরার বুকে এই যে ঋতুর নৃত্যে নৃত্যে বর্ণ-গীত-গন্ধের প্লাবন, এই প্লাবনের মধ্যে কিসের আনন্দ? এ আনন্দ জীবনের আনন্দ না মরণের আনন্দ? এ জীবনও বটে, মরণও বটে; কারণ জীবন ত কেবল আত্ম-প্রকাশ—আত্ম-ত্যাগ, তাহাকে জীবন না বলিয়া ত বলা যায়—'ফেলে দেবার, ছেড়ে দেবার, মরবারই আনন্দ'! সব ধারা একত্রিত করিয়া এই যে এক ছন্দ—এই ছন্দে যোগ দেওয়াতেই হইল মুক্তি। মুক্তির আশ্বাসে বিশ্বপ্রকৃতির সহিত এই যোগের কথা কবি নৃত্যে যোগ দিবার রূপকল্পেও প্রকাশ করিয়াছেন, সঙ্গীতে যোগ দিবার রূপকল্পেও প্রকাশ করিয়াছেন। নৃত্য আর গীত যে এক সুরে এক তানেই বাঁধা। 'বিশ্বতানে'র মধ্যে যে 'ধ্রুবপদ' রহিয়াছে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে 'জীবনগানে'র সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে।

গগনে তব বিমল নীল
হৃদয়ে লব তাহারি মিল,

শান্তিময়ী গভীর বাণী
নীরব প্রাণে।
বাজায় উষা নিশীথ কূলে
যে গীতভাষা
সে ধ্বনি নিয়ে জাগিবে মোর
নবীন আশা।

ফুলের মত সহজ সুরে
প্রভাত মম উঠিবে পুরে,
সন্ধ্যা মম সে সুরে যেন
মরিতে জানে।

এইখানেই একটা জিনিস বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। উপনিষদের একের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজের উপলব্ধ এককে যত করিয়াই মিলাইতে যান না কেন, রবীন্দ্রনাথের চিত্তধৃত এক কখনও নিশ্চল নিষ্ক্রিয় শান্ত সমাহিত এক নহেন,—রবীন্দ্রনাথের একের মধ্যে সর্বদাই একটা প্রাণ-প্রৈতি রহিয়াছে, সে এক নিত্য-নৃত্যচঞ্চল নটরাজ। এই নটরাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কবি এই যে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিলেন, তাহাতে চিত্তের ভিতর হইতে সর্বপ্রকারের আবরণ সরাইয়া দিয়া নটরাজের এই নৃত্যলীলায় যোগ দিতে হইবে। এই যোগ কিরূপে সম্ভব? শুধু কিনি ষ্ক্রিয় ভাবে লীলা-দর্শন এবং লীলা-আস্বাদন? কবি বলিবেন, নিষ্ক্রিয় দর্শনে এ-লীলার রহস্যে প্রবেশই করা যায় না, সৃষ্টিলীলার মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে সৃষ্টির ভিতর দিয়াই। গুরু নটরাজ যেমন বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া নাচের খেলায় ভিতরকে কেবলই বাহিরে ফেলিতেছেন, শিষ্য কবিকেও তেমনই নিজের সৃষ্টির ভিতর দিয়া সুরে সুরে তালে তালে নিজেকে প্রকাশ করিয়া শতদলের মত একটু একটু করিয়া বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে, নতুবা যে লীলা-রহস্যে প্রবেশ করিবার এবং নটরাজের নাচের খেলায় যোগ দিবার কোনও অধিকারই জন্মে না।

স্থষ্টি মোর স্থষ্টি সাথে মেলে যেথা, সেথা পাই ছাড়া,
মুক্তি যে আমারে তাই সংগীতের মাঝে দেয় সাড়া,—পূরবী, মুক্তি

কবি অনুভব করিয়াছেন স্থষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যের আভাস তখনই তাঁহার অন্তরে ধরা পড়িয়াছে যখন তাঁহার হৃদয়বীণাতে কোনও এক শুভ মুহূর্তে নামিয়া আসিয়াছে নটরাজের বিশ্ববীণার একটুকু স্থর। হৃদয়ে যদি সেই স্থর আসে—

তা হলে বুঝিব আমি ধূলি কোন্ ছন্দে হয় ফুল
বসন্তের ইন্দ্রজালে অরণ্যেরে করিয়া ব্যাকুল;
নব নব মায়াচ্ছায়া কোন্ নৃত্যে নিয়ত দোদুল
বর্ণ বর্ণ ঋতুর দোলায়।
তোমারি আপন স্থর কোন্ তানে তোমারে ভোলায়।
যেদিন আমার গান মিলে যাবে তোমার গানের
স্থরের ভঙ্গীতে
মুক্তির সংগমতীর্থ পাব আমি আমার প্রাণের
আপন সংগীতে। —পূরবী, মুক্তি

রবীন্দ্রনাথ এই যে মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিলেন, এ মুক্তি একস্থানে যোগাসনে স্থিরবদ্ধ হইয়া লাভ করিবার নহে, 'চলিয়া তোমার সাথে মুক্তি পাই চলার সম্পদে'; 'চঞ্চলের নৃত্যে আর চঞ্চলের গানে', 'চঞ্চলের সর্বভোলা দানে' 'আঁধারে আলোকে, স্থজনের পর্বে পর্বে, প্রলয়ের পলকে পলকে' নিত্যকাল চলিতেছে যে মহাপথিক, তাহার আবার মন্দির, স্বর্গধাম, তীর্থ কোথায়? তাহার যে অবারিত দশদিক! মুক্তি কোথায় এ-প্রশ্নের উত্তরে তাই কবি বলিবেন—

সম্মুখে প্রাণের নদী জোয়ার-ভাঁটায়
নিত্য বহে নিয়ে ছায়া আলো,
মন্দ ভালো,
ভেসে যাওয়া কত কী যে, ভুলে যাওয়া কত রাশি রাশি
লাভ-ক্ষতি কান্না-হাসি,—

এক তীর গড়ি তোলে অন্য তীর ভাঙিয়া ভাঙিয়া ;
সেই প্রবাহের 'পরে উষা ওঠে রাঙিয়া রাঙিয়া,
পড়ে চন্দ্রালোকরেখা জননীর অঙ্গুলির মতো ;
কৃষ্ণরাতে তারা যত
জপ করে ধ্যানমন্ত্র ; অস্ত সূর্য রক্তিম উত্তরী
দুলাইয়া চলে যায়, সে-তরঙ্গে মাধবীমঞ্জরী
ভাসায় মাধুরীডালি,
পাখি তার গান দেয় ঢালি।
সে তরঙ্গনৃত্যচ্ছন্দে বিচিত্র ভঙ্গীতে
চিত্ত যবে নৃত্য করে আপন সংগীতে
এ বিশ্বপ্রবাহে,
সে-ছন্দে বন্ধন মোর, মুক্তি মোর তাহে। —পরিশেষ, পান্থ

'পরিশেষে'র 'মুক্তি' কবিতাটির ভিতরেও এই মুক্তির কথা বলিয়াছেন কবি। মুক্তির অর্থই হইল 'প্রত্যহের ধূলিলিপ্ত চরণপতন পীড়া হতে' মুক্ত হইয়া বিশ্বপ্রবাহের সহিত সহজযোগে যুক্ত হওয়া।

শ্রাবণসন্ধ্যার পুষ্পবনে
গ্লানিহীন যে-সাহস সুকুমার যূথীর জীবনে—
নির্মম বর্ষণাঘাতে শঙ্কাশূন্য প্রসন্ন মধুর,
মুহূর্তের প্রাণটিতে ভরি তোলে অনন্তের সুর,
সরল আনন্দহাস্যে ঝরি পড়ে তৃণশয্যা 'পরে,
পূর্ণতার মূর্তিখানি আপনার বিনম্র অন্তরে
সুগন্ধে রচিয়া তোলে ; দাও সেই অক্ষুব্ধ সাহস,
সে আত্মবিস্মৃত শক্তি, অব্যাকুল, সহজে স্ববশ,
আপনার সুন্দর সীমায় ;—দ্বিধাশূন্য সরলতা
গাঁথুক শান্তির ছন্দে সব চিন্তা, মোর সব কথা।

রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণী'র সর্বত্রই রহিয়াছে এই মুক্তির বাণী। বনের তরুলতার ভিতর দিয়া এই মুক্তির বাণীকে কবি কি করিয়া

লাভ করিয়াছেন 'বনবাণী'র ভূমিকায় কবি তাহা নিজেই চমৎকার করিয়া বলিয়াছেন—

"ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীর তলদেশে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন। 'এতস্যৈবানন্দস্য মাত্রাণি' দেখি ফুলে ফলে পল্লবে; তাতেই মুক্তির স্বাদ পাই, বিশ্বব্যাপী প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নির্মল অবাধ মিলনের বাণী শুনি।"

যে-কথা উচ্চারিত এই ভূমিকায়, ছন্দে ছন্দে প্রসারিত সেই কথা 'বনবাণী'র কবিতায় কবিতায়—বৃক্ষরোপণ উৎসবের গানগুলিতে। 'প্রান্তিকে'র ষষ্ঠ সংখ্যক কবিতাটির মধ্যেও দেখি এই মুক্তির কথা; এখানে মুক্তি-প্রার্থনা করিতেছেন কবি সেই সংসারের কাছেই যে সংসারকে ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইবার কথাই আমরা প্রায় সর্বত্র শুনিতে পাই মুক্তিবাদিগণের বাণীতে।

মুক্তি এই—সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
নহে কৃচ্ছ্র সাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম-অস্বীকারে। রিক্ততায় নিঃস্বতায়, পূর্ণতার
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর।
আজ আমি দেখিতেছি, সম্মুখে মুক্তির পূর্ণরূপ
ওই বনস্পতিমাঝে, ঊর্ধ্বে তুলি ব্যগ্র শাখা তার
শরৎপ্রভাতে আজি স্পর্শিছে সে মহা-অলক্ষ্যেরে
কম্পমান পল্লবে পল্লবে; লভিল মজ্জার মাঝে
সে মহা-আনন্দ যাহা পরিব্যাপ্ত লোকে লোকান্তরে,
বিচ্ছুরিত সমীরিত আকাশে আকাশে, স্ফুটোন্মুখ
পুষ্পে পুষ্পে, পাখিদের কণ্ঠে কণ্ঠে স্বত উৎসারিত।

এই জন্যই সংসারের কাছে কবির শেষ-প্রার্থনা—

হে সংসার,
আমাকে বারেক ফিরে চাও ; পশ্চিমে যাবার মুখে
বর্জন কোরো না মোরে উপেক্ষিত ভিক্ষুকের মত।
জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি ;…

জীবনের পাত্র রিক্ত করিয়া মুক্তি নয়—সংসারের অজস্র দাক্ষিণ্যে তাহাকে যত পূর্ণ করিয়া তোলা যায় ততই হইল কবির মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথের এই যে মুক্তির বাসনা ইহা হইতে সর্বত্রই মানুষ একেবারে বাদ পড়িয়া গিয়াছে তাহা বলিব না ; বিশ্বপ্রকৃতি অনেক স্থলে মুখ্য হইয়া উঠিলেও অনেকস্থলে কবি যেখানে বিশ্বধারার কথা বলিয়াছেন, মানুষের জীবনধারা তাহার মধ্যেই বিধৃত ; কবি যেখানে যেখানে বিশ্বসংসারের কথা বলিয়াছেন সেখানে তিনি মানুষের সুখদুঃখময় জীবনধারাকে লইয়াই সংসারের কথা বলিয়াছেন। কবি নটরাজের নৃত্যের কথা যেখানে বলিয়াছেন সেখানে সে নৃত্য ত শুধু বহিঃপ্রকৃতিতে নয়—জগৎ ও জীবন উভয় জুড়িয়া এই নৃত্য। তথাপি এ-কথা মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ মানুষকে যেরূপ সৃষ্টিপ্রবাহে উদ্ভূত শ্রেষ্ঠধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, মুক্তির এই সকল বর্ণনার মধ্যে মানুষ তাহার সেই শ্রেষ্ঠধনের মূল্য লাভ করে নাই। কিন্তু কবির শেষ-যুগের লেখার মধ্যে মুক্তি-চিন্তাকে মানুষের দিকেই কেন্দ্রীভূত করিয়া দেখিতে পাই। সেখানে শুধু গানের সুরের সাহায্যে যোগের পন্থাই একমাত্র বা প্রধান হইয়া দেখা দেয় নাই, সেখানে কর্মযোগে ঘর্ম ঝরিয়া পড়িবার কথা দেখা দিয়াছে। মানুষকে ত্যাগ করিয়া—সংসারের সকল প্রেমবন্ধনকে ত্যাগ করিয়া দেবতাকে যে লাভ করা যায় না, 'সোনার তরী'র কয়েকটি কবিতার মধ্যেই সে-কথা সুন্দরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। 'লক্ষ কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা'—মায়াবাদীর দল বিজ্ঞ সাজিয়া ইহাকে 'ছেলেখেলা' বলিয়াছেন, কবি এই উপহাসের

স্পর্ধার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করিয়াছেন। 'গতি' কবিতায় তিনি বলিয়াছেন, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তিনি সুখদুঃখময় 'বিশ্বব্যাপী কর্মশৃঙ্খলা'র রহস্যভেদ করিতে চাহে না—

চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।

'মুক্তি' কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

চক্ষু কর্ণ বুদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি
বিমুখ হইয়া সর্ব জগতের পানে,
শুদ্ধ আপনার ক্ষুদ্র আত্মাটিরে ধরি
মুক্তি-আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে!
পার্শ্ব দিয়ে ভেসে যাবে বিশ্বমহাতরী
অম্বর আকুল করি যাত্রীদের গানে,
শুভ্র কিরণের পালে দশ দিক্ ভরি',
বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ অসংখ্য পরানে।
ধীরে ধীরে চলে যাবে দূর হতে দূরে
অখিল ক্রন্দন-হাসি আঁধার-আলোক,
বহে যাবে শূন্যপথে সকরুণ সুরে
অনন্ত জগৎভরা যত দুঃখ শোক।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে?

'আত্মসমর্পণ' কবিতায় দেখিতে পাই—

জন্মেছি যে মর্ত্য-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে

'চৈতালী'র 'বৈরাগ্য' কবিতাটি এই একই সুরে বাঁধা। গভীর রাত্রে সংসারে বিরাগী 'ইষ্টদেব লাগি', মায়ার ছলনা স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া, যখন বাহিরে যাত্রা করিলেন তখন—

দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন 'হায়
আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায় ॥'

ইহা মানুষ সম্বন্ধে কবির একটি গভীর ভাবদৃষ্টিই ব্যঞ্জিত করে। 'কথা ও কাহিনী'র ভিতরকার 'দীন-দান' কবিতাটির মধ্যে যখন ভক্তের মুখে দেবতার জন্য স্বর্ণমন্দির নির্মাণকারী রাজার প্রতি নির্ভীক বাণী দেখিতে পাই—

সেদিন কহিলা ভগবান—
'আমার অনাদি ঘরে অগণ্য আলোক দীপ্যমান
অনন্ত নীলিমা মাঝে ; মোর ঘরে ভিত্তি চিরন্তন
সত্য, শান্তি, দয়া, প্রেম ; দীনশক্তি যে ক্ষুদ্র কৃপণ
নাহি পারে গৃহ দিতে গৃহহীন নিজ প্রজাগণে
সে আমারে গৃহ করে দান !' চলি গেলা সেইক্ষণে
পথপ্রান্তে তরুতলে দীন-সাথে দীনের আশ্রয়।

তখনও বুঝিতে পারি, ইহা ঘটনার বর্ণনাপ্রসঙ্গে উচ্চারিত বাণী নহে, ইহা রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রবাহিত একটি গভীর ভাবধারারই অভিব্যক্তি। মানব-সেবা অধ্যাত্ম-সাধনার অঙ্গমাত্র নয়, মানব-সেবাই যে অধ্যাত্ম-সাধনা সেই সত্যটিই এখানে বাণী-মূর্তি লাভ করিতে চাহিয়াছে। এই বোধেরই একটি ঘনীভূত এবং স্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাই 'গীতাঞ্জলি'র সেই প্রসিদ্ধ কবিতায়—

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধুলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে ;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয়রে ধুলার 'পরে।

কর্মযোগের ভিতর দিয়া মানবতাবোধ যতই কবির নিকটে বাস্তব জীবনে সত্য হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই তাঁহার মুক্তির আদর্শও এই মানবতাবোধের দ্বারা প্রভাবিত হইতে লাগিল। আমরা রবীন্দ্রনাথের মানবতা-বোধের বিকাশধারা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই, মানুষ তাহার অপূর্ণতা সম্বন্ধে যত সচেতন হয় ততই তাহার মধ্যে একটি পূর্ণতার আদর্শ গড়িয়া উঠিতে থাকে; মহামানবতাকে লইয়া যে পূর্ণতার আদর্শ ইহাই মানুষের মহৎ জীবন-প্রেরণা, সকল সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতি ওঠা-পড়াকে অতিক্রম করিয়া এই জীবন-প্রেরণা মানুষকে ভবিষ্যতের দিকে টানিয়া লয়। এই মহামানবতার পূর্ণতার মধ্যেই হইল মানুষের মহামুক্তি। 'পরিশেষে'র 'অপূর্ণ' কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

অপূর্ণতা আপনার বেদনায়
পূর্ণের আশ্বাস যদি নাহি পায়,
তবে রাত্রি দিন হেন
আপনার সাথে তার এত দ্বন্দ্ব কেন।
ক্ষুদ্র বীজ মৃত্তিকার সাথে যুঝি
অঙ্কুরি উঠিতে চাহে আলোকের মাঝে মুক্তি খুঁজি।
সে-মুক্তি না যদি সত্য হয়
অন্ধ মূক দুঃখে তার হবে কি অনন্ত পরাজয়।

মহামানবতার পূর্ণতার আদর্শের মধ্যেই যে মানুষের মহামুক্তি রবীন্দ্রনাথের মনে এ-বাণী দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল কবির হিবার্ট বক্তৃতামালা *The Religion of Man* ভাষণে, আর, কমলা-বক্তৃতামালা 'মানুষের ধর্ম' ভাষণে। সেই মহামানবকে নিজের মননের দ্বারা ও সৃষ্টির দ্বারা নিরন্তর জাগ্রত করিয়া তোলা—ব্যক্তিজীবনের মহৎ-যাপন-প্রথা দ্বারা শাশ্বত মানুষের ভিতরকার এই মহামানবতাকে জাগ্রত বিকশিত করিয়া দেওয়া—নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা এই মহামানবের সহিত নিজেকে

নিবিড়ভাবে যুক্ত করিয়া লওয়া—ইহাই যে মানুষের মুক্তি—এ-কথা এই দুইটি ভাষণের মধ্যেই বারবার দৃঢ়প্রত্যয়ে উচ্চারিত হইয়াছে। মানব-সেবা যে শুধু মানব-সেবা নয়,—মানব-সেবার মধ্যেই যে নিহিত মানুষের মহৎ অধ্যাত্ম-সাধনা কবির এই মুক্তির আদর্শ মানুষের মনে নূতন আশা ও শক্তির সঞ্চার করিয়াছে। মানব-মুক্তির এই আদর্শের দ্বারা কবি বিশ্বমানবের মধ্যে আজ অকুণ্ঠভাবে স্বীকৃত।

কবির এই যে মুক্তির আদর্শ ইহাকে কবি নানা প্রসঙ্গে উপনিষদের সঙ্গে নানাভাবে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যেখানে যেটুকু মিল আমরা আবিষ্কার করিতে পারি না কেন তাহার সব সত্ত্বেও সৌন্দর্য ও প্রেমের মিলনে এই যে মুক্তির আদর্শ ইহা কবি-জীবনে উপনিষদেরই বিশেষ কোন বাণী বা ভাবধারারই একটা বিস্তারমাত্র এ কথা মনে করিলে আমরা ভুল করিব। এ-আদর্শ অনেকখানিই হইল রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব আদর্শ। তিনি কবি; জগৎ এবং জীবনের প্রতি তাঁহার অত্যন্তাসক্তি তাঁহার প্রকৃতিগত ধর্ম; আমার সীমাকে অতিক্রম করিয়া অসীমের প্রতি—অল্পকে তুচ্ছ করিয়া ভূমার প্রতি—তাঁহার যে আকর্ষণ ইহাকে তাঁহার একেবারে সহজাত প্রবৃত্তি বলিয়াই গ্রহণ করা যাইতে পারে। কবি একটা সহজ পন্থায় নিজের মধ্যে এই দুইকে মিলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন—আজন্মের সেই চেষ্টাতেই বিবর্তিত কবির এই মুক্তির বাণী।

উপনিষদের মধ্যে মোহমুক্ত আবরণমুক্ত চিত্তে প্রকৃতির ভিতরেই সত্যের স্পর্শলাভ করিবার কথা কোথাও আমরা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই—কোথাও আমরা আভাসে ইঙ্গিতে দেখিতে পাই। পরম সত্যের সহিত তাদাত্ম্যের দ্বারা সর্বভূতের সহিত নিজেকে এক করিয়া লইবার কথাও আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু সত্যের যে প্রকাশের রূপটা, শুধু তাহার ভিতর দিয়াই পরম সত্যকে ধরিতে

এবং তাহার সঙ্গে যুক্ত হইতে হইবে এ-কথা উপনিষদের নহে, রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের বাণীর মধ্যে যেখানে এইজাতীয় কোনও একটু আভাস পাইয়াছেন, সেইখানেই নিজের জীবনবাণীর সমর্থন খুঁজিবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিজের জীবন-প্রেরণাকে উপনিষদের বাণীর মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া তাহাকে নূতন অর্থে বা ব্যঞ্জনায় গড়িয়া লইয়াছেন।

উপনিষদের ভিতরকার পরম এককে অনেক দার্শনিকই নেতিমার্গে গ্রহণ করিয়াছেন; যাঁহারা এরূপ করিয়াছেন তাঁহারা উপনিষদ্‌কে ঠিক ঠিক ভাবে গ্রহণ করিবার আগ্রহেই এরূপ করিয়াছেন তাহা বলিব না, তাঁহারা নিজেদের বিশ্বাস এবং যুক্তি দ্বারা ধৃত বিশেষ একটি মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই উপনিষদ্‌কে সম্পূর্ণ নেতিমার্গে গ্রহণ করিয়া পরম সত্যকে চিরনিশ্চল করিয়া রাখিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের আবার সবখানি মানসিক প্রবণতা পরম সত্যকে নটরাজ রূপ দান করিয়া তাহাকে চিরচঞ্চল করিয়া তোলা, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ আবার উপনিষদের মধ্যে খুঁজিয়া পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এই চিরচঞ্চলের রূপ; 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'কে যতটা পারেন এই চিরচঞ্চল নটরাজ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এ-পথে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের সঙ্গে খুব বেশিদূর চলিতে পারেন নাই; এই 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'কে চিরচঞ্চল নটরাজ করিয়া তুলিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব লাভের চেষ্টা অনেকখানি রবীন্দ্রনাথকে নিজের পথেই করিতে হইয়াছে।

১২

ধর্মচিন্তায় ও ধর্মানুভূতিতে এইবারে রবীন্দ্র-মানসের আর একটি মৌলিক স্বাতন্ত্র্যের কথায় আসিতেছি। রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কবি-জীবনে এই স্বাতন্ত্র্যের ইতিহাস অতি বিচিত্র। আমরা আমাদের

পরবর্তী সব আলোচনার ভিতর দিয়াই এই বিচিত্র ধারার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিব।

সত্যানুভূতির ক্ষেত্রে উপনিষদের সহিত রবীন্দ্রনাথের গভীর মিল একটি সর্বাত্মক অদ্বয়বোধে; কিন্তু এ-ক্ষেত্রে আবার রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য অদ্বয়বোধের মধ্যেই একটি সুস্পষ্ট দ্বয়বোধে। তাঁহার এই দ্বৈতবোধ কোথাওই তাঁহার অদ্বৈতবোধের পরিপন্থী হইয়া দেখা দেয় নাই—কারণ দ্বয়ের যাত্রা শুরুও হইয়াছে অদ্বয় হইতে—দ্বয়ের পর্যবসানের আদর্শও অদ্বয়ের মধ্যে—আবার দ্বয়রূপে যাহা কিছু অবস্থিত তাহার সকল অর্থ—সকল মূল্যও নিহিত এক অদ্বয়ের মধ্যে। দ্বয়ের কখন্ যে কি করিয়া অদ্বয় হইতে যাত্রা শুরু হইল—কখন্ কিভাবে যে আবার অদ্বয়ের মধ্যে তাহার পর্যবসান হইবে এ-সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করিয়া কথা বলেন নাই; এ-সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট করিয়া কথা বলিবার দায়ও রবীন্দ্রনাথের নহে। তিনি দার্শনিকের ন্যায় প্রতিপাদ্য নির্দেশ করিয়া সিদ্ধান্ত অভিমুখে তথ্য-তর্কের সমাবেশ করিতে বসেন নাই, তিনি কবি—জীবনব্যাপী অনুভূতিই তাঁহার তথ্য—সেই অনুভূতিই তাঁহার একমাত্র যুক্তি। কখনও তিনি অনুভব করিয়াছেন—

যাত্রী আমি ওরে—
বাহির হলেম না জানি কোন্ ভোরে।

যেদিন প্রথম ভোরে যাত্রা করিলেন সেদিন সেই প্রথম যাত্রাক্ষণে—

নিমেষহারা শুধু একটি আঁখি
জেগেছিল অন্ধকারের পরে।

এই অন্ধকার হইল প্রাক্‌সৃষ্টির একের মধ্যে সর্ববিলীনতার অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে অব্যক্ত হইতে ব্যক্তের প্রথম যাত্রাক্ষণে যে নিমেষহারা আঁখিটি জাগিয়াছিল এবং পরম-ঔৎসুক্যে লক্ষ্য

করিতেছিল 'ব্যক্তি'র জীবনপ্রবাহে যাত্রা—সে আঁখিটি হইল অদ্বয় 'একে'র। এখানে কবির বিশ্বাস—

যাত্রী আমি ওরে—
কোন্ দিনান্তে পৌঁছাব কোন্ ঘরে।

'ব্যক্তি'কে কবি অনন্তপথের যাত্রী বলিয়াই বর্ণনা করিলেও একটা গোপন আশ্বাস লক্ষ্য করিতে পারি—'কোন্ দিনান্তে পৌঁছাব কোন্ ঘরে'। 'কোন্ দিনান্তে' তাহাও ঠিক জানেন না, 'কোন্ ঘরে' তাহাও ঠিক জানেন না,—তবু যেন মর্মের গভীরে একটা 'পৌঁছিবার' আশ্বাস ; এবং যেদিন পৌঁছানো যাইবে সেদিন দেখা যাইবে—

কে গো সেথায় স্নিগ্ধ দু-নয়ানে
অনাদিকাল চাহে আমার তরে।

প্রথম যাত্রাক্ষণে যে-আঁখি নিমেষহারা চাহিয়াছিল তাহাও যে অদ্বয় 'একে'র আঁখি, পৌঁছিবার দিনের জন্য অনাদিকাল স্নিগ্ধ দু'নয়নে যে এই 'ব্যক্তি'র জন্য তাকাইয়া আছে সেও সেই অদ্বয় 'এক'ই। কখনও আবার কবির অনুভূতি চলিয়াছে অন্য পথে—অদ্বয়ের ভিতরে এই দ্বয়ের লীলা—পরম একের সহিত অনন্ত 'ব্যক্তি'র যে লীলা—সে যেন অনাদি অনন্ত—সে লীলা তাই আত্মরতির নিত্যলীলা।

এই দ্বয়বোধের মধ্যেই লুক্কায়িত ব্যক্ত জগৎ এবং ব্যক্ত জীবনের সকল তাৎপর্য এবং মহিমা। রবীন্দ্রনাথ কবি—জন্মক্ষণ হইতে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্তই তিনি কবি ; কবিরূপে মনে-প্রাণে তিনি ভালোবাসিয়াছেন এই জগৎকে—এই জীবনকে, বিশ্বপ্রকৃতিকে আর মানুষকে। জগদতীত এবং মানবাতীতের কথা তিনি যে বার বার এতরকম করিয়া বলিয়াছেন তাহার মুখ্য কারণ, যে-জগৎকে যে-মানুষকে এত করিয়া ভালোবাসিয়াছেন সেই ভালোবাসার সত্যমূল্য চাই ; ভালো-

বাসার সত্যমূল্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না যদি যাহাকে ভালোবাসি তাহার সত্যমূল্য খুঁজিয়া না পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে নিরন্তর তাই তাগিদ—জগতের মূল্য—মানুষের মূল্য খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, মিথ্যাকে ভালোবাসিয়া আমার এত ভালোবাসা যেন মিথ্যা না হইয়া যায়। অদ্বয় এককে কেবলই আবিষ্কার করিতে হইয়াছে—অনুভব করিতে হইয়াছে এই দ্বয়ের জগৎ—এই দ্বয়ের মানুষ—ইহার সত্যমূল্য লাভ করিবার জন্য—সকল দ্বয়ের প্রতিভূ আমার মধ্যে যে 'আমি' সেই আমি বা বিশেষ 'ব্যক্তি'র মূল্য লাভ করিবার জন্য। জীবন ভরিয়া তাই কেবল উপলব্ধির চেষ্টা, উপরের তলায় এই যে অজস্র ব্যক্তি—অনন্ত প্রকাশ,—সে 'আনন্দরূপম্'—ভালো-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, সুখ-দুঃখ—সকলের ভিতর দিয়াই 'আনন্দরূপম্'। কিন্তু এই 'আনন্দরূপম্'-এর জন্য যখন এমন অত্যাসক্তি তখন অতি স্বাভাবিকভাবেই ভিতর হইতে আর একটি তাগিদ; এই 'আনন্দরূপম্'ই যে 'অমৃতম্' সেই কথাটির আশ্বাস না পাইলে মন কোথায় লাভ করিবে তাহার প্রতিষ্ঠা? যাহা 'আনন্দরূপম্' তাহা যদি 'অমৃতম্' না হইবে—তাহার ভিতরে কোথাও যদি একটা মৃত্যুর অতীত শাশ্বত সত্য না থাকিবে তবে সব কিছুই যে একটা অসহ্য ফাঁকি। অতএব অনুভব করা চাই, এই যে 'আনন্দরূপম্' সে 'অমৃতম্' হইয়া উঠিয়াছে এই কারণে যে, এই চিরচঞ্চল 'আনন্দরূপম্' যে ব্যক্তি বা প্রকাশ তাহার নীচে স্থির হইয়া আছে 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'। ঐ 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'-এর উপরেই হইল সকল 'আনন্দরূপম্'-এর শাশ্বত প্রতিষ্ঠা।

কবি তাঁহার ব্যক্তি-সত্তাকে যেখানেই খুব গভীর করিয়া অনুভব করিলেন সেখানেই অনুভব করিলেন, ব্যক্তি-সত্তা ঘনীভূত হইয়া দেখা দিতেছে একটি 'আমি'র মধ্যে। কবি আরও অনুভব করিলেন, এই আমি ত শুধু আমার ভিতরকার আমি নই, বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে এই 'আমি'ই হইলাম সকল 'আনন্দরূপম্ অমৃতম্'-এর প্রতিভূ;

কবি তখন খুঁজিয়া পাইলেন নীচেকার 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্'-এর ভিতরে একটি 'তুমি'কে ; এই 'আমি' ও 'তুমি'র আনন্দলীলার মধ্যেই নিহিত বিশ্বসৃষ্টির সকল তাৎপর্য। একদিকে 'যদ্ বিভাতি' যাহা কিছু বহুরূপে প্রকাশ পাইতেছে ; একের সেই বহিঃপ্রকাশই 'আমি' ; এমনই করিয়া আনন্দরূপ গ্রহণ করিয়া প্রকাশ পাইতেছি যে 'আমি' সেই 'আমি'র সকল সত্য আবার শান্ত অদ্বৈতের সহিত আনন্দযোগে ; এই আনন্দযোগটাই হইল লীলা-রহস্য।

রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসের মধ্যে এই যে আমরা অদ্বৈতের মধ্যে একটা দ্বৈতবোধ দেখিতে পাইতেছি, ইহা ভারতীয় চিন্তা বা উপলব্ধির ক্ষেত্রে কিছু অভিনব নহে। সকল সম্প্রদায়ের দ্বৈতবাদী বেদান্তিগণ নানা ভাবে এই মতকেই স্বীকার করিয়াছেন। রামানুজ জগৎ এবং জীব বা অচিৎ এবং চিৎকে ব্রহ্মের বিলাসবিভূতি বলিয়াছেন এবং এই অর্থে তিনি জগৎ এবং জীবের পৃথক্ সত্য স্বীকার করিয়াছেন। অন্যান্য দ্বৈতবাদিগণও জীবকে নিত্য 'চিৎকণ' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, চিৎকণরূপে পরম ভগবদ্-ধামেও জীব তাহার নিত্য পৃথক্ সত্তা রক্ষা করিয়া নিত্য ভগবৎ-সান্নিধ্য ও ভগবৎ-প্রেম আস্বাদন করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দ্বৈতবোধ এই সকল দ্বৈতবাদিগণের দ্বৈতবোধ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। কি করিয়া পৃথক্ সে-কথা আমাদের পরবর্তী আলোচনার ভিতর দিয়া রবীন্দ্রনাথের অনুভূত 'তুমি' ও 'আমি'র পরিচয় লাভ করিলেই আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। এখানে সংক্ষেপে এই পার্থক্যের মূল কথাটার প্রতি ইঙ্গিত করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথের 'তুমি'র ধারণাও কোনও একটি স্থৈতিক (static) পরম সত্যের ধারণা নয়, 'আমি'র ধারণাও কোনও স্থৈতিক ধারণা নয়। 'আমি'ও নিত্যপ্রবাহে নিত্য নূতন করিয়া হইয়া উঠিয়া একটি চিরপ্রসার্যমান ব্যক্তিসত্য লাভ করিতেছে ; আবার এই চিরবিকাশমান 'আমি'র যোগে 'তুমি'ও নিত্যকালে সত্য হইয়া উঠিতেছে। আমরা পরে লক্ষ্য করিতে

পারিব, এ-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের যে চিত্তপ্রবণতা তাহা ভারতবর্ষের দ্বৈতাদ্বৈতবাদী সাধকগণের সঙ্গে খানিকটা মিল সত্ত্বেও পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল এবং হেগেলীয়গণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। যাহা মূলে নিহিত 'ভাবে'র (idea) মধ্যে তাহাই দেশ-কালে ব্যক্তীকৃত 'ভবে'র (existence) মধ্যে; এই 'ভাব' এবং 'ভব' ইহার মধ্যে কোথাও মুহূর্তের ছাড়াছাড়ি নাই; উভয়ের যোগেই উভয়ে সত্য— উভয়ের ভিতর দিয়াই পরমসত্যের নিরন্তর হইয়া উঠিবার লীলা।

উপনিষদের মধ্যে ব্রহ্মের দুইটি রূপের কথা বলা হইয়াছে,—দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তং চ মর্ত্যং চামর্ত্যং চ স্থিতং চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ। একটি হইল মূর্তরূপ একটি হইল অমূর্ত, একটি হইল মর্ত্য (মরণশীল পরিবর্তনশীল) রূপ অপরটি হইল অমর্ত্য, একটি হইল স্থিতরূপ অপরটি হইল গমনশীল রূপ, একটি হইল সৎরূপ (ব্যক্তরূপ) অপরটি হইল 'ত্যৎ'রূপ বা অব্যক্ত রূপ। [বৃহদারণ্যক, ২।৩।১]। ঈশ উপনিষদের ভিতরে যেখানে বলা হইয়াছে, 'তদ্ এজতি তন্নৈজতি'—তাহা চলে আবার তাহা চলে না—তখনও ব্রহ্মের এই দুই রূপের কথাই বলা হইয়াছে। একদিকে সত্য নির্বিশেষ এক (Absolute), অন্যদিকে পরম সত্য হইল পরম পুরুষ (Person)। রবীন্দ্রনাথ পরম সত্যের এই দুই রূপকে স্বীকার করিলেও তিনি উপাসক ছিলেন এই পরম পুরুষের—যিনি 'পুরুষম্ মহান্তম্' —যিনি অকায় অব্রণ অস্নাবির শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ হইয়াও যথাতথ্যতঃ (যথাযথরূপে) নিত্যকালে বিধান করিতেছেন, যিনি এক অবর্ণ হইয়াও নিহিতার্থ (নিহিত হইয়াছে সকল অর্থ যাঁহাতে)—তাই বহুধা শক্তিযোগে অনেক বর্ণের বিধান করিতেছেন, যিনি শান্ত অদ্বৈত হইয়াও আনন্দরূপে অমৃতরূপে বিশেষ প্রকাশ লাভ করিতেছেন। সেই পরম সত্য পরম পুরুষ বলিয়াই 'আমি পুরুষে'র সহিত সেই 'পরম পুরুষে'র নিত্যসম্বন্ধ, এবং সেই 'আমি'র সহিত নিত্যসম্বন্ধেই সেই পরমপুরুষও রবীন্দ্রনাথের নিকটে নিত্য 'তুমি'

বলিয়াই ধরা দিয়াছেন। এই পরমপুরুষ এই 'আমি'টিকে বাদ দিয়া আপনাতে আপনি পূর্ণ ই নন,—'আমি'র যোগেই তাঁহার পূর্ণতা—যেমন পূর্ণতা সুরের যোগে সঙ্গীতের। সুর ছাড়া—গানের মধ্যে বিকাশ ছাড়া—সঙ্গীতের বিশুদ্ধ আপনাতে আপনি সমাহিত কোনও রূপ নাই সত্য নাই। সুরের মধ্যে সে যতখানি আপনাকে নিঃশেষে ছড়াইয়া দেয় সঙ্গীত ততখানি সত্য হইয়া ওঠে। 'আমি'টি হইলাম সেইরূপ সুরের বিস্তার—আমির বিস্তারেই 'তুমি'র বিস্তার—আমির সত্যেই 'তুমি'র সত্য। এই কথাই বলিয়াছেন কবি তাঁহার *Personality*-র ভিতরকার একটি ভাষণে—

The infinite and the finite are one as song and singing are one. The singing is incomplete; by a continual process of death it gives up the song which is complete. The absolute infinite is like a music which is devoid of all definite tunes and therefore meaningless.

The absolute eternal is timelessness, and that has no meaning at all,—it is merely a word. The reality of the eternal is there, where it contains all times in itself. [পৃঃ ৫৭]

নির্বিশেষ পরম যেন রাগ-রাগিণীহীন সুরহীন একটি সঙ্গীত—সে-জাতীয় নির্বিশেষ সত্য একটি অর্থহীন সত্য। আমরা যে পরম সত্যকে নিত্য বলি সেই নিত্যত্বেরই বা অর্থ কি? সে নিত্য যদি কালহীন নিত্য হয়—তবে সে নিত্য ত অর্থহীন নিত্য—একটা শব্দমাত্রে পর্যবসিত নিত্য; নিত্য সত্য হইয়া ওঠে সেখানেই যেখানে নিত্য সর্বকালকে আপনার ভিতরে ধারণ করিয়া আছে।

তাহা হইলে দেখিতেছি, রবীন্দ্রনাথের উপাস্য যিনি পরমপুরুষ তিনি দেশহীন কালহীন সর্বহীন সত্য নন, তিনি নিরন্তর আত্ম-প্রকাশের ভিতর দিয়াই পরম সত্য। এইখানেই হেগেলের সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুরের ঘনিষ্ঠ মিল দেখিতেছি। হেগেলও যে পরম দেবতার কথা বলিয়াছেন তিনি সৃষ্টিপ্রবাহ হইতে বিমুক্ত

কোনও স্বয়ংসম্পূর্ণ দেবতা কখনই নহেন; তিনি কখনও হইয়া বসিয়া নাই, তিনি সর্বদাই বিশ্বপ্রবাহের মধ্য দিয়া হইয়া উঠিতেছেন। একদিকে রহিয়াছে নিত্যকালের 'ভাব', অপরদিকে সেই 'ভাবে'র 'ভব' বা অস্তিত্ব-প্রবাহ বিশ্বমূর্তিতে; এই 'ভাব' এবং 'ভবে'র ভিতর দিয়া পরম সত্য কেবলই পরম হইয়া উঠিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ও সঙ্গীতে এই 'ভাবে'র অংশটা লইয়াই নানা ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে 'তুমি', 'ভব'-প্রবাহের চরম মূর্তি 'আমি'র মধ্যে।

এই যে একটি 'তুমি-আমি'র ভাবদৃষ্টি—অদ্বয়ের মধ্যে একটা দ্বয়বোধ লইয়াই যে একটা লীলাবোধ এবং তাহাকে লইয়া একটা প্রেম-ভক্তির সুর ইহা আমরা সমস্ত ব্রাহ্মধর্মের মধ্যেই লক্ষ্য করিতে পারি। ব্রাহ্মধর্ম নিরাকারের উপাসনার কথা বলিল বটে, কিন্তু সে নিরাকার সর্বশূন্য নিরাকার নহেন; ব্রহ্মে নরত্বারোপের প্রবণতা লইয়া রূপকল্পনায় বাধা দিয়া প্রাধান্য দেওয়া হইল তাঁহার বিশ্বরূপের বা বিশ্বমূর্তির। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠার মধ্যেই লীলার্থ-কল্পিত একটি 'তুমি-আমি'র ভাব দেখিতে পাই; এই 'তুমি-আমি'কে অবলম্বন করিয়া যে প্রেম-ভক্তির সুর রবীন্দ্রনাথের গানে জাগিয়া উঠিয়াছে ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে তাহার প্রস্তুতি ছিল এ-কথা অস্বীকার করিতে পারি না। পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার এই চিত্ত-প্রবণতার মধ্যে কবি-অনুভূতি ও ধর্মানুভূতির যে অপরিচ্ছেদ্য যোগ আবিষ্কার করিতে পারিলেন সেই যোগের সঙ্গে গভীর মিল অনুভব করিতে পারিলেন বাঙলার বাউল গানের এবং উত্তর মধ্য ও পশ্চিম ভারতের সন্ত-সম্প্রদায়ের গানের মধ্যে। বাউলগণ অভেদের সাধক —আবার প্রেমে পাগল—যিনি অভেদ তাঁহার মানস-সরোবরের মধ্যেই প্রত্যেক ব্যক্তিজীবনের একটি হৃদয়-কমল ফুটিয়া উঠিতেছে; বাউল বলিতেছেন—

হৃদয়-কমল চল্‌তেছে ফুটি
কত যুগ ধরি'।

তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা
উপায় কি করি।

অদ্বয়ের মানস-সরোবরে একটি একটি করিয়া 'ব্যক্তি'র হৃদয়কমল ফুটিয়া উঠিতেছে; 'ব্যক্তি'র সেই বিশেষ প্রকাশের মধ্যেই বাঁধা পড়িয়াছে পরমপুরুষও—ব্যক্তিপুরুষও। উভয়ের মিলন-বিরহ সব কিছু এই কমলের বিকাশকে অবলম্বন করিয়া। আবার প্রত্যেক ব্যক্তি-কমল লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে বিশ্বকমল—পরমগুরু সাঁই বসিয়া বসিয়া যুগ-যুগান্তে এই বিশ্বকমল ফুটাইয়া তুলিতেছেন; বিশ্বকমলও ফুটাইয়া তুলিতেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সকল ঐশ্বর্যে মাধুর্যে সৌন্দর্যে প্রেমে নিজেও বিকশিত হইতেছেন—আত্মচৈতন্যের দ্বারা আত্মসত্যে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন।

কবীর দাদূ প্রভৃতি সাধক-সম্প্রদায়ের সহিত রবীন্দ্রনাথের এই-জাতীয় মনোভাবের স্থানে স্থানে আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করিতে পারি। এইজন্য পরিণতবয়সে পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের এই সাধক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে কবির যখন পরিচয় হইল তখন তিনি যেন বহুমূল্য সম্পদ্ লাভ করিলেন। সাধক কবি দাদূর একটি কবিতায় পাই—

ব্রাস কহৈ হৌঁ ফুল কো পাউঁ ফুল কহৈ হৌঁ ব্রাস।
ভাস কহৈ হৌঁ ভাব্র কো পাউঁ ভাব্র কহৈ হৌঁ ভাস॥
রূপ কহৈ হৌঁ সত কো পাউঁ সত কহৈ হৌঁ রূপ।
আপস মে দউ পুজন চাহৈ পুজা অগাধ অনূপ॥

কবিতাটি বাঙলায় অনুবাদ করিলে দাঁড়ায় এই—

গন্ধ কহিছে, আমি পেতে চাই ফুল,
ফুল কহে আমি পেতে চাই শুধু বাস,
প্রকাশ কহিছে, ভাবকেই যেন পাই,—
ভাব কহে আমি পেতে চাই পরকাশ।

রূপ কহে আমি সত্যেরে পেতে চাই—
সত্য কহিছে, আমি পেতে চাই রূপ ;
আপসে দু'জনে চাহে দু'জনার পূজা—
এ দু'য়ের পূজা অগাধ ও অপরূপ !

ইহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'উৎসর্গে'র অতি প্রসিদ্ধ কবিতা—

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে স্বজনে না জানি এ কার যুক্তি,
ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা।
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

ইহার আশ্চর্য মিল লক্ষিত হইবে। এ মিল প্রভাবজনিত মিল নয়, এ মিল সাধর্ম্যগত মিল। এই সাধর্ম্যগত মিল যে কত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে দাদূর আর একটি গানের মধ্যে তাহার পরিচয় পাই। দাদূ বলিতেছেন—

সেব্রক সাঈঁকা ভয়া তব সেব্রক কা সব কোই।
সেব্রক সাঈঁকা মিলা সাঈঁ সরীখা হোই ॥

সেবক যখন স্বামীর হইয়া যাইতে পারিল তখন সব কিছুই সেবকের হইয়া গেল ; অর্থাৎ স্বামীর সঙ্গে যোগেই হইল সেবকের সকল ঐশ্বর্য ও মহিমা। সেবক আর স্বামীর এই যে মিলন এই মিলনের মধ্যে একে দেখা দিল অপরের 'সরিক' হইয়া। এই কথাতেই

রবীন্দ্রনাথেরও মনের গভীর সায়। ভক্তরূপে দাদূ যাঁহাদিগকে বলিয়াছেন স্বামী ও সেবক, কবিরূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে অমনভাবে স্পষ্ট ধর্ম-গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ না করিয়া গ্রহণ করিলেন 'তুমি' ও 'আমি' করিয়া। এই 'আমি'র সব সত্য নিহিত 'তুমি'র মধ্যে এ-কথা যেমনতর সত্য, আবার 'আমি' যে 'তুমি'র সরিক—পরম সত্যের ক্ষেত্রে 'আমি' যে 'তুমি'র সঙ্গে সমান অংশীদার, 'আমি' না হইলে 'তুমি' যে একেবারে অর্থহীন শূন্য হইয়া যাইত—এ-কথাটাও তেমনতরই সত্য। এইখানেই কবির পরম মূল্যবোধ—পরম আত্মানুভূতির আনন্দ—পরম গর্ব।

১৩

কিন্তু এই 'আমি'কে লইয়া প্রথমেই প্রকাণ্ড একটা খট্‌কা লাগিবার কথা। আমরা দেখিতে পাই, রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা-গান ভাষণ-প্রবন্ধ রহিয়াছে যেখানে তিনি নানা ভাবে এই 'আমি'র হাত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়াছেন। বার বার করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তিনি বলিয়াছেন, এই আমির সীমা ঘুচিয়া না গেলে আমার ভিতরকার যে সত্যরূপ তাহাকেও আমি প্রত্যক্ষ করিতে পারি না, বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্নিহিত যে পরম সত্য তাহার স্পর্শও আমরা লাভ করিতে পারি না। 'আমি'র অহঙ্কারকে কবি কোথাও মলিন বস্ত্র বলিয়াছেন, কোথাও আত্মার আবরণ বলিয়াছেন, কোথাও সত্যের মুখের উপরে ঢাকা-দেওয়া হিরণ্ময়-পাত্র বলিয়াছেন। এই আবরণকে দূরে সরাইয়া ফেলিয়াই যে নিজের ভিতরকার সত্য এবং বিশ্ব-জীবনের ভিতরকার সত্যের পরিচয় লাভ করিতে হইবে এ-কথা ত কবি গানে কবিতায় ভাষণে অসংখ্যবার স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ যে আবরণ সত্যকে গ্রহণ করিতে সর্বদা বাধা দিতেছে সেই আমির আবরণকে দূরে সরাইয়া ফেলাই ত কবির মুক্তি-সাধনার

প্রধান অঙ্গ হইয়া দেখা দিয়াছে। তবে আবার 'আমি'র এতখানি মহিমা কেন? ইহা কি কবিচিত্তে পরস্পরবিরোধী দুইটি ভাবধারা?

কবি-মানসে এখানে সত্যকার কোনও বিরোধ নাই। যে আমিকে কবি আবরণ বলিয়াছেন—সত্যোপলব্ধির বাধাস্বরূপ বলিয়াছেন, সে আমি—কোন্ আমি? সে আমি হইল দেশ-কাল-পাত্রে বিশেষভাবে অবচ্ছিন্ন আমি—প্রাত্যহিকতার আবরণের দ্বারা প্রতিমুহূর্তের মধ্যে খণ্ডিত আমি। এ-আমির সর্বরতি জৈব অস্তিত্বের আস্বাদনের দিকেই কেন্দ্রীভূত—সুতরাং জৈব প্রয়োজনের জালে এ-আমি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। এই 'আমি'কে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন আমাদের ভিতরকার 'ছোট আমি'; কিন্তু আমাদের মধ্যে আর একটি আমি রহিয়াছে সে 'অত্যন্ত বড়ো'। 'শান্তিনিকেতনে' 'জাগরণ' নামক ভাষণটিতে কবি বলিয়াছেন,—"যে-দিকটাতে আমি কেবলমাত্রই আমি—সকল কথাতেই ঘুরে ফিরে কেবলি আমি—কেবল আমার সুখ দুঃখ, আমার আরাম, আমার আয়োজন, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা—যেদিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে দেখতে চাই, সেদিকটাতে আমি তো একটি বিন্দুমাত্র, সেদিকটাতে আমার মতো ছোটো আর কে আছে। আর যেদিকে আমার সঙ্গে সমস্তের যোগ, আমাকে নিয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পরিপূর্ণতা, যেদিকে সমস্ত জগৎ আমাকে প্রার্থনা করে, আমার সেবা করে, তার শতসহস্র তেজ ও আলোকের নাড়ীর সূত্রে আমার সঙ্গে বিচিত্র সম্বন্ধ স্থাপন করে,—আমার দিকে তাকিয়ে তার সমস্ত লোকলোকান্তর পরম আদরে এই কথা বলে যে, 'তুমি আমার যেমনটি এমনটি কোথাও আর-কেউ নেই, অন্তরের মধ্যে তুমিই কেবল তুমি', সেইখানে আমার চেয়ে বড় আর কে আছে?"

এখানে তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে, দার্শনিক যাহাকে

জীবাত্মা বলেন, সর্বতোভাবে পরিহার্য আমি সেই জীবাত্মা নহেন। দার্শনিকগণ যাহাকে জীবাত্মা বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাহাকে অন্যভাবে দেখিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ তাহাকে বলিয়াছেন তাঁহার ভিতরকার বিশেষ 'ব্যক্তি'। পরমপুরুষের মধ্যে নিহিত অসীম ভাবরাশির একটি বিশেষ ভাব সৃষ্টিপ্রবাহের ভিতর দিয়া বিশেষ রূপে ব্যক্ত হইতে চাহিয়াছিল ; রবীন্দ্রনাথের জীবন হইল সেই বিশেষ প্রকাশ-স্পন্দনের যুগ যুগ ধরিয়া জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ব্যক্তীভবন—সেই ব্যক্তীভবনের সমগ্রতা জুড়িয়াই রবীন্দ্রনাথের ক্রমবিবর্ধমান ক্রমপ্রসার্যমাণ একটি বিশেষ ব্যক্তিপুরুষ। এই ব্যক্তিপুরুষের সত্যকে যদি তিনি অস্বীকার করিতেন তবে ত আমিত্ব ঘুচাইতে গিয়া তিনি একেবারে মায়াবাদী বৈদান্তিক হইয়া উঠিতেন। বিশ্বপ্রবাহের মধ্যে এই আমির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, কারণ এই বিশেষ আমির ভিতর দিয়া পরমপুরুষের একটি বিশেষ ইচ্ছার একটি বিশেষ 'ভাবে'র (idea) বিশেষ প্রকাশ, সে-প্রকাশ আর কোথাও কোনও দিন নাই বলিয়া একটি বিশেষ অর্থ লইয়া এই বিশেষ আমি স্বতন্ত্র ; সেই সকল স্বাতন্ত্র্য জুড়িয়া পরমপুরুষের একতন্ত্র—এইখানেই সকল দ্বয়ের মধ্যেই আবার অদ্বয়যোগ। এই সত্যে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াই কবি বলিয়াছেন,—"জগতে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ স্থান আছে। আমরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ আমি। সেই বিশেষত্ব একেবারে অটল অটুট ; অনন্ত কালে অনন্ত বিশ্বে আমি যা আর-কেউ তা নয়।" (শান্তিনিকেতন, জাগরণ)। ইহার কারণ, এই একটি বিশিষ্ট 'আমি'র জীবনধারাকে অবলম্বন করিয়া পরমপুরুষের একটি বিশিষ্ট ইচ্ছাই যে দেশে কালে অবিচ্ছিন্ন রূপে তরঙ্গিত হইতেছে। অদ্বয়-অনুভূতির মধ্যে যেখানে মানুষের মুক্তি সেই মুক্তির ভিতরেও এই 'আমি'র সম্পূর্ণ বিলোপ নয়। ভারতীয় বৈদান্তিকগণ বলিবেন, এই 'আমি' অদ্বয় সত্যের ভিতরে নিঃশেষে আপনাকে বিলীন করিয়া

দেয় ; কিন্তু দ্বৈতবাদিগণ বলেন, পরমপুরুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াও এই জীবাত্মা চিৎকণরূপে নিত্য স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলে। রবীন্দ্রনাথের মানস-প্রবণতাও সেই দিকে। তিনি বলিবেন,—"এই আমার দ্বন্দ্বনিকেতন আমিকে আমার ভগবান নিজের মধ্যে লোপ করে ফেলতে চান না ; একে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে চান। এই আমি তাঁর প্রেমের সামগ্রী ; একে তিনি অসীম বিচ্ছেদের দ্বারা চিরকাল পর করে অসীম প্রেমের দ্বারা চিরকাল আপন করে নিচ্ছেন।" এইভাবেই ত 'আমি'র সঙ্গে তাঁহার নিত্যলীলা।

মানুষের সহস্র সহস্র বর্ষের ইতিহাস জুড়িয়া চলিতেছে এইরূপ অনন্ত 'আমি'র বিবর্তন, কিন্তু তাঁহার প্রত্যেকটি আমিই একটি বিশেষ অর্থ বা পরমপুরুষের ইচ্ছা-তরঙ্গ লইয়া স্বতন্ত্র। সমস্তের যোগে চলিতেছে সেই অনন্তস্বরূপ 'পরম একে'র পুরুষত্বের বা ব্যক্তিত্বের বিবর্তন। কিন্তু এই নিখিলপ্রবাহের মধ্যে আমার 'আমি'টির যে একটি স্বতন্ত্র মূল্য রহিয়াছে এবং সে-মূল্য যে পরমপুরুষের হইয়া ওঠার লীলার সঙ্গে অপরিহার্যরূপে জড়িত—ইহাই হইল প্রত্যেকটি ব্যক্তি-মানবের পরম গর্ব।

"এমন কত কোটি কোটি অন্তহীন আমির মধ্যে সেই এক পরম-আমির অনন্ত আনন্দ নিরন্তর ধ্বনিত তরঙ্গিত হয়ে উঠছে। অথচ এই অন্তহীন আমি-মণ্ডলীর প্রত্যেক আমির মধ্যেই তাঁর এমন একটি বিশেষ রস বিশেষ প্রকাশ যা জগতে আর কোনোখানেই নেই। সেইজন্যে আমি যত ক্ষুদ্রই হই, আমার মতো তাঁর আর দ্বিতীয় কিছুই নেই ; আমি যদি হারাই তবে লোকলোকান্তরের সমস্ত হিসাব গরমিল হয়ে যাবে। এইজন্যেই আমাকে নইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নয়, সেইজন্যেই সমস্ত জগতের ভগবান্ বিশেষরূপেই আমার ভগবান্, সেইজন্যেই আমি আছি এবং অনন্ত প্রেমের বাঁধনে চিরকালই থাকব।"

—শান্তিনিকেতন, জাগরণ

এই যে একটি বিশেষ আমিকে অবলম্বন করিয়া একটি বিশেষ

ব্যক্তি-প্রবাহ ইহাকে জীবনের কোন অংশে—বা একটি জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিতে যাওয়াই মিথ্যাদৃষ্টি। এই ব্যক্তি-প্রবাহের মধ্যেই একটা অখণ্ডতা রহিয়াছে—একটি বিশেষ অর্থের একটি বিশেষ প্রকাশকে লইয়া এই অখণ্ড প্রবাহ। আমার ভিতরকার যে সত্য সে ত শুধু জীবরূপে একদিন এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ যে আমি সেখান হইতেই যাত্রা করে নাই—তাহার কত অগণিত বর্ষ আগে প্রাকৃপৃথিবীর নীহারিকাপুঞ্জের মধ্যে যে অর্থ প্রকাশের অধীর উন্মুখতা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল—আমার মধ্যে নিহিত সে সত্য ধূলিতৃণের ভিতর দিয়া কত ভাবে প্রকাশ লাভ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহার পরে জড়ত্বের বন্ধন ঘুচাইয়া একদিন প্রাণ আসিয়াছে, সে প্রাণের কত অফুরন্ত প্রৈতি! সেই প্রাণপ্রৈতির আবেগের ভিতর দিয়া জাগিয়াছে চেতনা—চেতনার ঘনীভবনে জাগিয়াছে প্রেম—সে কি একদিনের কথা, সে কি একজন্মের কথা?

কবে আমি বাহির হলেম তোমারি গান গেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ভুলে গেছি কবে থেকে আসছি তোমায় চেয়ে
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।
ঝরণা যেমন বাহিরে যায়,
জানে না সে কাহারে চায়,
তেমনি করে ধেয়ে এলেম
জীবনধারা বেয়ে—
সে তো আজকে নয় সে আজকে নয়।

এই কথাটাকেই কবি তাঁহার ভাষণের মধ্য দিয়া অন্যভাবে বলিয়াছেন—

"এই রকম আঘাতের পর আঘাত লেগে আমরা যে কত শত জানার মধ্য দিয়ে জাগতে জাগতে এসেছি, তা কি আমরা জানি। প্রত্যেক জাগার

সম্মুখে কত নব নব অপূর্ব আনন্দ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তা কি আমাদের স্মরণ আছে। জড় থেকে চৈতন্য, চৈতন্য থেকে আনন্দের মাঝখানে স্তরে স্তরে কত ঘুমের পর্দা একটি একটি করে খুলে গিয়েছে, তা অতীত যুগযুগান্তরের পাতায় পাতায় লেখা রয়েছে—মহাকালের দপ্তরের সেই বই কে আজ খুলে পড়তে পারবে। অনন্তের মধ্যে আমাদের এই-যে জাগরণ, এই-যে নানাদিকের জাগরণ—গভীর থেকে গভীরে, উদার থেকে উদারে জাগরণ, এই জাগরণের পালা তো এখনো শেষ হয় নি। সেই চিরজাগ্রত পুরুষ যিনি কালে কালে আমাদের চিরদিন জাগিয়ে এসেছেন—তিনি তাঁর হাজারমহল বিশ্বভবনের মধ্যে আজ এই মনুষ্যত্বের সিংহদ্বারটা খুলে আমাদের ডাক দিয়েছেন—এই মনুষ্যত্বের মুক্তদ্বারে অনন্তের সঙ্গে মিলনের জাগরণ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে— ···।"

'তুমি-আমি'কে লইয়া রবীন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যজীবনে যে আনন্দ-লীলা আস্বাদনের চেষ্টা তাহার পিছনে রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে কতকগুলি প্রবল প্রবণতা ছিল। বিশেষ কোনও দার্শনিক তত্ত্বদৃষ্টির দ্বারা এ-বোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত নয়—কবি-অনুভূতির ভিতর দিয়া এ-কথা কোথাও ভাবপ্রাবল্যে কোথাও আভাসে ইঙ্গিতে প্রকাশিত হইয়াছে। এ কথা কবি নিজেই স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন—

এ কথা মানিব আমি, এক হতে দুই
কেমনে যে হতে পারে জানি না কিছুই।

—নৈবেদ্য, ৮৮

তথাপি কবির এ-বিষয়ে কতকগুলি সহজাত প্রবণতা ছিল; সেই প্রবণতা তাঁহাকে অনুভূতির পথে চালিত করিয়াছে, অনুভূতি আবার প্রবণতাকে পরিপুষ্ট করিয়াছে। পরস্পরের এইজাতীয় অনুপূরণে গড়িয়া উঠিল দৃঢ় বিশ্বাস—'তুমি' সম্বন্ধে—'আমি' সম্বন্ধে—জগদ্‌-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে। এই বিশ্বাসের মূল কথা এই, বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে একটি অনাদি 'এক' রহিয়াছেন; সেই একের মধ্যে ছিল

'মহাস্বপ্ন'। এই মহাস্বপ্নের তাৎপর্য হইল বস্তুর বিশুদ্ধভাবরূপে অবস্থিতি। যাহা এক পরমপুরুষের মধ্যে বা কবির ভাষায় 'মহাদেবে'র মধ্যে ভাবরূপে ছিল মহাস্বপ্নে বিধৃত—তাহারই প্রকাশ হইল বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া। এখানে দার্শনিক কূটতর্ক তোলা যাইতে পারে, এই যে প্রকাশ তাহা কি কালগতভাবে মহাস্বপ্নের বা বিশুদ্ধভাবরূপে অবস্থিতির পরবর্তী কোনও সঙ্ঘটন? অথবা ভাব ও প্রকাশ (idea and manifestation) অন্যোন্যাশ্রয়ী হইয়া নিত্যকালে সমভাবে অবস্থিত? রবীন্দ্রনাথ এই দার্শনিক জিজ্ঞাসার বিশুদ্ধ দার্শনিক উত্তর দিবার চেষ্টা কোনোখানেই করেন নাই। কোথাও দেখি, সৃষ্টির পূর্বকার এক মহাদেব বিরাজমান—তাঁহার অনন্ত ধ্যানের মধ্যে ভাবরূপে এবং সম্ভাবনারূপে নিহিত বিশ্বসৃষ্টি—তাহার মধ্যে 'আমি'ও বিধৃত একটি বিশেষ ভাবকণারূপে, সেই ধ্যানের প্রকাশ এই বিশ্বপ্রবাহে। কোথাও আবার দেখি, প্রকাশহীন দেবতা কোথাও কিছু নাই—ভাবে আর প্রকাশে নিত্যলীলা—সেই ভাবের নিধান হইলেন যে এক পরম পুরুষ, তিনিই নিত্যকালের 'তুমি'; আর প্রকাশের সারভূত বিগ্রহ নিত্যকালের 'আমি'; এই 'তুমি-আমি'র নিত্যলীলাতেই উভয়ই সত্য হইয়া উঠিতেছে।

বিশ্বপ্রবাহের পিছনকার যে প্রেরণা যে শক্তি তাহা হইল পরম একের আত্মানুভূতির আত্মানন্দের আবেগ, এই আবেগই কালধারায় প্রবাহিত সৃজ্যমান বিশ্বচরাচরের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসে কবে কেহ জানে না, বিশ্বদেবের একটি বিশেষ ভাবকণা লইয়া একটি বিশেষ 'আমি' এই সৃজ্যমান বিশ্বের সহিতই সৃজ্যমান হইয়া চলিয়াছে। বিশ্ববিবর্তন ধারায় এই 'আমি'টি বহুকাল জড়ের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়াই আবর্তিত হইয়াছে, জড় তাহার সকল আবর্তনের ভিতর দিয়া চেষ্টা করিয়াছে এই 'আমি'টিকে বিকশিত করিয়া তুলিবার। তাহার পরে আসিল প্রাণের পালা; বিশ্বপ্রাণের

নিরন্তর প্রৈতির ভিতর দিয়া চলিয়াছে এই 'আমি'র প্রাণযাত্রা, তাহার পরে প্রাণে হইল চৈতন্যের আধান,—চেতনা ঘনীভূত হইয়া রূপ ধরিল ব্যক্তি-পুরুষে, সেই ব্যক্তি-পুরুষ নিজেকে একদিন স্পষ্ট করিয়া চিনিতে পারিল 'আমি'রূপে ; সেই আপনাকে চেনার পালা লইয়াই মানুষের জীবন, আর 'আমি'কে চেনার ভিতর দিয়াই চলে 'তুমি'কে চেনা ; সারা জীবনে এই 'আমি'কে জানারও আর শেষ নাই—'আমি'কে জানার মধ্য দিয়া 'তুমি'র রহস্যানুভূতিরও শেষ নাই। তাই—

> আপনাকে এই জানা আমার
> ফুরাবে না।
> এই জানারই সঙ্গে সঙ্গে
> তোমায় চেনা।
> ... ...
> আমারে যে নামতে হবে
> ঘাটে ঘাটে,
> বারে বারে এই ভুবনের
> হাটে হাটে।
> ব্যাবসা মোর তোমার সাথে
> চলবে বেড়ে দিনে রাতে
> আপনা নিয়ে করব যতই
> বেচা কেনা॥

—গীতবিতান, ৭৫

সৃজ্যমান বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে নিজের 'আমি'টিও যে সৃজ্যমান হইয়া উঠিতেছে এই বোধ বহুদিন হইতেই কবিমনকে অধিকার করিয়াছিল। একখানি পত্রে এ বোধ প্রকাশ পাইয়াছে এইভাবে,—"এদিকে আমার জীবন ভিতরে ভিতরে নিজের সত্যের মন্দির প্রতিদিন একটি একটি ইট নিয়ে গড়ে তুলেছে। জীবনের সমস্ত

সুখদুঃখকে যখন বিচ্ছিন্ন ক্ষণিকভাবে দেখি, তখন আমাদের ভিতরকার এই অনন্তসৃজনরহস্য ঠিক বুঝতে পারি নে—প্রত্যেক পদটা বানান করে পড়তে হলে যেমন সমস্ত বাক্যটার অর্থ এবং ভাবের ঐক্য বোঝা যায় না সেই রকম। কিন্তু নিজের ভিতরকার এই সৃজনব্যাপারের অখণ্ড ঐক্যসূত্র যখন একবার অনুভব করা যায় তখন এই সৃজ্যমান অনন্ত বিশ্বচরাচরের সঙ্গে নিজের যোগ উপলব্ধি করি, বুঝতে পারি যেমন গ্রহনক্ষত্র চন্দ্রসূর্য জ্বলতে জ্বলতে ঘুরতে ঘুরতে চিরকাল ধরে তৈরি হয়ে উঠছে, আমার ভিতরেও তেমনি একটা সৃজন চলছে—আমার সুখ দুঃখ বাসনা বেদনা তার মধ্যে আপনার স্থান গ্রহণ করছে।"

কবির নিজের ভিতরকার 'আমি'পুরুষটি যে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপারের ভিতর দিয়াই তাহার ব্যক্তির ইতিহাস রচনা করিয়া চলিতেছে এই বোধটি কখনও কখনও কবির মধ্যে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে তিনি অনেক সময় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে মগ্ন হইয়া গিয়া সর্বত্র একটি নিরবচ্ছিন্ন 'আমি'কেই উপলব্ধি করিয়াছেন। এইজাতীয় একটি গভীর অনুভূতি লইয়াই রচিত 'কল্পনা'র 'অনবচ্ছিন্ন আমি' কবিতাটি।—

আমি মগ্ন হয়েছিনু ব্রহ্মাণ্ডমাঝারে ;
যখন মেলিনু আঁখি, হেরিনু আমারে।
ধরণীর বস্ত্রাঞ্চল দেখিলাম তুলি,
আমার নাড়ীর কম্পে কম্পমান ধূলি।
অনন্ত-আকাশ-তলে দেখিলাম নামি,
আলোক-দোলায় বসি দুলিতেছি আমি।
আজি গিয়াছিনু চলি মৃত্যুপরপারে,
সেথা বৃদ্ধ পুরাতন হেরিনু আমারে।
অবিচ্ছিন্ন আপনারে নিরখি ভুবনে
শিহরি উঠিনু কাঁপি আপনার মনে।

জলে স্থলে শূন্যে আমি যত দূরে চাই
আপনারে হারাবার নাই কোনো ঠাঁই।
জলস্থল দূর করি ব্রহ্ম অন্তর্যামী,
হেরিলাম তাঁর মাঝে স্পন্দমান আমি।

রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত এই সর্বব্যাপী অনবচ্ছিন্ন 'আমি'র তাৎপর্য কি? রবীন্দ্রনাথের নিজের ব্যক্তি-সত্তার ভিতরে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষণ, শুধু এক জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষণ নয়—তাঁহার সকল অতীত বর্তমান ও অনাগত জুড়িয়া যে একটি অখণ্ড ধারা আছে এবং সেই ব্যক্তি-জীবনের ধারাটি যে বিশ্ব-জীবনের ধারার সঙ্গেই একযোগে আবর্তিত ইহাই এখানকার একমাত্র কথা নহে। এখানকার বোধ বা অনুভূতির মধ্যে আর একটি ব্যাপক ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। তাহা হইল এই যে, দ্রষ্টা একটি 'আমি' ব্যতীত নিখিলদৃশ্যের কোনই অর্থ নাই,—দ্রষ্টার দৃষ্টির মধ্যেই দৃশ্যের সকল তাৎপর্য নিহিত। দ্রষ্টা হিসাবে মানুষের অনন্ত-রহস্যময় চৈতন্যের মধ্যেই সকল দৃশ্য তাৎপর্য লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে বিশ্বটা সম্পূর্ণভাবেই মানুষের বিশ্ব। চৈতন্যের পরম বিকাশ মানুষের পুরুষচৈতন্যের (personality) ভিতরে; মানুষের সেই যে পুরুষচৈতন্য তাহাই হইল 'অনবচ্ছিন্ন আমি'; সেই পুরুষচৈতন্যের যোগেই ত জল-স্থল-শূন্য সকলের অস্তিত্ব; কারণ পুরুষচৈতন্যে—এই 'আমি'র মধ্যে যদি জল-স্থল-শূন্য অর্থ লাভ না করিত তবে নৈরার্থক্যেই ত এই সকল 'নাস্তি' হইয়া উঠিত। রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনা যখন ব্রহ্মাণ্ডকে লইয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে তখন তিনি অনুভব করিয়াছেন তাঁহার ভিতরকার যে 'আমি' তাহা তাঁহার কাছে এই নিখিল পুরুষচৈতন্যের প্রতিভূ; তখনই তিনি অনুভব করিয়াছেন, এই 'আমি' পরিব্যাপ্ত সমস্ত কালে নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে। শুধু এক ছাড়া আর যে রহিয়াছে নিখিল 'অস্তিত্বরহস্যরাশি' তাহার কেন্দ্রবিন্দুটিতে তাই রহিয়াছে এই আমি। 'আছি' না থাকিলে 'আছে' থাকে কি

করিয়া ? আগে 'আছি'-রূপে 'আমি'—তবে ত 'আছে'-রূপে আর সব। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত যাঁহারা তাঁহারা এই 'আছি আর আছে'র অন্তহীন আদি প্রহেলিকা বুঝিতে পারেন না, তাই স্বীকারও করেন না।

তত্ত্ববিদ্ তাই
কহিতেছে, 'এ নিখিলে আর কিছু নাই,
শুধু এক আছে।' করে তারা একাকার
অস্তিত্বরহস্যরাশি করি অস্বীকার।

কিন্তু কবি চাহেন সমস্ত মন-প্রাণ লইয়া এই 'অস্তিত্বরহস্যরাশি'কে স্বীকার করিতে, তাই তিনি আবিষ্কার করেন—

আছি আমি বিন্দুরূপে, হে অন্তরযামী,
আছি আমি বিশ্বকেন্দ্রস্থলে। 'আছি আমি'
এ কথা স্মরিলে মনে মহান্ বিস্ময়
আকুল করিয়া দেয়, স্তব্ধ এ হৃদয়
প্রকাণ্ড রহস্যভারে।

—উৎসর্গ, ২২ সং

কবি শুধু এইখানেই থামিবেন না। 'আমি' দেখি বলিয়াই বিশ্বের যাহা কিছু সকলের সার্থকতা এই অহংকারের সঙ্গে কবির যুক্ত হইয়া আছে আর একটি বৃহত্তর অহংকার, তাহা হইল এই, সৃষ্টির সকলের পিছনে এবং সৃষ্টির সকল জুড়িয়া যে 'পরম এক' রহিয়াছেন তিনিও যাহা কিছু দেখেন—এই 'আমি'র চোখ দিয়াই দেখেন। তিনি যে বিশ্বকে দেখিতেছেন আর তাহার ভিতর দিয়া নিজেকে দেখিতেছেন তাহা ত এই 'আমি'-কেন্দ্রটিকে অবলম্বন করিয়াই। এই 'আমি'-কেন্দ্রে প্রতিফলিত যে তাঁহার বিশেষ চেতনা, সে চেতনার অন্তরালবর্তী তাঁহার যে একচেতনা তাহা ত নির্বিশেষ চেতনা, সেই নির্বিশেষ নিস্তরঙ্গ চেতনার মধ্যে যে বিশ্বকেও

দেখা নাই, নিজেকেও দেখা নাই। কেবল নিস্তরঙ্গ চেতনা লইয়া আপনার মধ্যে সমাহিত আপনার যে সন্মাত্রে অবস্থিত 'পরম এক' রূপ তাহাকে তাঁহার 'সৎ'রূপও বলিতে পারি, আবার অসৎ রূপও বলিতে পারি—কিছু না দেখার মধ্যে নিজেই অসৎ। তাহার পরে যখন সেই 'তৎ' নিজেকে ঈক্ষণ করিতে চাহিলেন তখন এক বহু হইলেন, বহুর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ 'আমি'তে। নিজেকে তিনি মানুষের ব্যক্তিচৈতন্যের ভিতর দিয়া অনন্ত ঐশ্বর্যে, অনন্ত মহিমায়—অনন্ত সৌন্দর্যে মাধুর্যে অবলোকন এবং আস্বাদন করিতেছেন; 'আমি' না হইলে এই দেখা যে তাঁহার সম্পূর্ণ হইত না তাহা নয়—সম্ভবই হইত না। এইখানেই 'আমি' হইলাম 'তুমি'র অপরিহার্য নিত্যদোসর, 'তুমি'র আত্মাবলোকন এবং তজ্জনিত আনন্দোপলব্ধির অবলম্বন বা সরিক। 'আমি'র এই অহংকারটি হইল সর্বাপেক্ষা বড় অহংকার। এই 'আমি'রই পরিচয় দিয়াছেন কবি তাঁহার 'শ্যামলী'র 'আমি' কবিতায়। কবিতার মধ্যেই এখানে চলিয়াছে উত্তরপক্ষ এবং পূর্বপক্ষের উক্তি-প্রত্যুক্তি।

আমারি চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম 'সুন্দর',
সুন্দর হল সে।

ইহার পরে কবি নিজেই পূর্বপক্ষ তুলিয়াছেন—

তুমি বলবে, এ যে তত্ত্ব-কথা,
এ কবির বাণী নয়।

কিন্তু কবির উত্তর—

আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকার-পটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প।

এই কথাটি এখানে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতে হইবে ; কবির যে অহংকার তাহা শুধু তাঁহার নিজেকে লইয়া নয়, এ অহংকার হইল 'সমস্ত মানুষের হয়ে' ; কারণ মানুষের ভিতরে ব্যক্তিচৈতন্যের নিত্যবিচিত্র বিকাশ যে 'অহংকার-পট' সৃষ্টি করিয়াছে সেই 'অহংকার-পট' না থাকিলে বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্পের কোনও মূল্যই থাকিত না।—

তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না,—
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।
ওদিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলি 'আমি'।

লক্ষ্য করিতে হইবে, অসীম যিনি তিনি যে সাধনা করিতেছেন আত্মাবলোকনের সে সাধনা হইল 'মানুষের সীমানায়'—মানুষের ব্যক্তিচৈতন্যকে অবলম্বন করিয়া বা মানুষের ব্যক্তিচৈতন্যের ভিতর দিয়া নানা ভাবে 'মিত' হইয়া। তত্ত্বদর্শী যদি এই সৃষ্টির পরে আবার প্রলয়ের কথা তোলেন, যদি বলেন যে গ্রহ-গ্রহান্তরের আকর্ষণ-বিকর্ষণের বিপর্যয়ে একদিন—

মর্ত্যলোকে মহাকালের মহাখাতায়
পাতা জুড়ে নামবে একটা শূন্য,
গিলে ফেলবে দিনরাতের জমাখরচ ;
মানুষের কীর্তি হারাবে অমরতার ভান,
তার ইতিহাসে লেপে দেবে
অনন্ত রাত্রির কালি ।
... ...
সেদিন কবিত্বহীন বিধাতা একা রবেন বসে
নীলিমাহীন আকাশে
ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্বের গণিততত্ত্ব নিয়ে ।

এই 'ব্যক্তিত্বহারা অস্তিত্ব'কেই কবি বলিবেন অনস্তিত্বের সামিল । মানুষের ব্যক্তিত্ব ব্যতীত বিধাতার এই ব্যক্তিত্ব গড়িয়া উঠিতে পারে না, তাই কবির ধারণা—

বিধাতা কি আবার বসবেন সাধনা করতে
যুগযুগান্তর ধ'রে ।
প্রলয়সন্ধ্যায় জপ করবেন—
"কথা কও, কথা কও",
বলবেন "বলো, তুমি সুন্দর",
বলবেন "বলো, আমি ভালোবাসি" ?

ইহা কবির প্রশ্ন নয়, ইহাই কবির মনঃপ্রাণের বিশ্বাস । সৃষ্টিপ্রবাহের মধ্য দিয়া মানুষ জাগিয়া উঠিয়া আবার যে পর্যন্ত কথা না বলিবে সে পর্যন্ত আত্ম-অচৈতন্যের বিলুপ্তি হইতে বিধাতাও জাগিয়া উঠিতে পারিবেন না ; মানুষ যে পর্যন্ত তাহার চেতনার সমৃদ্ধি লইয়া আবার বলিয়া না উঠিবে 'তুমি সুন্দর' সে পর্যন্ত 'তুমি' বিধাতা কেমন করিয়া জানিবেন যে তিনি সুন্দর ; মানুষ চেতনায় ঘনীভূত হইয়া 'আমি'-রূপে যে পর্যন্ত ডাকিয়া না বলিবে 'আমি ভালোবাসি' সে

পর্যন্ত 'তুমি' কি করিয়া জানিবেন তাঁহার নিজের প্রেমময়ত্বের সন্ধান? তাই আবার আত্মজাগরণ আত্ম-অবলোকনের সাধনা করিতে হইবে 'মানুষের সীমানায়' আসিয়া মানুষের চৈতন্যে। মানুষের অনন্ত প্রাণপ্রেতিময় জীবনে এবং তাহার চৈতন্যের অনন্ত উদ্ভাসময় প্রস্ফুরণে সীমা ও অসীমের মিলন ঘটিয়াছে। অসীম যিনি তিনি সীমার স্পর্শে স্পর্শে ব্যক্তিত্বহারা অনস্তিত্বের নৈঃশব্দ্য হইতে আত্মপরিচয়ের কলমুখরতায় নিত্যনূতন হইয়া জাগিয়া উঠিতেছেন, —অপর দিকে সীমা অসীমের স্পর্শ লাভ করিয়া করিয়া আপন সার্থকতা লাভ করিতেছে। উভয়তঃই রহিয়াছে একটা পূর্ণতার আদর্শ। 'পরম ব্যক্তিত্বে'র পূর্ণতা মানব-ব্যক্তিত্বের পূর্ণতায়, মানব-ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা আবার পরম ব্যক্তিত্বের স্পর্শে, যেখানে মানুষ অনুভব করিতে পারে—

জীবনের ধন কিছুই যাবে না ফেলা
ধুলায় তাদের যত হোক অবহেলা
পূর্ণের পদপরশ তাদের 'পরে।

অনন্ত দেশ এবং অনন্ত কালকে অবলম্বন করিয়া এই যে এক বিশ্বপুরুষ এবং আর এক আমি-পুরুষের লীলা ইহার রহস্যই পরম বিস্ময়ে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কবির মন। সেই বিস্ময়ের প্রকাশ দেখি তাঁহার গানে—

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে॥
তুমি আছ বিশ্বনাথ, অসীম রহস্য-মাঝে
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে॥
অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি—আমি চাহি তোমা পানে।
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর—
এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে॥

রবীন্দ্রনাথের অদ্বয়বোধের মধ্যে দ্বয়বোধের মূল কথাটি উপরে উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এখানে মূল কথাটি বলিলেই চলিবে না, এই মূল কথাটি কত বিচিত্র বিস্তার লাভ করিয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতার মধ্যে আমরা অদ্বয়ের মধ্যে যে দ্বয়বোধের কথা পাই তাহার মূল কথাগুলি সাজাইয়া গুছাইয়া বলিতে যাইবার মধ্যে একটি বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই জাতীয় প্রসঙ্গকে সাধারণ-ভাবে আলোচনা করিতে গেলে তাহার মধ্যে কতকগুলি মৌলিক দার্শনিক প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা; মূল প্রশ্নগুলির সহিত কতকগুলি পার্শ্বপ্রশ্নও নৈয়ায়িক পন্থাতেই অপরিহার্যরূপে দেখা দিবে। ফলে যাহা গিয়া দাঁড়াইবে তাহা হইল 'রবীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা'—যে জিনিসটি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজেই অত্যন্ত ভীত ছিলেন। কবি-অনুভূতিগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ঘষিয়া মাজিয়া একটা পূর্বাপর সঙ্গতিসম্পন্ন রূপ দিবার চেষ্টাকে আর কেহ না হোক কবি নিজে নিশ্চয়ই অপছন্দ করিতেন, আর নিশ্চয়ই অপছন্দ করেন তাঁহারা—যাঁহারা কবি-অনুভূতির বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া কবিকে কবি করিয়াই পাইতে চান, যুক্তি-সঙ্গত সিদ্ধান্তে প্রতিষ্ঠিত 'পাকা দার্শনিক' করিয়া দেখিতে চান না। কবির ভাষা সম্বন্ধে কবি বিদ্যাপতি বলিয়াছেন, ইহা হইল 'বালচন্দ্র'; একেবারে পরিষ্কার ভাবে গোটা চন্দ্র নয়, খানিকটার মধ্য দিয়া স্ফুট-অর্ধস্ফুট-অস্ফুট কত আভাস ইঙ্গিত। কবির দার্শনিকতা সম্বন্ধেও সেই কথা—একটা গোটা মত নয়—বিচিত্র আভাস ইঙ্গিত; তাহার সবটা বুদ্ধিগ্রাহ্য নহে—কবি অনুভূতির সঙ্গে নিজের হৃদয়ানুভূতিকে মিলাইয়া তবে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দ্বয়বোধকে স্পষ্ট কোনও দ্বৈতবাদের কোঠায় ঠেলিয়া পৌঁছাইতে চেষ্টা করিব না। কি তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন এবং কি তিনি বলিতে চাহিয়াছেন তাহা নিজের ভাষায় গুছাইয়া বলিবার চেষ্টা না করিয়া যতটা পারি এ বিষয়ে কবিকেই অনুসরণ করিবার চেষ্টা কবির। সে চেষ্টাও যতটা সম্ভব কালানুক্রমেই করিবার চেষ্টা কবির; কারণ তাহাতে কবির একটি ধাতুগত প্রবণতা জীবনের বিভিন্নকালে কবি-মানসকে কি ভাবে বিচিত্র খাতে বহাইয়া লইয়া গিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবারও সুযোগ লাভ করিব। এ-পদ্ধতির মুখ্য গুণ হইল কবির বাণীকে ইহাতে কবির গানে এবং কবিতাতেই বুঝিয়া লওয়া যায়, কবিকে বুঝিবার ইহাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ পন্থা; ঐতিহাসিক-ক্রমে পাওয়া যায় বলিয়া কবির চিত্ত-বিকাশের ধারাটিও এখানে লক্ষ্য করিবার সুযোগ লাভ করা যায়। কিন্তু এ পদ্ধতিতে আলোচনার গুণের সঙ্গে বড় একটি দোষও অনিবার্য—তাহা হইল অনেকখানি পুনরুক্তি। এই দ্বয়বোধকে অবলম্বন করিয়া কবির হৃদয়ানুভূতি অনেক সময়ই ঘুরিয়া ফিরিয়া বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভাষায় ছন্দে কতকগুলি সমজাতীয় অনুভূতিকেই প্রকাশ করিয়াছে। সেই পুনরুক্তি-দোষের সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমরা কবির কবিতা ও গানকে ঐতিহাসিক ক্রমে অনুসরণ করিয়াই এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

বিশ্বসৃষ্টি রচনার পশ্চাতে এক 'মহাদেবে'র যে একটি 'মহাস্বপ্ন' রহিয়াছে এবং যে-পর্যন্ত সৃষ্টি দেখা দেয় নাই সে-পর্যন্ত এই মহাস্বপ্নের দ্বারাই যে মহাকাল এবং অনন্ত গগন পূর্ণ ছিল, রবীন্দ্রনাথের একেবারে প্রথম দিকের লেখা 'প্রভাতসংগীতে'র 'মহাস্বপ্ন' কবিতার মধ্যেই আমরা তাহার উল্লেখ দেখিয়াছি। এ-বিশ্বাস কবি-চিত্তে এখনও স্পষ্ট রূপ ধারণ করে নাই—এখনও দেখি ছড়ান ছড়ান তরলভাবের নীহারিকা-পুঞ্জ, কিন্তু এই নীহারিকার ভবিষ্যৎ আবর্তনপথকে এইখানেই চিনিয়া লওয়া যায়। 'মহাস্বপ্নে'র পরবর্তী

কবিতা 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়'; এই কবিতাতেও প্রাক্-সৃষ্টির বর্ণনার মধ্যে সৃষ্টির মূল রহস্যবাণী লুক্কায়িত রহিয়াছে।

দেশশূন্য, কালশূন্য, জ্যোতি-শূন্য, মহাশূন্য'পরি
চতুর্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া—
কবে দেব খুলিবে নয়ান।
অনন্ত হৃদয় মাঝে আসন্ন জগৎ চরাচর
দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত নিশ্চল,
অনন্ত হৃদয়ে তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান
ধীরে ধীরে বিকাশিছে দল।

এখানকার এই শেষের কথাটিই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান লইয়া সমগ্র কালও সৃষ্টির পূর্বেই অবস্থিত ছিল, তাহা অনন্ত দেশকে অবলম্বন করিয়া যে পর্যন্ত গতি লাভ না করিয়াছে সে-পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছে আদিদেবের ধ্যানের মধ্যে। ধ্যানের মধ্যে যাহা ছিল অমূর্ত 'ভাব'মাত্র—তাহাই বাহিরে মহাকমলের ন্যায় একটু একটু করিয়া দল বিকাশ করিতে লাগিল। এই 'বিকাশিছে দল' কথাটির ভিতরেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে 'ব্রহ্মকমলে'র ধারণার একটি অস্পষ্ট আভাস লাভ করি। জ্যোতির্ময় ধ্যানের বহির্মুক্তিতেই যে বিশ্বনির্ঝরের অকস্মাৎ প্রবাহ তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে পরবর্তী বর্ণনায়—

মহান্ ললাটে তাঁর অযুত তড়িৎ স্ফূর্তি
অবিরাম লাগিল খেলিতে।
অনন্ত ভাবের দল, হৃদয় মাঝারে তাঁর
হতেছিল আকুল ব্যাকুল;
মুক্ত হয়ে ছুটিল তাহারা,
জগতের গঙ্গোত্রী শিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছ্বসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর···।

এ ক্ষেত্রে কবি বিধাতাকে আর সৃষ্টি-নির্ঝরকে নিত্য-সহ-অবস্থিত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না, কিন্তু সৃষ্টির যাহা কিছু তাহার সবই যে আদিদেবের ধ্যানবিধৃত ইচ্ছারই বিগ্রহীভবন মাত্র, এ ধারণাটি এইখানেই বেশ স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলাম। এই ধারণারই পরিণতি দেখিতে পাই পরবর্তী কালের গানে—

তাপস তুমি ধেয়ানে তব
কী দেখি মোরে কেমনে কব,
আপন মনে মেঘ-স্বপন আপনি রচ রবি।
তোমার জটে আমি তোমারি ভাবের জাহ্নবী ॥

এই প্রথম দিকের কবিতায় একদিকে যেমন সৃষ্টির পিছনকার ধ্যানসত্যে বিশ্বাস দেখিতে পাই, অন্য দিকে তেমনি একটি 'পরম তুমি' যোগে 'আমি'র অর্থ এবং মূল্য অনুভব করিবার আকুতিও লক্ষ্য করিতে পারি। ছোট আমিটিকে ঘিরিয়া যে দৈনন্দিন আবর্তন, তাহার ভিতরে নাই জীবনের কোনও গভীর উপলব্ধি; জীবনে কেমন তাই একটা 'হাহাকার'—কেমন একটা আত্ম-অসন্তোষ। সেখানেই দেখি কবি একটি 'তুমি' দ্বারা জীবনের সকল শূন্যতাকে ভরিয়া তুলিতে চাহিতেছেন—

বুঝেছি বিফল কেন জীবন আমার—
আমি আছি তুমি নাই তাই অসন্তোষ।
সকল কাজের মাঝে আমারেই হেরি—
ক্ষুদ্র আমি জেগে আছে ক্ষুধা লয়ে তার,
শীর্ণবাহু আলিঙ্গনে আমারেই ঘেরি
করিছে আমায় হায় অস্থিচর্মসার।
কোথা নাথ, কোথা তব সুন্দর বদন—
কোথায় তোমার নাথ, বিশ্বঘেরা হাসি।
আমারে কাড়িয়া লও, করো গো গোপন—
আমারে তোমার মাঝে করো গো উদাসী।

ক্ষুদ্র আমিকে একটি বৃহতের আলিঙ্গনের দ্বারা বড় করিয়া অনুভব করিবার বাসনা দেখা দিয়াছে, ক্ষুদ্র আমির শূন্যতার নৈরাশ্যকে একটি 'বিশ্বঘেরা হাসি' দ্বারা ভরিয়া লইবার আকুতি দেখা দিয়াছে ; কিন্তু এই 'তুমি' সম্বন্ধে কবির মন এখনও প্রচলিত বিশ্বাস-সংস্কারের পথে। নিজের জীবনে এই 'তুমি'র স্বরূপ এখন পর্যন্ত জীবনানুভূতির ভিতর দিয়া সত্য মূল্য লাভ করে নাই। এই জন্যই দেখিতে পাই এক মুহূর্তের বিশ্বাসের পাশেই ঠিক পর মুহূর্তের সংশয়। এখানে দেখি, অপর সকলের ন্যায়ই রবীন্দ্রনাথও যেখানে জীবন-জিজ্ঞাসা দেখা দিয়াছে সেইখানেই একটা কিছু বিশ্বাসের দ্বারা জিজ্ঞাসার সমাধান লাভ করিতে চাহেন ; কিন্তু জিজ্ঞাসাটা অত্যন্তভাবে প্রথাবদ্ধ নয় বলিয়া বিশ্বাসের পথে যে সমাধান তাহার ভিতরে একটা ক্রূর সংশয় উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে। 'কড়ি ও কোমলে'র ভিতরে চারি অংশে খণ্ডিত 'চিরদিন' নামে যে একটি কবিতা রহিয়াছে তাহার মধ্যেই দেখিতে পাই সংশয়ান্বিত কবি-চিত্তের এই দ্বন্দ্ব। 'এক' কেহ আছেন ইহা যদি জানিলাম, তাহাতেই বা লাভ হইল কি ? শুধু এই 'এক'ই সত্য নয়, 'একে'র ভিতর দিয়া জগৎ ও জীবন সত্য ইহা উপলব্ধি করিতে না পারিলে কিছুই হইল না। সুতরাং কবিমনের সোজাসুজি প্রশ্ন, 'তুমি শুধু একা আছ, আর সব আছে আর নাই ?' সেই 'এক'ই সত্য—আর সব কিছু আছে আর নাই—সুতরাং আর কিছুই 'ত্রৈকালিক' সত্য নয়, অতএব মিথ্যা—এ কথা ত আর কিছু নূতন কথা নয়, মায়াবাদী বেদান্তের এই-ই ত মূল কথা। এ তত্ত্বে ত প্রাণের 'হাহাকার' কিছুই মিটিবার নয়। প্রাণে 'হাহাকার' কোন্ প্রশ্ন লইয়া ?

> প্রাণ পেয়ে প্রাণ দিই সে কি শুধু মরণের পায় ?
> এ ফুল চাহে না কেহ ? লহে না এ পূজা উপহার ?
> এ প্রাণ, প্রাণের আশা, টুটে কি অসীম শূন্যতায়।
> বিশ্বের উঠিছে গান, বধিরতা বসি সিংহাসনে ?

বিশ্ব জুড়িয়া প্রাণের যে অফুরন্ত গান ইহা শূন্যে জাগিয়া একান্ত অশ্রুতভাবে শূন্যেই আবার হারাইয়া যাইতেছে—এ কথা প্রাণ কি করিয়া সহ্য করিবে? প্রাণ চায়, অনাদি কালের এই গানকেই কেহ কোথাও অনাদিকালে বসিয়া বসিয়া শুনিতেছে—নিজের প্রয়োজনেই শুনিতেছে, সেই প্রয়োজনেই এই গানের সকল মূল্য। 'বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন?' 'প্রভাতসংগীতে'ই কবি বলিয়াছেন বটে যে এ স্বপ্ন স্বয়ং 'মহাদেবে'রই স্বপ্ন; কিন্তু সে বলার পিছনে গভীর জীবনবোধ ছিল না; তাই আবার সংশয় এবং প্রশ্ন। এ সংশয় এবং প্রশ্নের পশ্চাতে কবির প্রকাণ্ড একটা কিছু বলার আছে, তাহা হইল এই—

ধ্বনি খুঁজে প্রতিধ্বনি, প্রাণ খুঁজে মরে প্রতিপ্রাণ
জগৎ আপনা দিয়ে খুঁজিছে তাহার প্রতিদান।

অর্থাৎ কবিকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে শুধু একটি 'সর্বশূন্য এক'কে পাইলে চলিবে না, সেই এককে পাইতে হইবে বিশ্ব-জীবনের যত ধ্বনি তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া, যত প্রাণ তাহার প্রতিপ্রাণরূপে, জগতের আত্মোৎসর্জনের ভিতর দিয়া যত কিছু দান তাহারই প্রতিদানরূপে। এই কথাটি কবির চিত্তে আরও অত্যন্ত অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছিল 'প্রভাতসংগীতে'র 'প্রতিধ্বনি' কবিতাটির ভিতরে। ধ্বনির প্রতিধ্বনি যে কোথায় কি—সে সম্বন্ধে কবিহৃদয়ে স্পষ্ট কোনও ধারণা বা বিশ্বাস দেখা দেয় নাই, কিন্তু কবি অস্পষ্টভাবে এ কথা ভিতরে ভিতরে অনুভব করিয়াছেন—

জগতের গানগুলি দূর-দূরান্তর হতে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা, বহ্নি হেরি পতঙ্গের মতো,
পদতলে মরিবারে চায়।

'মরিবারে চায়' মরিবার জন্য নয়, নবপ্রাণ পাইয়া শাশ্বত মূল্য লাভ করিবার জন্য ; প্রতিধ্বনির ভিতরে যে তাহার শাশ্বত মূল্য নিহিত আছে তাহা দৃঢ়ভাবে আবিষ্কার করিবার জন্য। এই প্রতিধ্বনির তাৎপর্য এই বয়সে রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যেই স্পষ্ট ছিল না, থাকিবার কথাও নয় ; কিন্তু ইহা কবি-হৃদয়ের একটি বিশিষ্ট ভাব-বীজ বহন করিতেছিল, পরিণত বয়সে সে ব্যঞ্জনার তাৎপর্য কবির নিকটে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। 'জীবনস্মৃতি'র মধ্যে এই প্রতিধ্বনির ব্যাখ্যায় কবি বলিয়াছেন—

"একদিন হঠাৎ আমার অন্তরের যেন একটা গভীর কেন্দ্রস্থল হইতে একটা আলোকরশ্মি মুক্ত হইয়া সমস্ত বিশ্বের উপর যখন ছড়াইয়া পড়িল, তখন সেই জগৎকে আর কেবল-ঘটনাপুঞ্জ বা বস্তুপুঞ্জ করিয়া দেখা গেল না, তাহাকে আগাগোড়া পরিপূর্ণ করিয়া দেখিলাম। ইহা হইতেই একটা অনুভূতি আমার মনের মধ্যে আসিয়াছিল যে, অন্তরের কোন একটি গভীরতম গুহা হইতে সুরের ধারা আসিয়া দেশে কালে ছড়াইয়া পড়িতেছে—এবং প্রতিধ্বনিরূপে সমস্ত দেশকাল হইতে প্রত্যাহত হইয়া সেইখানেই আনন্দস্রোতে ফিরিয়া যাইতেছে। সেই অসীমের দিকে ফেরার মুখের প্রতিধ্বনিই আমাদের মনকে সৌন্দর্যে ব্যাকুল করে। গুণী যখন পূর্ণ-হৃদয়ের উৎস হইতে গান ছাড়িয়া দেন তখন সেই এক আনন্দ ; আবার যখন সেই গানের ধারা তাঁহারই হৃদয়ে ফিরিয়া যায় তখন সে এক দ্বিগুণতম আনন্দ। বিশ্বকবির কাব্যগান যখন আনন্দময় হইয়া তাঁহারই চিত্তে ফিরিয়া যাইতেছে তখন সেইটিকে আমাদের চেতনার উপর দিয়া বহিয়া যাইতে দিলে আমরা জগতের পরম পরিণামটিকে যেন অনির্বচনীয়রূপে জানিতে পারি।"

এ জাতীয় একটি ভাব কবির হৃদয়ে অস্ফুটভাবে আনাগোনা করিতেছিল, কিন্তু এই ভাবের মধ্যে তখনও চিত্তের কোনও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছিল না, তাই আবার ক্ষণে ক্ষণেই দেখা দিত সংশয়।

কবি-হৃদয়ের এই সংশয়ের রেশ চলিয়াছে 'মানসী' পর্যন্ত ; 'মানসী'র 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' কবিতাটির মধ্যে কবিকে আবার দেখিতে পাই এই রূঢ় প্রশ্নের সম্মুখীন। 'নিষ্ঠুর সৃষ্টি' নামটির মধ্যেই কবির

সংশয়াম্বিত চিত্তের প্রতিক্রিয়া ধরা পড়িয়াছে। সৃষ্টি যেখানে কোথাও বাঁধা নাই—শুধু একটা কালপরিধিতে সীমাম্বিত ভাসমান স্রোত মাত্র—সেখানে চরম অর্থহীনতা দ্বারাই সৃষ্টি চরম নিষ্ঠুররূপে দেখা দেয়।

হায় স্নেহ, হায় প্রেম, হায় তুই মানবহৃদয়,
খসিয়া পড়িলি কোন্ নন্দনের তটতরু হতে ?
যার লাগি সদা ভয়,
পরশ নাহিক সয়,
কে তারে ভাসালে হেন জড়ময় সৃজনের স্রোতে ?

এতখানি নিখিল শূন্যের নিষ্ঠুরতা দ্বারা পীড়িত মানব-চিত্ত তখন কি চায় ? কোন্ প্রশ্ন জুড়িয়া বসে তাহার সর্ব দেহ-মন ? সে প্রশ্ন এই—

তুমি কি শুনিছ বসি হে বিধাতা, হে অনাদি কবি,
ক্ষুদ্র এ মানবশিশু রচিতেছে প্রলাপজল্পনা ?

এই যুগের এই জাতীয় সব প্রশ্নগুলিই হইল উত্তরের সংকেতবাহী প্রশ্ন ; এখানে যাহার সংকেত, পরবর্তী কালে ক্রমান্বয়ে দেখিতে পাই তাহার প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার। 'মানসী'র 'মরণস্বপ্নে'র মধ্যেও সেই সংশয় ও বিশ্বাসের দোলা।

অন্ধকারহীন হয়ে গেল অন্ধকার।
'আমি' ব'লে কেহ নাই, তবু যেন আছে।

'মানসী'র 'সিন্ধুতরঙ্গে'ও দোলায়িত একদিকে 'মহা-শঙ্কা', অন্যদিকে 'মহা-আশা।'

এমন জড়ের কোলে কেমনে নির্ভয়ে দোলে
নিখিল মানব।

সব সুখ সব আশ কেন নাহি করে গ্রাস
মরণ দানব।

... ...

এ নিষ্ঠুর জড়স্রোতে প্রেম এল কোথা হতে
মানবের প্রাণে।

এই যে 'মহা-শঙ্কা'র পাশেই 'মহা-আশা' সেই মহা-আশাই কবিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে এই কথা বলিতে—

কে তুমি দিয়েছ স্নেহ মানব হৃদয়ে
কে তুমি দিয়েছ প্রিয়জন!
বিরহের অন্ধকারে কে তুমি কাঁদাও তারে
তুমিও কেন গো সাথে কর না ক্রন্দন!

এই সংশয় জিজ্ঞাসা ও শাশ্বত সত্যের মূল আঁকড়াইয়া ধরিবার আকুতির ভিতরেই আবার পাই 'ধ্যান' কবিতাটি—সে কবিতার মধ্যে শুধু 'তুমি' 'আমি'তে বিশ্বাস নয়—তাহাদের মধ্যে একটা গভীর আনন্দলীলার যোগের প্রশান্ত সুর নামিয়া আসিয়াছে—এ যেন গীতাঞ্জলির সুরের প্রথম উচ্চারণ।—

তুমি যেন ওই আকাশ উদার,
আমি যেন ওই অসীম পাথার,
আকুল করেছে মাঝখানে তার
আনন্দপূর্ণিমা।
তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন,
আমি অশান্ত বিরামবিহীন
চঞ্চল অনিবার—
যতদূর হেরি দিগ্‌দিগন্তে
তুমি আমি একাকার।

পূর্ণিমার আকাশের আলোর স্পর্শ আসিয়া লাগে সমুদ্রের বুকে, তবেই জাগে তাহার চাঞ্চল্যের উদ্বেলতা—তাহাতেই ত জাগে পূর্ণিমার আনন্দপূর্ণতা। কিন্তু এখানে কবি বলিতেছেন, 'তুমি প্রশান্ত চিরনিশিদিন', আর 'আমি অশান্ত বিরামবিহীন'; পরে এই ধারণাও রূপান্তর গ্রহণ করিয়াছে, সেখানে চির-চঞ্চলতা দেখি উভয়-ক্ষেত্রেই; একজনের মধ্যে আনন্দ-চঞ্চলতা—অপরের মধ্যে তাহার প্রকাশ, আবার সেই অপরের প্রকাশ লইয়াই এই একের আত্মানুভূতির পূর্ণতা।

কিন্তু উপরে বর্ণিত এই যে 'তুমি-আমি'র প্রেম, ইহা বর্ণনার অসাধারণ চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও অনেকখানিই যেন একটা অধ্যাত্ম অনুভূতি; জগতের সঙ্গে জীবনের সঙ্গে ইহার যোগ স্পর্শযোগ্য নহে। সেই যোগ ব্যতীত কবির মনেও তৃপ্তি নাই। তাই দেখি মানবীয় সীমানায় আসিয়া যে গভীর প্রেমের স্মৃতি তাহার ভিতরেই—

দেখা দেয় অবশেষে
কালের তিমির রজনী ভেদিয়া
তোমারি মুরতি এসে,
চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার বেশে।
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে
অনাদিকালের হৃদয়-উৎস হতে।

এই যে যুগলপ্রেমের স্মৃতি—তাহা মর্ত্য প্রেমেরই অনন্তস্মৃতি; কবি অনুভব করিয়াছেন, জন্মে জন্মে যত মর্ত্য যুগলপ্রেম ইহার মূল রহিয়াছে সৃষ্টির মূলে—যেখানে একের আনন্দ একটি অনন্ত যুগল-প্রেমের স্রোত রচনা করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। প্রেম একই—তাহার উৎপত্তি আদি—তুমি ও আমিকে লইয়া; সেই আদি তুমি-আমিই হইল আদিযুগল, সেই আদি-যুগলের প্রেমই

মর্ত্যের নর-নারীর প্রেমরূপ গ্রহণ করিয়া বিচিত্ররূপে প্রকাশ লাভ করিতেছে।

'মানসী'র পরে 'সোনার তরী'তে আসিয়া কবি এই 'আমি' ও 'তুমি'কে লইয়া 'দুই পাখি' কবিতা রচনা করিলেন। 'আমি' হইল 'খাঁচার পাখি', আর 'তুমি' হইল 'বনের পাখি'। কবি উপনিষদের একই দেহবৃক্ষে সখারূপে বাসকারী জীবাত্মা ও পরমাত্মারূপ দুই পাখীকে অবলম্বন করিয়াই কবিতাটি রচনা করিয়াছেন; কিন্তু মূল প্রেরণা উপনিষদের এই বর্ণনা হইতে লাভ করিয়া থাকিলেও কবিতাটির ভিতরে জীব ও পরমাত্মা বা রবীন্দ্রনাথের 'আমি' ও 'তুমি'র রহস্য আভাসিত হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বহুদিন পর্যন্ত সত্যকার একটি খাঁচার পাখী ও বনের পাখীকে লইয়া অতি চমৎকার একটি কবিতা বলিয়াই কবিতাটিকে গ্রহণ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি, এবং এখনও সকল তত্ত্বজ্ঞান সত্ত্বেও কবিতাটিকে যে কারণে অপূর্ব বলিয়া আস্বাদন করি তাহা জীবাত্মা পরমাত্মা—বা 'আমি-তুমি'র রহস্য লইয়া নয়—তাহা বাস্তব একটি খাঁচার পাখী ও বনের পাখী লইয়া। কিন্তু কবির নিজেরই স্বীকৃতি—এ দুই পাখী 'আমি' ও 'তুমি'।

১৫

জীবনের মূলে একটি পরমপুরুষের বিশেষ ইচ্ছা বা আত্মাবলোকনের আনন্দকণা সক্রিয় বলিয়া উপলব্ধি করিবার কবি-প্রবণতাকে আমরা 'সোনার তরী'তে একটি নূতন ভঙ্গিতে দেখিতে পাইলাম। যৌবনে কবিমনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবজীবন উভয় ক্ষেত্র হইতেই একটা অমোঘ আকর্ষণ উপলব্ধি করিতেছিলেন; এই উপলব্ধি সৌন্দর্যের এবং প্রেমের। এই সৌন্দর্য ও প্রেমের কোনও স্পষ্ট স্বরূপ তখন কবিচিত্তে

উদ্ভাসিত হয় নাই, সুতরাং এই সৌন্দর্যের ও প্রেমের আকর্ষণ লইয়া বিশ্বভুবন অনেকখানিই কবিচিত্তের কাছে তখন অজ্ঞাত-রহস্যের কুহেলিকাবৃত। একটা অসীম মুগ্ধতা ও ব্যাকুলতা কবিচিত্তে ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছিল একটা অনির্দেশ্য রোম্যান্টিক আকুতি। কিন্তু এই রোম্যান্টিক আকুতি ক্রমগভীরতা এবং ক্রমবিস্তারের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে একটা ঘনীভূত জীবনজিজ্ঞাসার রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল এবং এই ঘনীভূত জীবন-জিজ্ঞাসা কবিমনকেও রোম্যান্টিক-তার স্তর হইতে উত্তরণ করিয়া একটা মিস্টিক্ অদ্বয় অনুভূতির পথে পরিচালিত করিতেছিল। সেই মিস্টিক্ অনুভূতির স্পন্দন প্রথম ধরা পড়িয়াছে 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' কবিতায়। 'সোনার তরী'র প্রথম কবিতাতেই ইহার অস্পষ্ট বাসনা রহিয়াছে, সেই অস্পষ্ট বাসনা কিঞ্চিৎ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে শেষ কবিতায়। জীবনের সকল রূপমুগ্ধতা এবং প্রেমমুগ্ধতা কবিচিত্তে আসিয়া মূর্তিগ্রহণ করিতেছিল একটি অদৃশ্য রহস্যময়ী মোহিনী নারীর অমোঘ আকর্ষণের রূপে। বিচিত্র জীবনযাত্রার ভিতর দিয়া কবি অনুভব করিতে লাগিলেন, তিনি নিজেই শুধু চলিতেছেন না, জীবনের নিরুদ্দেশ যাত্রায় একটি অপরিচিতা মধুরহাসিনী বিদেশিনীর নীরব ইঙ্গিতই যেন অদৃশ্য শক্তিরূপে সমগ্র জীবনকে টানিয়া লইতেছে। এই যে তাহার আকর্ষণ তাহা শুধু মর্ত্য সৌন্দর্য ও প্রেমের আকর্ষণ নয়—ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক গভীর—ইহা জীবনের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক আকর্ষণ। এ আকর্ষণ শুধু এক-জীবনের আকর্ষণ নয়—জীবনমৃত্যুকে জুড়িয়া যে অখণ্ড যাত্রা সেই অখণ্ড যাত্রাপথেরই আকর্ষণ। তাই একদিকে যেমন দেখি—

যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
'কে যাবে সাথে,'
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।

তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে ?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না বলে।

তাহার পরে দীর্ঘদিন চলিয়াছে জীবনযাত্রা, তাহাতে কখনও আনন্দ-দীপ্ত সূর্যকরোজ্জ্বল আকাশ—কখনও মেঘাবৃত ; কখনও ক্ষুব্ধ সাগর, কখনও শান্তছবি। তাহার পরে যখন—

আঁধার রজনী আসিবে এখনি
মেলিয়া পাখা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্ণ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
... ...
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,
'কোথা আছ, ওগো করহ পরশ
নিকটে আসি।'
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

'সোনার তরী'র এই নিরুদ্দেশ যাত্রার ভিতর দিয়াই 'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা'র পদসঞ্চার লক্ষ্য করা যাইতেছে। রহস্যঘন কবি-অনুভূতির অস্পষ্টতাকে বিদীর্ণ করিয়া একটি নিজস্ব অধ্যাত্মবোধ গড়িয়া উঠিতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার পূর্বে 'তুমি-আমি'কে লইয়া যে অধ্যাত্মবোধের প্রকাশ, তাহা সম্পূর্ণ না হইলেও অনেকখানি ঐতিহ্য ও সংস্কারের অনুগামিত্ব দ্বারা আচ্ছন্ন ; সকল ঐতিহ্য-সংস্কার 'জীবনদেবতা'কে অবলম্বন করিয়া স্বধর্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছে। 'চিত্রা'র ভিতরে লক্ষ্য করিতে পারি, 'জীবনদেবতা'র

বোধ এখানে আচমকা কোনও অধ্যাত্মবোধরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই, কবি-সত্তার সমগ্রপুরুষীয় বোধের সঙ্গে যুক্ত হইয়াই দেখা দিয়াছে। এ সত্যটি সর্বাপেক্ষা ভালভাবে লক্ষ্য করিতে পারি 'চিত্রা'র 'অন্তর্যামী' কবিতাটির মধ্যে। কবিতাটির মধ্যে স্পষ্ট চারিটি স্তর রহিয়াছে। আমাদের বিচারে এই চারিটি স্তরকে স্পষ্ট পৃথক্ পৃথক্ করিয়াই দেখা চলে, চারিটিকে মিলাইয়া মিশাইয়া ফেলিয়া অযথা একটা জটিলতা এবং গোলযোগ সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে ইহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল; ব্যবহারিক কবি-অভিজ্ঞতার সহিত যে পর্যন্ত অধ্যাত্মবোধকে ওতপ্রোতভাবে মিলাইয়া না লইতে পারিতেছিলেন, সে পর্যন্ত কবি স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিতই হইতে পারিতেছিলেন না।

'অন্তর্যামী' কবিতাটির প্রথম স্তরে কবি তাঁহার কাব্যসৃষ্টির সকল ক্ষেত্রে নিজের মধ্যে যে দ্বৈতসত্তার লীলা অনুভব করিতেছিলেন সেই দ্বৈতত্বের অনুভূতি প্রায় সকল সাহিত্যস্রষ্টার অভিজ্ঞতার মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। যে অনন্ত-কৌতুকময়ী কবির 'অন্তরমাঝে বসি অহরহ' মুখ হইতে ভাষা কাড়িয়া লইতেছেন, যিনি কবির নিজের ভাষাকে 'দহিয়া অনলে ডুবায়ে ভাসায়ে নয়নের জলে, নবীন প্রতিমা নবকৌশলে' মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন, তাহাকে আমরা কবির গভীর পুরুষীয় সত্তায় বিধৃত বাসনালোক বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি, আলঙ্কারিকের ভাষায় অপূর্ববস্তু-নির্মাণ-ক্ষমা প্রজ্ঞা বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি, আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকের ভাষায় মগ্নচৈতন্য বা অচৈতন্যের চেতনস্তরে আলোড়ন বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে পারি, সমাজতন্ত্রবাদিগণকে অনুসরণ করিয়া শিল্পীর ব্যক্তি-সত্তার মধ্যে সমাজসত্তার সক্রিয় প্রতিফলন বলিয়াও ব্যাখ্যা করিতে পারি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখি তাঁহার অনুভূতির তথ্য তাঁহাকে অন্যপথে পরিচালিত করিয়াছে। কবিতাটির দ্বিতীয় স্তরেই দেখিতে পাই, এই যে এক কৌতুকময়ী অদৃশ্য নিয়ন্তৃশক্তি রূপে

দেখা দিয়াছেন ইনি ত শুধু কবিকর্মের ক্ষেত্রেই অনুভূত হইতেছেন না, তিনিই অন্তর্যামী রূপে অনুভূত হইতেছেন সমগ্র জীবনকর্মের মধ্য দিয়াই। তাই প্রথমে 'আমি যাহা কিছু চাহি বলিবারে—বলিতে দিতেছ কই' প্রশ্ন করিয়াই কবি প্রশ্ন করিতেছেন 'যেদিকে পান্থ চাহে চলিবারে, চলিতে দিতেছ কই।' সুতরাং দেখা যাইতেছে, কবিশক্তি কোনও পৃথক্ শক্তি নয়, যে শক্তি সমগ্র জীবনকর্মের নিয়ন্তৃশক্তি রূপে জীবনকে গতি, পরিণতি ও অর্থ দান করিতেছে তাহাই সকল শিল্পকৃতিরও গতি, পরিণতি ও অর্থ দান করিতেছে। এখানেই কবিজীবনের সহিত অধ্যাত্মজীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ মিলন হইয়া গেল। কবি যখন 'আমার অর্থ' ও 'তোমার তত্ত্ব' জানিতে চাহিলেন তখনই বুঝিলেন সমগ্র জীবন লইয়াই—

আমি কি গো বীণা যন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার
মূর্ছনাভরে গীতঝংকার
ধ্বনিছ মর্মমাঝে ?

প্রশ্নচ্ছলে কথাটি উপস্থিত করিলেও আসলে ইহা প্রশ্ন নয়, ইহাই সত্যানুভূতি। 'আমি'কে এইভাবে একটি বীণাযন্ত্ররূপে অনুভূতির কিছু পরেই দেখিতে পাইলাম—

জ্বেলেছ কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার
রহস্যঘেরা অসীম আঁধার
মহামন্দিরতলে ?

এইখানেই অন্তর্যামী 'জীবনদেবতা' রূপে প্রকাশ পাইলেন। বিশ্বের অন্তর্যামী এক দেবতা ; সেই এক দেবতার আলো আমার বিশেষ জীবন প্রদীপকে অবলম্বন করিয়া একটি বিশেষ প্রভা দান করিতেছে ; আমার ব্যক্তিকেন্দ্রে আসিয়া আমার মধ্যে তিনি বিশেষ

রূপায়ণ ও অর্থলাভ করিতেছেন; ইহাই আমার ব্যক্তিজীবনের অখণ্ডপ্রবাহকে বিশেষ মূল্য দান করিতেছে। এক দেবতা আমার ব্যক্তিজীবনের ধারায় আমার জীবনদেবতার রূপ ধারণ করিতেছেন। আমার জীবনপ্রদীপের অখণ্ড প্রবাহ 'ধরিয়া যে বিশেষ আলো বিকীরিত হইতেছে তাহা শেষ পর্যন্ত গিয়া লাগিতেছে কোন্ কাজে? লাগিতেছে আত্ম-অপ্রকাশের 'রহস্যঘেরা অসীম আঁধার মহামন্দির-তলে' যে এক দেবতা বিশ্বের প্রতিষ্ঠাতারূপে অবস্থান করিতেছেন তাঁহার মুখের উপর হইতে অপ্রকাশের সকল যবনিকা দূর করিয়া প্রকাশের নিত্যনব মহিমায় তাঁহার মূর্তি উদ্ভাসিত করিয়া তোলায়। অনন্ত জীবন-আরতিতেই সেই এক দেবতার অনন্ত জাগরণ। শেষে দেখিতেছি, যে শক্তি কৌতুকময়ী রূপে কাব্যের অন্তর্যামী তিনিই রূপ ধারণ করিলেন—

চির দিবসের মর্মের ব্যথা
শত জনমের চিরসফলতা,
আমার প্রেয়সী, আমার দেবতা,
আমার বিশ্বরূপী,
মরণ-নিশায় উষা বিকাশিয়া
শ্রান্তজনের শিয়রে আসিয়া
মধুর অধরে করুণ হাসিয়া
দাঁড়াবে কি চুপি চুপি?

আরও পরে দেখিলাম, আমার জীবন—আমার জগৎ বলিয়া যাহা মনে করিতেছি তাহার সব কিছুর তাৎপর্য হইল 'আপনার মাঝে আপনি মত্ত।' এক যিনি 'আপনার মাঝে আপনি মত্ত হইয়া' নিত্যকালে অসীম দেশে বিশ্বদেবতা হইয়া—'মহান্ পুরুষ' হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছেন, তাঁহারই এক অর্থ অসংখ্য অর্থে ভাগ হইয়া অসংখ্য স্বতন্ত্র ধারায় দেশে কালে অসংখ্য জীবনপ্রবাহ সৃষ্টি করিতেছে; বিশেষ জীবনের মধ্যে অর্থবান্ হইয়া উঠিবার লীলা

করিতেছেন বিশ্বদেবতার যে অংশটি তিনিই জীবনদেবতা। কবি রবীন্দ্রনাথ বার বার করিয়া গভীরভাবে এই সত্যটি অনুভব করিয়াছেন যে তাঁহার মধ্যে নিত্যপ্রকাশ-কামনায় ধাবমান যে 'আমি'-পুরুষটি সে-আমি, এক অদ্বিতীয় আমি, সে আমির বিশ্বে কোথাও কোনো জুড়ি নাই,—সেই অপরূপ একটি 'আমি'কে নিশ্চয়ই তাঁহার জীবনদেবতা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন একটি বিশেষ-ভাবে আত্মানুভূতির প্রয়োজনে। কবির বিশ্বাস, তাঁহার বিশেষ জীবনটির ভিতর দিয়া প্রকাশিত চৈতন্যের যে লীলা—তাহা বিশ্ব-প্রকাশের মধ্যে আর কোনও দিন কোথাও ছিল না; যাহা অন্য আর কোথাও নাই তাহাই তাঁহার জীবনের ভিতর দিয়া জীবনদেবতা পান করিতে চান; এই একটি বিশেষ 'তিয়াস' রহিয়াছে কবির জীবনদেবতার ভিতরে। তাই কবি 'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা' কবিতাটির ভিতরে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন— 'মিটেছে কি তব সকল তিয়াস আসি অন্তরে মম?' এই 'তিয়াস' সম্বন্ধে সচেতন হইয়া ওঠার অর্থই হইল জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়া ওঠা। এই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত হইয়াই কবি সমগ্র জীবনকে একটি পানপাত্র করিয়া বিচিত্র জীবনরসে তাহাকে পূর্ণ করিয়া জীবন-দেবতার নিকটে নিবেদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই 'জীবনদেবতা'র অনুভূতি একটা বিশেষভাবে কবির মনকে নাড়া দিয়াছিল, কারণ এই 'জীবনদেবতা'র ধারণার মধ্যে ব্যবহারিক জীবন ও অধ্যাত্ম-জীবনের গভীর সমন্বয় কবিকে গভীর উল্লাস ও নির্ভয় দান করিয়াছিল। এই অনুভূতি সম্বন্ধে কবি তাঁহার *The Religion of Man* গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"I felt sure that some Being who comprehended me and my world was seeking his best expression in all my experiences, uniting them into an ever-widening individuality which is a spiritual work of art.

To this Being I was responsible ; for the creation in me is his as well as mine. It may be that it was the same creative Mind that is shaping the universe to its eternal idea ; but in me as a person it had one of its special centres of a personal relationship growing into a deepening consciousness....I felt that I had found my religion at last, the religion of Man, in which the infinite became defined in humanity and came close to me so as to need my love and co-operation."

Personality ভাষণেও কবি বলিয়াছেন—

"He gives us from his own fulness and we also give him from our abundance. And in this there is true joy not only for us, but for God also."

মানুষের ভিতরে যে abundance—যে সম্পদ্-প্রাচুর্য সেইটাকেই কবি বলিয়াছেন মানুষের ভিতরকার surplus—যেটা মানুষের জৈবিক অস্তিত্বকে অতিক্রম করিয়া মানুষের অপার মহিমারূপে দেখা দেয়। এই অপার মহিমা হইতেই উৎসারিত মানুষের সকল সৌন্দর্য-প্রেম, মানুষের শিল্প সাহিত্য ধর্ম বিজ্ঞান ; এই অপার মহিমাতেই মানুষের মনুষ্য-সীমানার মধ্যেই আভাসিত হয় যেই অসীমতা—সেই অসীমতাতেই জীবনদেবতার সঙ্গে তাহার যোগ।

এই যে আত্মাবলোকন বা আত্মোপলব্ধির তাগিদেই অসীমের মানুষের সীমায় অবতরণ এবং মানুষের প্রেম ও সহযোগিতার প্রার্থী হইয়া মানুষকে তাঁহার নিত্যকালের সরিক বলিয়া স্বীকার, মানুষের জীবনমূল্য-হিসাবে এই কথাটিই রবীন্দ্রনাথের মন ভরিয়া দিয়াছিল। জীবন হইতে জীবনান্তরকে তিনি তখন অতি সহজভাবেই গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন ; এক জীবন যখন এমনভাবে পুরনো হইয়া যায় যে সে আর জীবনদেবতাকে নূতন কোনও জীবনরস পান করাইতে পারে না তখন এক সভা ভাঙিয়া নূতন রূপ—নূতন শোভা

আনিবার প্রয়োজন হয় ; সেই নূতন রূপ ও শোভার মধ্য দিয়াই 'নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায় নবীনজীবনডোরে।'

'চিত্রা'র ভিতরে এই জীবনদেবতা কবির প্রেমভক্তির স্পর্শে স্পষ্ট কোনও ধর্মীয় রূপ লাভ করে নাই, একটা রহস্যঘেরা গভীর কবি-অনুভূতিতেই বিভিন্ন কবিতায় ইহা বিভিন্ন আলো-ছায়ায় রূপ লাভ করিয়াছে। সেই জীবনদেবতার আবছা-আবছা পরিচয় ভাসিয়া ওঠে 'চিত্রা'র 'সাধনা' কবিতায়, 'চিত্রা'র 'দিন শেষ' কবিতায়—'চিত্রা'র 'সিন্ধু-পারে' কবিতায়। 'সোনার তরী'র 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র মধ্যে অজ্ঞাত-রহস্যময়ী মোহিনী নারীরূপে জীবন-দেবতার যে আভাস পাই, তাহারই রেশ চলিয়াছে 'সিন্ধুপারে'র 'পউষ প্রখর-শীতে জর্জর, ঝিল্লিমুখর রাতি'তে কৃষ্ণ-অশ্বে আরোহিতা অবগুণ্ঠনবতী নারীর মধ্যে—সে নারী যখন 'মুখে না কহিয়া বাণী' শুধু একবার অবগুণ্ঠনখানি খুলিয়া দিয়াছিল তখন—

"এখানেও তুমি জীবন দেবতা!" কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদু হাসি, সেই সুধাভরা আঁখি—
চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি।"

'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা' কবিতার 'জীবনদেবতা' নারীরূপে কল্পিতা নন, বরঞ্চ শেষের দিকে বিবাহডোরের রূপকের ভিতর দিয়া কবি নিজেকেই খানিকটা প্রেমিকারূপ দান করিয়াছেন ; কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে কৌতুকময়ী বা মোহিনী রহস্যময়ী রূপেরই আধিক্য, ইহার রেশ পরবর্তী কিছু কিছু কবিতার মধ্যেও দেখিতে পাই। 'চিত্রা'র ভিতরে যাঁহাকে কৌতুকময়ী বা মোহিনী রহস্যময়ী করিয়া দেখিতে পাই, 'কল্পনা'র 'অশেষ' কবিতার মধ্যে তাঁহাকেই দেখিতে পাই 'কঠোর স্বামিনী' করিয়া, সমস্ত জীবনে যিনি মুহূর্তের জন্য বসিয়া থাকিতে—বিশ্রাম করিতে দিলেন না, টানিয়া লইলেন শুধু নিত্য নব কঠোর কর্তব্যের অমোঘ আহ্বানে—

রে মোহিনী, রে নিষ্ঠুরা, ওরে রক্তলোভাতুরা
কঠোর স্বামিনী,
দিন মোর দিনু তোরে— শেষ নিতে চাস হ'রে
আমার যামিনী ?

কিন্তু কঠোর স্বামিনীর এই নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও কবি সমগ্র জীবন এই স্বামিনীর আহ্বানে নিরলস ভাবে সাড়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এই সাড়া দিবার প্রেরণা যোগাইয়াছে একটি প্রবল আত্মাভিমান—সে দুর্লভ অভিমান এই, আমার জীবনে যে সাড়া দিবার অধিকার আমারই—সেই অধিকারে আমার সমগ্র জীবনধারাই যে স্বামিনী কর্তৃক বৃত হইয়াছে।

শুধু আমি তোরে সেবি বিদায় পাই নে দেবী,
ডাক ক্ষণে ক্ষণে—
বেছে নিলে আমারেই, দুরূহ সৌভাগ্য সেই
বহি প্রাণপণে।
সেই গর্বে জাগি রব সারা রাত্রি দ্বারে তব
অনিদ্র-নয়ান,
সেই গর্বে কণ্ঠে মম বহি বরমাল্যসম
তোমার আহ্বান।

'চৈতালি'র 'শান্তিমন্ত্র' কবিতাটির মধ্যেও দেখি 'অন্তর্যামিনী দেবী'কে—

হে অন্তর্যামিনী দেবী, ছেড়ো না আমারে
যেয়ো না একেলা ফেলি জনতাপাথারে
কর্মকোলাহলে। সেথা সর্ব বঞ্চনায়
নিত্য যেন বাজে চিত্তে তোমার বীণায়
এমনি মঙ্গলধ্বনি।

অবশ্য 'কল্পনা'র মধ্যে 'জীবনদেবতা'র যেমন 'কঠোর স্বামিনী'রূপও

দেখিতে পাই, আবার এমন বর্ণনাও পাই যাহার ভিতর দিয়া 'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা' এবং 'নৈবেদ্য' 'গীতাঞ্জলি'তে পরিবর্তিত 'জীবনদেবতা'র একটা মিশ্রণ দেখা যায়। যেমন 'ভিখারি' কবিতায়—

আমি আমার বুকের আঁচল ঘেরিয়া
তোমারে পরানু বাস,
আমি আমার ভুবন শূন্য করেছি
তোমার পুরাতে আশ।
মম প্রাণমন যৌবন নব
করপুটতলে পড়ে আছে তব,—
ভিখারি, আমার ভিখারি!
হায়, আরো যদি চাও, মোরে কিছু দাও,
ফিরে আমি দিব তাই।
ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ,
আরো কি তোমার চাই?

অথবা তাঁহার 'কল্পনা'র প্রসিদ্ধ গান—

জানি হে তুমি যুগে যুগে তোমার বাহু ঘেরিয়া
রেখেছ মোরে তব অসীম ভুবনে—
জনম মোরে দিয়েছ তুমি আলোক হতে আলোকে,
জীবন হতে নিয়েছ নবজীবনে।

১৬

ভাব ও প্রকাশ লইয়া, অসীম ও সীমা লইয়া, তুমি ও আমি লইয়া প্রাক্-চল্লিশের যুগে রবীন্দ্রনাথের মানসলোকে বিভিন্ন অবস্থানের ভিতর দিয়া অনুভূতির বর্ণবৈচিত্র্যের যে প্রতিফলন দেখিতে পাই তাহা প্রথম উত্তরচল্লিশ যুগ হইতেই একটি স্পষ্ট ধর্মীয় রূপ লাভ করিয়াছিল। 'নৈবেদ্যে'র মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনায়

একটি স্পষ্ট ধর্মীয় রূপ লক্ষ্য করিতে পারি। এই ধর্মীয় রূপের অর্থ কি? তুমি ও আমিকে লইয়া যে একটি রহস্যলীলার অনুভূতি তাহা ত পূর্বেও নানাভাবে দেখিতে পাই; তাহা হইতে 'নৈবেদ্যে'র অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য এইখানে, ইতঃপূর্বে এই তুমি-আমির লীলা-রহস্য নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিলেও কবিচেতনা এই দিকেই কেন্দ্রীভূত এবং ঘনীভূত হইয়া ওঠে নাই। ইহার পূর্বে এই সীমা-অসীমের লীলা লইয়া কবির অধ্যাত্মবোধ এমনভাবে কেন্দ্রীভূত হইয়া ওঠে নাই যাহাতে বুঝিতে পারি যে কবি-চিত্তের সকল রসের ধারা 'তুমি'কে অবলম্বন করিয়া একটি বিশেষ ধারার মধ্যেই বিলীন হইতে চাহিতেছে। প্রাক্-চল্লিশের যুগে এই সীমা-অসীমের লীলারসধারাকে একটি অন্তঃপ্রবাহিণী ধারা বলিয়া স্থানে স্থানে লক্ষ্য করিতে পারি, কিন্তু ইহার প্রাধান্যে কবির জীবন-রসাস্বাদনের সকল বৈচিত্র্য একটি একমুখিতা লাভ করে নাই। 'নৈবেদ্যে' আসিয়া লক্ষ্য করিতে পারি, অন্তঃসলিলা ধারাটি কখন আপনার মধ্যে প্রচুর বেগ সঞ্চারিত করিয়া জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবাধ প্রসার লাভ করিয়াছে এবং সর্বক্ষেত্রের বীজ অঙ্কুর শাখী বনস্পতির চারিদিকে এক-রসের যোগান দিতেছে।

'নৈবেদ্যে' আসিয়া আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, তুমি-আমিকে বা অসীম ও সীমাকে অবলম্বন করিয়া কবির যে একটা অনির্দেশ্য রহস্যবোধ তাহা একটা স্পষ্ট রূপ লাভ করিতে লাগিল ধর্মীয় প্রেম-ভক্তির ভঙ্গিতে। রবীন্দ্রনাথ প্রাক্-চল্লিশের যুগে প্রচলিত ধর্মমতের অনুসরণে যে সব ধর্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্যত্র কোথাও তাঁহার উপলব্ধ 'অসীম'কে একটা স্পষ্ট ঈশ্বর ভগবান্ বা ব্রহ্মের সীমায় আনিয়া ফেলিতে চাহেন নাই; পরবর্তী জীবনেও তাঁহার অনুভূত অধ্যাত্ম সত্যকে তিনি এই সব কোনও 'কোটি'র মধ্যে আনিয়া ফেলিতে চাহেন নাই। কারণ, আমাদের জানা-বোঝার সাধারণতঃ একটি ছক আছে, ঈশ্বরই বলি আর ভগবান্‌ই

বলি আর ব্রহ্মই বলি—আমাদের মনের ছকের মধ্যে পড়িয়া সকলেই আমাদের মননসীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়েন। কবি তাঁহার অনুভূতিকে এই মননসীমার রেখাবন্ধন হইতে সর্বদাই মুক্তি দিতে চাহিয়াছেন। ব্রহ্ম যত বড় ব্রহ্মই হোন না কেন, তাঁহার নিরাকার দেহেও আমাদের ধর্মীয় সংস্কারের রঙ-রেখা লাগিয়াছে এবং সেই রঙ-রেখার দ্বারা তিনি সীমিত হইয়া পড়িয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ধর্মীয় ভাষণাদির মধ্যেও তাই ব্রহ্ম কথাটি বার বার ব্যবহার করেন নাই—তিনি 'এক', 'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতম্', 'মহান্ পুরুষ' (পুরুষং মহান্তম্), 'মহাপ্রাণ', 'অসীম', 'অনন্ত' প্রভৃতি শব্দই নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতেন। সত্যের পাখীকে খাঁচায় পূরিয়া দেখিতে বা সেখানে বসিয়া সে মানুষের শিখানো বুলির যে গান গায় তাহা শুনিতে কবির মনের তৃপ্তি নাই, তিনি চাহিতেন বিশ্বপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়া উড়িয়া সে পাখী যে গান শুনায় সেই গানের সুরে হৃদয়কে সদা জাগ্রত রাখিতে।

কিন্তু 'নৈবেদ্যে'র রচনা হইতে 'বলাকা'-রচনার পূর্ব পর্যন্ত কবির যে জীবন-অধ্যায়টি এই অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাই কবি তাঁহার বিভিন্নরূপে উপলব্ধ পরমসত্যের গায়ে খানিকটা প্রচলিত ধর্মের রঙ মাখাইয়া লইয়াছেন। 'নৈবেদ্য' প্রকাশিত হয় ১৯০১ সনে, বইখানি উৎসর্গীকৃত হয়, 'পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে' ; ঘটনাটি একান্ত আকস্মিক এবং অহৈতুক না হইয়া তাৎপর্যপূর্ণও হইতে পারে। ঠিক এই সনেই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'ঔপনিষদ ব্রহ্ম'—এ তথ্যটিও লক্ষণীয় হইতে পারে। ১৯০৬ সনে প্রকাশিত 'খেয়া', ১৯১০ সনে 'গীতাঞ্জলি', ১৯১৪ সনে প্রকাশিত 'উৎসর্গ', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি' ; ইহার পরে ১৯১৬ সনে প্রকাশিত কবির 'বলাকা'। 'নৈবেদ্যে'র মধ্যে যে নূতন সুর লক্ষ্য করিতে পারি তাহারই বিস্তার দেখিতে পাই 'গীতিমাল্য' 'গীতালি' পর্যন্ত ; 'বলাকা'তে আসিয়া লক্ষ্য করি সুরের পরিবর্তন। অবশ্য এই যুগে

যে কবি শুধু ধর্মপ্রবণ কবিতা ও গানই রচনা করিয়াছেন তাহা নহে; ইহার মধ্যে ১৯০৯ সনে প্রকাশিত 'শিশু', ১৯১২ সনে 'চৈতালি', ১৯১৪ সনে প্রকাশিত 'স্মরণ'।

'নৈবেদ্যে'র মধ্যেও 'অন্তর্যামী'কে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু আত্মনিবেদনের বিনম্রচিত্ততার সম্মুখে এ 'অন্তর্যামী' ঈষৎ রূপান্তরিত। তাই 'চিত্রা'য় যে 'অন্তর্যামী'কে দেখিয়া আসিয়াছি সেই 'অন্তর্যামী' হইতে 'নৈবেদ্যে'র—

নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি মনে
ওগো অন্তরযামী,
প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া
তোমারে হেরিব আমি,
ওগো অন্তরযামী।

প্রভৃতির ভিতরকার 'অন্তর্যামী'কে কিঞ্চিৎ পৃথক্ করিয়া পাইলাম এ-কথা অস্বীকার করিতে পারি না। 'তুমি' এখানে শুধু 'জীবনস্বামী' হইয়া দেখা দেন নাই, তুমি 'ভুবনেশ্বর', তুমি 'রাজরাজ', তুমি 'প্রভু', 'নাথ', 'হৃদয়বল্লভ', 'নিখিলশরণ'। এই সম্বোধনগুলির মধ্যেই কবির সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি ব্যঞ্জিত হইয়াছে। অলক্ষ্যে কোথাও কোথাও প্রেমভক্তি-আত্মনিবেদন-মিশ্রিত বৈষ্ণবীয় ভঙ্গির আমেজ লাগিয়াছে। পরম সত্য এখানে পরম দয়িত, পরম বাঞ্ছিত, পরম আরাধ্য হইয়া দেখা দিয়াছে। সুরের এই পরিবর্তন লক্ষিত হইবে পাশাপাশি দু'একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলেই। জীবন হইতে জীবনান্তরে গমন যে নূতন নূতন পরিবেশের মধ্যে অন্তর্যামীকে নিত্য নূতন করিয়া খুঁজিয়া পাইবার সুযোগমাত্র—অথবা লীলারসহীন একটি খেলাকে ভাঙিয়া দিয়া নূতন বিরহ-মিলনে নূতন খেলার আয়োজন 'চিত্রা'র 'অন্তর্যামী' এবং 'জীবনদেবতা' উভয় কবিতার শেষেই তাহার বর্ণনা আছে। 'অন্তর্যামী'তে আছে—

এবারের মতো পুরিয়া পরাণ
তীব্র বেদনা করিয়াছি পান ;
সে-সুরা-তরল অগ্নিসমান
তুমি ঢালিতেছ বুঝি।
আবার এমনি বেদনার মাঝে
তোমারে ফিরিব খুঁজি।

'জীবনদেবতা'র শেষে আছে—

ভেঙে দাও তবে আজিকার সভা,
আনো নব রূপ, আনো নব শোভা,
নূতন করিয়া লহ আর বার
চির-পুরাতন মোরে।
নূতন বিবাহে বাঁধিবে আমায়
নবীন জীবনডোরে।

ইহার সহিত 'নৈবেদ্যে'র ৩৬ সংখ্যক কবিতার শেষাংশটুকু তুলনা করিলেই সুরের পার্থক্য স্পষ্ট প্রকাশ পাইবে।—

এখন মন্দিরে তব এসেছি, হে নাথ,
নির্জনে চরণতলে করি প্রণিপাত
এ জন্মের পূজা সমাপিব। তার পর
নবতীর্থে যেতে হবে হে বসুধেশ্বর।

আমরা 'অন্তর্যামী' কবিতায় জীবনের প্রদীপ জ্বালিয়া এক মহাদেবতার পূজারতির কথা দেখিয়াছি। তাহারই সঙ্গে তুলনা করিতে পারি 'নৈবেদ্যে'র ৩৭ সংখ্যক কবিতা—

দেব, মন্দিরে তোমার
পশিয়াছি পৃথিবীর সর্বযাত্রী সনে,
দ্বার মুক্ত ছিল যবে আরতির ক্ষণে।
... ...
একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া
তোমারে হেরিব একা ভুবন ভুলিয়া।

'নৈবেদ্যে'র মধ্যে কবি তাঁহার বাঞ্ছিতকে উপনিষদের মত করিয়া বহুর মধ্যে প্রকাশিত সংসার-কোলাহলের মধ্যেও দেখিলেন—আবার দেখিলেন—

মহাজনারণ্য-মাঝে অনন্ত নির্জন
তোমার আসনখানি—কোলাহল-মাঝে
তোমার নিঃশব্দ সভা নিস্তব্ধ বিরাজে।
সব দুঃখে, সব সুখে, সব ঘরে ঘরে,
সব চিত্তে সব চিন্তা সব চেষ্টা 'পরে
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু যায় দেখা
হে সঙ্গবিহীন দেব, তুমি বসি একা!

কিন্তু ধর্মীয় স্রোতে কবি তাঁহার মূল অনুভূতির সত্য হইতে অনেকখানি দূরে সরিয়া যান নাই। যিনি একা সঙ্গবিহীন দেব তিনিই যে আবার ব্যক্তিজীবনের মধ্যে আসিয়া জীবনদেবতা বা অন্তর্যামী রূপে ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ক্ষণকে জীবনের সামগ্রিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিয়া কোনও ক্ষণটিকেই হারাইয়া যাইতে দেন নাই—অখণ্ড বিকাশধারার মধ্যে সার্থক করিয়া তুলিতেছেন—সেই অনুভূতি সমভাবেই কবির চিত্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে। তাই যখনই মনে সংশয় আসিয়াছে জীবনের কোনও ক্ষণ বুঝি মূল্যহীন হইয়া নষ্ট হইয়া গেল তখনই জাগিতেছে অনুভূতি—

নষ্ট হয় নাই, প্রভু, সে-সকল ক্ষণ,
আপনি তাদের তুমি করেছ গ্রহণ
ওগো অন্তর্যামী দেব। অন্তরে অন্তরে
গোপনে প্রচ্ছন্ন রহি কোন্ অবসরে
বীজেরে অঙ্কুররূপে তুলেছ জাগায়ে,
মুকুলে প্রস্ফুটবর্ণে দিয়েছ রাঙায়ে,
ফুলেরে করেছ ফল রসে সুমধুর,
বীজে পরিণত গর্ভ।

আবার আমরা দেখিয়াছি, কবির অনুভূতিতে 'আছি' ব্যতীত 'আছ' নাই; আমি ব্যতীত বহির্বিশ্ব নাই; আমির ভিতরকার ইন্দ্রিয়যন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রজালবৎ অবিশ্রাম বিচিত্র বিশাল সৃজনের জাল রচিত হইতেছে; এই রচনার ফলেই 'প্রত্যেক প্রাণীর মাঝে প্রকাণ্ড জগৎ।' কিন্তু প্রত্যেক প্রাণীর ভিতরকার এই প্রকাণ্ড জগতের সার্থকতা কোথায়?—

তোমারি মিলনশয্যা, হে মোর রাজন,
ক্ষুদ্র এ আমার মাঝে অনন্ত আসন
অসীম বিচিত্রকান্ত। ওগো বিশ্বভূপ,
দেহে মনে প্রাণে আমি একি অপরূপ! (২৭ সং)

প্রত্যেকটি ব্যক্তিজীবনের সকল কর্মের—এবং সকল কর্ম জুড়িয়া সমগ্র জীবনের—শেষ অর্থ যে 'তোমা'র মধ্যে—এ ধ্রুবপদের উচ্চারণ এই নৈবেদ্যের মধ্যেই অতি স্পষ্ট। জাগতিক মূল্য কোথাও কিছু অস্বীকার না করিলেও—

তার সর্বশেষ
আপনি খুঁজিয়া ফিরে তোমারি উদ্দেশ

কবির যত গান যত কথা সেখানেও 'তোমা পানে ধায় তার শেষ অর্থখানি'। এখানে যে-জিনিসটি আমরা লক্ষ্য করিতে পারি তাহা এই যে, এই যুগে কবি জাগতিক সার্থকতা এবং 'তোমা-মাঝে'র সার্থকতাকে সর্বত্র না হইলেও স্থানে স্থানে পৃথক করিয়া দেখিয়াছেন; কিন্তু কবিকণ্ঠে পরবর্তী কালে আমরা আর একটি সুরেরই প্রাধান্য দেখিতে পাই—যেখানে জাগতিক সার্থকতা এবং 'তোমা-মাঝে'র সার্থকতা দুই হইয়া—বা একের পরে আর এইরূপ পৃথক্ হইয়া দেখা দেয় নাই; জাগতিক সার্থকতাকে যেখানে কবি মানবিক সার্থকতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন সেখানে তিনি মানবিক সার্থকতা ও 'তোমা-মাঝে'র সার্থকতাকে এক এবং অভিন্ন করিয়া দেখিয়াছেন। এক 'তোমা'র ইঙ্গিত বহন করিয়াই যে জগতের যাহা কিছু সবই

সত্য এবং সার্থক, এই বিশ্ব-প্রবাহের মধ্যেই যে এক 'তোমা'র 'বিশ্বজোড়া লিপি' 'নৈবেদ্যে'র মধ্যেই আমরা এই সর্বাত্মক অনুভূতিরও প্রকাশ দেখিতে পাই।—

তোমার ইঙ্গিতখানি দেখি নি যখন
ধূলিমুষ্টি ছিল তারে করিয়া গোপন।
যখন দেখেছি আজ, তখনি পুলকে
নিরখি ভুবনময় আঁধারে আলোকে
জ্বলে সে ইঙ্গিত ; শাখে শাখে ফুলে ফুলে
ফুটে সে ইঙ্গিত ; সমুদ্রের কূলে কূলে
ধরিত্রীর তটে তটে চিহ্ন আঁকি ধায়
ফেনাঙ্কিত তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
দ্রুত সে ইঙ্গিত ; শুভ্রশীর্ষ হিমাদ্রির
শৃঙ্গে শৃঙ্গে ঊর্ধ্বমুখে জাগি রহে স্থির
স্তব্ধ সে ইঙ্গিত।

জড় জগতের সর্বত্র যেমন সেই এক 'তোমা'রই ইঙ্গিত, ঠিক তেমনই আবার—

মোর মনুষ্যত্ব সে যে তোমারি প্রতিমা,
আত্মার মহত্ত্বে মম তোমারি মহিমা
মহেশ্বর।

'নৈবেদ্যে'র অনেকগুলি কবিতায় কবি 'আমি'কে কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া 'তুমি'কে কেন্দ্রানুগ করিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, আবার এই কেন্দ্রানুগ 'তুমি'কেই পাশাপাশি কবিতায় কেন্দ্রাতিগ করিয়া দেখিয়াছেন। ২৮ সংখ্যক কবিতায় বলিয়াছেন—

তুমি তবে এসো নাথ, বোসো শুভক্ষণে
দেহে মনে গাঁথা এই মহা সিংহাসনে।
মোর দু নয়নে ব্যাপ্ত এই নীলাম্বরে
কোনো শূন্য রাখিয়ো না আর-কারো তরে,

আমার সাগরে শৈলে কান্তারে কাননে,
আমার হৃদয়ে দেহে, সজনে নির্জনে।

কিন্তু পরের কবিতাতেই দেখি—

হে বিশ্বভুবনহীন নিঃশব্দ আসনে
একা তুমি বস আসি পরম নির্জনে।

৩৪ সংখ্যক কবিতায় কবির অনুভূতি—

তুমি থাক, যেথায় সবাই
সহজে খুঁজিয়া পায় নিজ নিজ ঠাঁই।
ক্ষুদ্র রাজা আসে যবে, ভৃত্য উচ্চরবে
হাঁকি কহে, 'সরে যাও, দূরে যাও সবে।'
মহারাজ, তুমি যবে এস সেই সাথে
নিখিল জগৎ আসে তোমারি পশ্চাতে।

এখানে 'তুমি' মহারাজরূপে বিশ্বানুগ হইয়া দেখা দিয়াছেন; তিনি ঠিক বিশ্বানুগ নন, বিশ্ব তাঁহার অনুগ; পরের কবিতাটিতেই কবি 'তুমি'র অন্য রূপ দর্শন করিতে চাহিয়াছেন—সে রূপ হইল বিশ্বাতিগ রূপ—স্তব্ধ প্রাসাদের মধ্যে সেই মহারাজ আপন মহিমায় স্তব্ধ—সেই প্রাসাদের বহিঃপ্রাঙ্গণে আমাদের জগৎলীলা।

চিত্ত মম
মুহূর্তেই পার হয়ে অসীম রজনী
দাঁড়ালো নক্ষত্রলোকে।
হেরিনু তখনি—
খেলিতেছিলাম মোরা অকুণ্ঠিত মনে
তব স্তব্ধ প্রাসাদের অনন্ত প্রাঙ্গণে।

কোনও কোনও কবিতায় আবার দেখি, 'তুমি' তাঁহার নিজের পূর্ণতার মধ্যে একাধারেই কেন্দ্রানুগ আবার কেন্দ্রাতিগ; কেন্দ্রানুগ রূপে 'তুমি'ই নীড়, আর কেন্দ্রাতিগ রূপে 'তুমি'ই আকাশ।—

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড়।
হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম সুনিবিড়
প্রতিক্ষণে নানা বর্ণে নানা গন্ধ গীতে
মুগ্ধ প্রাণ বেষ্টন করেছে চারিভিতে।

… … …

তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ,
অপার সঞ্চারক্ষেত্র, সেথা শুভ্র ভাস;
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জনপ্রাণী,
বর্ণ নাই গন্ধ নাই—নাই নাই বাণী।

'খেয়া'র রচনাকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স চুয়াল্লিশ—এ বয়সটাকে ঠিক খেয়া পাড়ি দিবার বয়স বলা চলে না; কিন্তু এই সময়েই দেখি রবীন্দ্রনাথের জীবনে পরপারের একটি ঘোমটা-পরা মন-ভুলানো ছায়া আসিয়া দেখা দিল। ইহার কারণ অতি স্পষ্ট বলিয়া মনে হয়। জীবনকে কবি জীবনের প্রথম দিন হইতেই অত্যন্ত ভালোবাসিতেন; যেখানে অত্যন্ত ভালোবাসা সেখানেই আবার হারাইয়া যাইবার অত্যন্ত ভয়। জীবনের প্রতি গভীর মায়া ছিল বলিয়া একটা মৃত্যুচেতনাও কবিকে প্রথম যুগ হইতেই পাইয়া বসিয়াছিল, উহার পিছনে ছিল হারাই হারাই ভয়। 'খেয়া'য় আসিয়া ভয়ের উপরে 'সোনার কূলে আঁধার মূলে কোন্ মায়া'র ছোঁয়া লাগিয়া গেল। সমস্ত কবিতার মধ্যেই দেখি চেতনার মধ্যে একটা গোধূলির ছায়া—সে ছায়ায় সর্বত্রই একটা রহস্যের অস্পষ্টতা। নিজের জীবন সম্বন্ধে কবির মনে হইয়াছে—

আমি শরৎশেষের মেঘের মতো
তোমার গগনকোণে
সদাই ফিরি অকারণে।

কিন্তু ইহার মধ্যেও কবির মনে এ-চেতনা জাগিয়া উঠিয়াছে—জীবনে এখনও পরমের পূর্ণ স্পর্শ লাগে নাই, এবং এখনও—

তোমা হতে পৃথক হয়ে
বৎসর মাস গনি।

কিন্তু জীবনের কূলে বসিয়া পূর্ণ মিলনের জন্য বৎসর মাস গণনা করিতে কবির কোনও অধৈর্য নাই।

ওগো, এমনি তোমার ইচ্ছা যদি,
এমনি খেলা তব,
তবে খেলাও নব নব।
লয়ে আমার তুচ্ছ কণিক
ক্ষণিকতা গো—
সাজাও তারে বর্ণে বর্ণে,
ডুবাও তারে তোমার স্বর্ণে
বায়ুর স্রোতে ভাসিয়ে তারে
খেলাও যথা-তথা।
শূন্য আমায় নিয়ে রচ
নিত্য বিচিত্রতা।—লীলা

তাহার পরে—

ওগো, আবার যবে ইচ্ছা হবে
সাঙ্গ কোরো খেলা
ঘোর নিশীথ রাত্রি বেলা।

'খেয়া'র পূর্বে কবিকে একবার আমরা 'সোনার তরী'তে দেখিয়াছি, সেখানে জীবনের যাত্রাকে কবি খানিকটা দেখিয়াছিলেন নিরুদ্দেশ-যাত্রা বলিয়া এবং সেই 'সোনার তরী'তে কাণ্ডারী ছিলেন এক অপরিচিতা সুন্দরী; 'খেয়া'র তরীতে সেই সুন্দরীই আজ দেখা দিয়াছে খেয়ার 'নেয়ে' রূপে।

তুমি এ পার ও পার কর কে গো,
ওগো খেয়ার নেয়ে।

'সোনার তরী'র অপরিচিতা সুন্দরীর মুখে কোনও বাণী ছিল না, কিন্তু অবগুণ্ঠনের আড়ালে চোখে ছিল তাহার ইঙ্গিতপূর্ণ

চাহনি—সেই চাহনিতেই ছিল জীবনযাত্রার নির্দেশ। এখানেও পাই—

দেখি তোমার মুখে কথাটি নেই,
ওগো খেয়ার নেয়ে।
কী যে তোমার চোখে লেখা আছে
দেখি যে তাই চেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে।
আমার মুখে ক্ষণতরে
যদি তোমার আঁখি পড়ে
আমি তখন মনে করি
আমিও যাই ধেয়ে,
ওগো খেয়ার নেয়ে।

১৭

অনুভূতি এবং তাহার প্রকাশ এই উভয়েরই একটি ধর্মীয় রূপান্তর আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে 'গীতাঞ্জলি'র মধ্যে। এই যে ধর্মীয় রূপান্তরের কথা বলিতেছি আবার ইহার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ব্যাখ্যা প্রয়োজন এই জন্য যে, আরম্ভেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, কবি বারংবার বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার কবি-অনুভূতি আর ধর্ম-অনুভূতির মধ্যে জীবনে কোনও দিনই কোনও তফাৎবাদ করিতে পারেন নাই। এ-কথাও অনেকবার বলিয়াছেন যে কবিতা ও গানের পথ ধরিয়াই ধর্মানুভূতি তাঁহার কাছে আসিয়াছে। তবে আবার থাকিয়া থাকিয়া রবীন্দ্রনাথের কবি-অনুভূতির ধর্ম-অনুভূতিতে পরিবর্তনের কথা বলিতেছি কেন—প্রকাশভঙ্গিতেই বা ধর্মীয় পরিবর্তনের কথা বলিতেছি কেন? আমরা এখানে রূপান্তরের ভিতর দিয়া যে পার্থক্যের ইঙ্গিত

করিতেছি তাহা হইল এই যে, কবির সত্যবোধ যেখানে জগৎ এবং জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া আছে তখন কবির বোধ বা অনুভূতিকে আমরা কবি-অনুভূতি বলিয়াই নির্দেশ করি। কিন্তু সত্যবোধ বা সত্যানুভূতির ক্ষেত্রে যেখানে সংসার একেবারে উবিয়া না গেলেও অনেকখানি পিছনে পড়িয়া যায় তখনই আমরা সেই-জাতীয় অনুভূতি ও প্রকাশভঙ্গিকে বিশেষ করিয়া ধর্মীয় আওতার জিনিস বলিয়া বর্ণিত করিতে চাই। 'গীতাঞ্জলি'তে 'তুমি' স্থানে স্থানে জগতে ও জীবনে সর্বাতিশয়ী হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাহাই নয়; 'তুমি' এখানে শুধু 'পরম পুরুষ' নহেন—'তুমি' এখানে পরম নাথ—পরম দয়িত। স্থানে স্থানে এখানে আত্মসমর্পণ এবং প্রেম-নিবেদনের ভিতর দিয়া পরম প্রেমময় দয়িত কবির দৃষ্টিতে ও প্রকাশভঙ্গিতে একটা বৈষ্ণবতার লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছে।

বেদনা দূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।'

এখানে প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারি 'ভগবান' কথাটি, যাহা পূর্ববর্তী যুগে বা পরবর্তী যুগে রবীন্দ্রনাথ বড় ব্যবহার করিতে চাহিতেন না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অবশ্য 'তোমার লাগি জাগেন ভগবান' কথাটির তাৎপর্য হইল, প্রত্যেক ব্যক্তিজীবনের মধ্যে পরম পুরুষ তাঁহার একটি বিশেষ প্রকাশ-ইচ্ছাকে কালে কালে তরঙ্গিত করিয়া দিয়া নিজে প্রতি মুহূর্তে তাহার রূপায়ণ লক্ষ্য করিতেছেন এবং সেই প্রকাশ-তরঙ্গের অভিঘাতে অভিঘাতে নিজের আনন্দ-সত্তাকে ঘনীভূত করিয়া অনুভব করিতেছেন; ব্যক্তিজীবনের ভিতর দিয়া তিনি যেন এই প্রকাশ-ইচ্ছার একটি পরিপূর্ণতা চান—সেই

পরিপূর্ণতার ভিতরেই 'তাঁহা'র সঙ্গে 'আমা'র প্রেম-মিলনের পরিপূর্ণতা। জীবনের গভীর বেদনা দ্বারা এই বোধেই আমরা ক্ষণে ক্ষণে উদ্বোধিত হইয়া উঠি, তাই এই গভীর বেদনাই 'তাঁহা'র মধ্যে আর 'আমা'র মধ্যে দূতী। কিন্তু অর্থ যাহাই হোক, 'তাঁহা'র ও 'আমা'র সঙ্গে এই প্রেমলীলার মধ্যে ঐ 'দূতী'টিকে লক্ষ্য করিতে হইবে, ভগবানের 'জাগিয়া থাকা' কথাটি লক্ষ্য করিতে হইবে, আর লক্ষ্য করিতে হইবে 'নিশীথ ঘন অন্ধকারে প্রেমাভিসারে'র কথা,—সেই প্রেমাভিসারের জন্য যে তিনি 'ডাকিতেছেন' সে কথাটিও প্রণিধান করিতে হইবে; তবেই 'তুমি' ও 'আমি' বা 'তিনি' ও 'আমি'কে অবলম্বন করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি'র যুগে কতখানি বৈষ্ণবপন্থী হইয়া উঠিয়াছেন তাহা বোঝা যাইবে।

ভারতীয় প্রেমভক্তি ধারার আরও একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে। সকল প্রকার প্রপত্তিবাদ্ সত্ত্বেও বৈষ্ণবসাধক এবং কবি-গণের মধ্যে এই একটি বিশ্বাসের অভিমান দেখিতে পাই যে—'আমি'ই যে শুধু 'তাঁহা'কে চাই তাহা নহে, তিনিও আমাকে চাহেন; আমার তাঁহাকে যেমন দরকার তাঁহারও আমাকে ঠিক তেমন করিয়াই দরকার; এই জন্য প্রেমের ব্যাকুলতা—মিলনের ব্যাকুলতা উভয়তঃই সমান। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও 'আমি' ও 'তুমি'র নিত্য-অন্যোন্যাশ্রয়ের বোধের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি; তাঁহাকে আমার প্রয়োজন তাঁহার মধ্যে আমার চরম সার্থকতা বলিয়া, আমাকেও আবার তাঁহার সমভাবে নিত্যপ্রয়োজন। আমার ভিতর দিয়া তাঁহার ভিতরকার যে তিনি সেই তিনিকে অনন্ত রূপে-রসে সৌন্দর্যে-মাধুর্যে আবিষ্কার ও আস্বাদন করিবার জন্য। সেই জন্যই ত দেখি—

জানি জানি কোন্ আদিকাল হতে
ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে,—

কিন্তু আমাকে তিনি এই কালস্রোতে কি একেবারেই একা একা

ভাসাইয়া দিলেন? আমাকে জীবনস্রোতে বা কালস্রোতে ভাসাইয়া দিয়া তিনি কোথায় আছেন?—

কতবার তুমি মেঘের আড়ালে
এমনি মধুর হাসিয়া দাঁড়ালে,
অরুণ-কিরণে চরণ বাড়ালে,
ললাটে রাখিলে শুভ পরশন।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ইহাই হইল লীলা। এই প্রাকৃতকোটিকে অতিক্রম করিয়া কোনও অপ্রাকৃতকোটিতে লীলা নয়—প্রাকৃতকোটির প্রত্যেক স্তরে স্তরে প্রত্যেক পলে পলে যে তাঁহাতে আমাতে লীলা রহিয়াছে ইহাই রবীন্দ্রনাথের অভিনব লীলাবাদ।

পরমসত্য পরমভাবে হইয়া উঠিবার জন্যই তাহার অসীম অনন্ত প্রকাশ-ইচ্ছার একটি কণা দিয়া আমাকে তাঁহা হইতে পৃথক্ করিয়া দিয়া জীবনস্রোতে যাত্রা করাইয়া দিয়াছেন; জীবনের যুগযুগান্তের বিবর্তনধারায় 'আমি' জড় প্রকৃতির ভিতর দিয়া চৈতন্যের মধ্যে সৌন্দর্যে জ্ঞানে প্রেমে নিখিল বিশ্বের বিস্ময় হইয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল; এই আমার নিত্য বিবর্তন চলিবে আরও আরও পূর্ণতার মধ্যে—সেই দিনই আবার তাঁহার সঙ্গে আমার মিলন; সেই মিলনের জন্যই তিনিও আমার জীবনের পথ অনুসরণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন আমার মধ্যে প্রকাশের পরিপূর্ণতার ভিতর দিয়া আমার সঙ্গে তাঁহার মিলনের জন্য।—

আমার মিলন লাগি তুমি
আসছ কবে থেকে।
তোমার চন্দ্র সূর্য তোমায়
রাখবে কোথায় ঢেকে।
কত কালের সকাল-সাঁঝে
তোমার চরণধ্বনি বাজে,
গোপনে দূত হৃদয় মাঝে
গেছে আমায় ডেকে

চন্দ্র-সূর্য যত বড় হোক, যত জ্যোতিষ্মান্ হোক—চৈতন্যের উদ্ভাসে মানুষ যে আরও অনেক বড়—অনেক বেশি জ্যোতিষ্মান্। চন্দ্র-সূর্যের মধ্যে এক জ্যোতিঃ—আর মানুষের চিত্তে অনন্ত বৈচিত্র্যে অনন্ত জ্যোতিঃ ; তাই এই সৃষ্টিপ্রবাহের ভিতর দিয়া এই যে চৈতন্যের মহৎ ঐশ্বর্যে তাঁহার দোসর আমি—এই 'আমি'র জন্যেই যে তাঁহারও প্রেমযাত্রা—চন্দ্রসূর্যেরও সেখানে বাধা জন্মাইবার অধিকার নাই। বিশ্বদেবতা তিনি—বিশ্বের রাজাধিরাজ; ছিলেন সেই রাজাধিরাজের আসনেই আসীন ; কিন্তু সেখানে তৃপ্তি মেলে নাই। সমগ্র সৃষ্টি-প্রবাহের ভিতর দিয়া যে পর্যন্ত একটি অনন্ত মধুর 'আমি' জাগিয়া না উঠিয়াছে সে পর্যন্ত সেই রাজাধিরাজের আসল মহিমা যে উদ্‌ঘোষিত হয় নাই। যখন বিশ্বসংসারের মধ্যে কোনও একটি বিজন ঘরে অমনি একটি 'আমি' জাগিয়া উঠিয়াছে তখন—

তব সিংহাসনের আসন হতে
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।

বিশ্বের রাজাধিরাজ নিজে যখন সিংহাসন হইতে প্রেমের ভিখারি হইয়া নামিয়া আসিয়াছেন তখন আর বড় বড় দ্বারি-প্রহরী চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র তাঁহাকে কোথায় ঢাকিয়া রাখিবে। জড়কে তিনি দ্বারীর অধিকার দিয়াছেন—প্রেমের মিলন যে গোপনে মানুষের সঙ্গে। তাই সেই ব্যক্তি-মানুষ একটি গভীরভাবে 'আমি' হইয়া যেদিন তাহার বিজন ঘরে বসিয়াই 'একলা বসে আপন মনে' গান গাহিতে আরম্ভ করে তখন যে 'বিশ্বতানের মাঝে'ই অপূর্ব 'একটি করুণস্বর' লাগিয়া যায়,—আর অমনি—

হাতে লয়ে বরণমালা
এলে তুমি নেমে,
মোর বিজন ঘরের দ্বারের কাছে
দাঁড়ালে নাথ থেমে।

যে বিশ্বাসটি কবিকে কোনও পরলোকে মুক্তির বা সুখাবস্থিতির লোভ দেখায় নাই—কবিকে জীবনপ্রেরণা দান করিয়াছে—তাহা হইল 'আমা'র জীবনের প্রতি পদে প্রতি পলে তাঁহার নামিয়া আসিবার বিশ্বাস। সেই নামিয়া আসিবার পদধ্বনি জগতে আর কে শুনিয়াছে—কে শোনে নাই তাহা কবিমনকে বিচলিত করে নাই, তিনি নিজের ভিতরে সে ধ্বনি ঠিক শুনিতে পাইয়াছেন।—

> তোরা শুনিস্ নি কি শুনিস্ নি তার পায়ের ধ্বনি,
> ঐ যে আসে, আসে, আসে।
> যুগে যুগে পলে পলে দিনরজনী
> সে যে আসে, আসে, আসে।

ফাল্গুনের বনের পথেও আসে, 'শ্রাবণ অন্ধকারে মেঘের রথে'ও আসে, পরম দুঃখেও আসে—পরম সুখেও আসে। এই আসার অর্থ কি? এই সকলের ভিতর দিয়া প্রতি পদে প্রতি পলে আমার ভিতরকার আমিও নিরন্তর হইয়া উঠিতেছি—আমার হইয়া ওঠাকে লইয়া তিনিও হইয়া উঠিতেছেন। আমার সব কিছুর ভিতর দিয়া তাঁহার হইয়া ওঠাই হইল আমার সব কিছুর ভিতর দিয়া তাঁহার কেবলই আমার কাছে আসা। কিন্তু মনে হয়, এই যুগে শুধু এই অর্থটাই কবিকে জীবন-প্রেরণা দান করে নাই, অর্থটা 'তুমি' ও আমির মধ্যে যেরূপ একটা ব্যক্তিগত প্রেমসম্বন্ধের গভীরতায় প্রকাশ লাভ করিয়াছে তাহার প্রভাবটাও এ-যুগে কবি-মানসে বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল।

নিজের ব্যক্তিজীবনকে লইয়া বিশ্বের অন্তর্নিহিত পরমপুরুষের সহিত যে একটি ব্যক্তিগত প্রেমসম্বন্ধের ঘনিষ্ঠতা তাহাকে যে কবি এই যুগে কত নিবিড় করিয়া পাইতে চাহিয়াছেন 'গীতাঞ্জলি'র বহু গানের মধ্যেই তাহার পরিচয় মধুর হইয়া দেখা দিয়াছে। এই জীবনে কবি উপর্যুপরি কতগুলি শোক লাভ করিয়াছেন। প্রথমে

স্ত্রীর মৃত্যু, তাহার পরে কন্যার মৃত্যু; যতবার যত রকম করিয়া নীড় বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিলেন কেবলই তাহা ভাঙিয়া ভাঙিয়া যাইতেছিল। উপর্যুপরি মর্ত্যবিরহের দ্বারা বুকের মধ্যে কেবলই যে ফাঁক জমা হইতেছিল সেই ফাঁকই কি কবি ভরিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন পরম দয়িতের সহিত ব্যক্তিগত প্রেম-সম্বন্ধকে যতটা সম্ভব নিবিড় করিয়া? এই নিবিড়তার প্রলোভনে কবি 'তুমি'কে স্থানে স্থানে পাইতে চাহিয়াছেন একেবারে একলাটি করিয়া।—

> কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি
> যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে;
> ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী
> কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।

একটি ব্যক্তিজীবন-প্রবাহই এখানে তরী; সে তরীতে তিনি আছেন একটি বিশেষ আত্মপ্রকাশ-ইচ্ছা লইয়া—আর আমি আছি সেই ইচ্ছাকে আমার দেহ-প্রাণ-মন সকলের ভিতর দিয়া মূর্তি দান করিবার চেষ্টায়। এখানে দেখিতেছি, উভয়ের চেষ্টা লইয়া যে একটি একতানতা তাহাকে কবি একেবারে একান্তে অনুভব করিতে চাহেন, এ যেন একটা ঐকান্তিক অধ্যাত্মজীবন লাভেরই কামনা। অধ্যাত্ম-অনুভূতিকেই একান্তে ঘনীভূত করিয়া লইয়া হৃদয় ভরিয়া তুলিবার চেষ্টা। আসল কথাটি হইল—

> শুধু তোমার বাণী নয় গো,
> হে বন্ধু, হে প্রিয়,
> মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
> পরশখানি দিয়ো।
> ... ...
> এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায়
> সেই কথা বলিয়ো॥—গীতালি

জীবনের সকল অন্ধকার পূর্ণ করিয়া সকল ফাঁক ভরিয়া লইতে

হইবে, তাই প্রেমঘন একটি তুমি চাই—যে তুমি কথা বলে, স্পর্শ করে এমন তুমি চাই—অন্তরের একান্তে তাঁহাকে ঘনিষ্ঠ করিয়া চাই।

'চিত্রা'র 'জীবনদেবতা' কবিতার প্রথমেই জীবনদেবতার নিকটে কবির যে প্রশ্ন দেখিয়া আসিয়াছি তাহাই একটি স্পষ্ট অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসার রূপ গ্রহণ করিয়াছে 'গীতাঞ্জলি'র নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটির মধ্যে।—

হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ
কী অমৃত তুমি চাহ করিবারে পান।
আমার নয়নে তোমার বিশ্বছবি
দেখিয়া লইতে সাধ যায় তব কবি,
আমার মুগ্ধ শ্রবণে নীরব রহি
শুনিয়া লইতে চাহ আপনার গান!
... .
আমার চিত্তে তোমার সৃষ্টিখানি
রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বাণী।
... ...
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে
আমার মাঝারে নিজেরে করিয়া দান।

'আমি' ও 'তুমি'কে লইয়া রবীন্দ্রনাথের যত অনুভূতি ও মনন তাহার সবটা একটি নিটোল মুক্তার ঐশ্বর্যে ও লাবণ্যে সংহত হইয়া উঠিয়াছে এই গানটির মধ্যে। পরম নির্বিশেষ দেবতা ব্যক্তিকেন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া তবে নিজের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া নিজের সন্ধান পাইতেছেন। পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, আমি যে আমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ইহার আর জুড়ি নাই—এ আমি তাহার সম্পূর্ণ অভিনবত্বে বিশ্বের বিস্ময়। এ আমির দেহ প্রাণ মনের ভিতর দিয়া জাগিয়া উঠিতেছে যে জীবনামৃত সেই বিশেষ জীবনামৃত পান করিবার লালসায়ই ত এই

আমিকে দেবতা এমনই বিশেষ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এই দুই চোখে বিশ্বকে যেমন করিয়া দেখা এমন করিয়া বিশ্বকে কেহ আর কখনও দেখে নাই, বিধাতার কাছেও বিশ্বের এই যে একটি বিশেষ সৌন্দর্য-মাধুর্য আমার আবির্ভাবের পূর্বে তাহা একান্তভাবেই অজ্ঞাত ছিল। এই আমার দুই শ্রবণের মধ্য দিয়া বিশ্বের গান যে রমণীয়ত্ব লাভ করিয়াছে সে রমণীয়ত্ব আমার আবির্ভাবের পূর্বে কোনও দিন জাগিয়াই ওঠে নাই। যদিও মূলে সে গান বিধাতারই গান, কিন্তু যে পর্যন্ত আমার কানে আসিয়া সে গান না পৌঁছিয়াছে সে পর্যন্ত আমার শ্রবণের ভিতরে জাত যে তাহার বিশেষ মধুরিমা তাহা বিধাতার কাছেও প্রকাশ ছিল না। সুতরাং এই বিশেষ 'আমি'টির যোগে বিশ্বসৃষ্টিতে একটি নূতন বিচিত্র বাণী জাগিয়া উঠিতেছে—সৃষ্টির সেই বিশেষ বাণী বিধাতার কাছে আমারই দান—এইখানেই আমার অপূর্বত্ব—এইখানেই আমার পরম মূল্য—পরম গর্ব। এই পরম মূল্যের জন্যই ত বিশ্বের দেবতা 'রাজার রাজা' হইয়াও আমার কাছে নামিয়া আসিয়াছেন—নিত্য 'কত মনোহরণ বেশে' আমার চারিপাশে এই দানের জন্য ফিরিতেছেন—নিত্য জাগিতেছেন আমাকে ঘিরিয়া।—

> তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
> তুমি তাই এসেছ নীচে
> আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,
> তোমার প্রেম হত যে মিছে।

তিনি নিজে যত বড় ঐশ্বর্যশালীই হোন না কেন, যত প্রেমময়ই হোন না কেন, আমি না থাকিলে যে তাঁহার সকল ঐশ্বর্য সকল প্রেম তাঁহার নিজের কাছেই মিথ্যা হইয়া যাইত, আমার ভিতর দিয়াই ত এত ঐশ্বর্য এত প্রেমের অনুভব। তিনি যে পূর্ণস্বরূপ, সেই পূর্ণস্বরূপতার উপলব্ধির জন্যই যুগল-সম্মিলন চাই—

মূর্তি তোমার যুগল-সম্মিলনে
সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।

এই গর্ব এবং আনন্দের কথা কবি সোল্লাসে প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহার অন্য অনেক গানে গানে—

আমায় তুমি করবে দাতা,
আপনি ভিক্ষু হবে—
বিশ্বভুবন মাতল যে তাই
হাসির কলরবে।
তুমি রইবে না ওই রথে,
নামবে ধূলাপথে,
যুগ-যুগান্ত আমার সাথে
চলবে হেঁটে হেঁটে ॥

এইটি যেমন হইল কবি রবীন্দ্রনাথের চরম গর্বের কথা, আবার এইটিই হইল রবীন্দ্রনাথের চরম আত্মনিবেদনেরও কথা। নিজের সমস্তখানি মূল্য শুধু একমাত্র তাঁহার মধ্যেই অনুভব করা।

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।
এই ঘরে সব খুলে যাবে দ্বার,
ঘুচে যাবে সকল অহংকার,
আনন্দময় তোমার এ সংসারে
আমার কিছু আর বাকি না রবে।

'গীতাঞ্জলি'র ভিতরকার কবির যে মনোভাব তাহারই বিস্তার দেখিতে পাই কবির 'গীতিমাল্যে' এবং 'গীতালিতে'। শুধু এই যুগটাতেই নয়, সমস্ত গানের মধ্যে কবির মূল রাগিণী যেন একটিই —তান-বৈচিত্র্যে কেবলই যেন তাহারই বিস্তার। 'গীতিমাল্য', 'গীতালি'কে তাই পৃথক্ কবিতার বই না বলিয়াই 'গীতাঞ্জলি'রই বিস্তার বলিতে ইচ্ছা হয়। যে কথা ও সুর প্রধান হইয়া উঠিয়াছে 'গীতাঞ্জলি'র গানে তাহাই আবার নানাভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখা

দিয়াছে এখানকার গানে। এখানেও দেখি 'তুমি' ও 'আমি' মিলিয়া একান্তে নিভৃত লীলার আকর্ষণ।

"ওগো পথিক, দিনের শেষে
চলেছ যে এমন হেসে,
কিসের বিলাস সেইখানে?"
"কে জানে ভাই, কে জানে।
জগৎ জোড়া সেই সে ঘরে
কেবল দুটি মানুষ ধরে
আর সেখানে ঠাঁই নাহি তো কিছুরি;
সেথা মেঘের কোণে কোণে
কেবল দেখি ক্ষণে ক্ষণে
একটি নাচে আনন্দময় বিজুরি।"

—গীতিমাল্য, ১১ সং

বিশ্বসৃষ্টির সহিত এক সঙ্গে যে কবির জীবনধারার একটি ইতিহাস এবং সেই সমগ্র ইতিহাস যে শুধু একটা 'এই যে তুমি'-কে খুঁজিয়া বেড়াইবার ইতিহাস তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা চমৎকারভাবে দেখা গিয়াছে ১৪ সংখ্যক কবিতাটিতে।

অনেককালের যাত্রা আমার
অনেক দূরের পথে,
প্রথম বাহির হয়েছিলেম
প্রথম-আলোর রথে।
গ্রহে তারায় বেঁকে বেঁকে
পথের চিহ্ন এলেম এঁকে
কত যে লোক-লোকান্তরের
অরণ্যে পর্বতে।

প্রথম আলোর স্পন্দনের ভিতরে সূচিত হইয়াছিল বিশ্বসৃষ্টির প্রথম স্পন্দন। কবির বিশ্বাস, সর্বপ্রকার অনস্তিত্বের অন্ধকার ভেদ করিয়া এই আলোর স্পন্দন যেদিন সৃষ্টি-প্রবাহের সূচনা

করিয়াছিল সেই দিনই কবিরও সৃষ্টির মধ্যেই একটি বিশেষ সত্যের বাহনরূপে অস্তিত্বের অফুরন্ত তীর্থযাত্রার সূচনা। তাহার পরে কত দিন কত গ্রহ কত নক্ষত্রের সঙ্গে এক হইয়া এই কবিসত্তা কত সবিতৃমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া আসিয়াছে; কত লোক-লোকান্তরের অরণ্য-পর্বত পার হইয়া—জড়ের সকল বাধাকে অতিক্রম করিয়া এই বিশেষ ব্যক্তিসত্তা প্রাণে মুক্তি লাভ করিয়াছে,—প্রাণের মুক্তি চেতনায়—চেতনার ইতিহাসে দেখি—

> "এই যে তুমি" এই কথাটি
> বলব আমি ব'লে
> কত দিকেই চোখ ফেরালেম
> কত পথেই চ'লে।
> ভরিয়ে জগৎ লক্ষ ধারায়
> "আছ আছ"র স্রোত বহে যায়
> "কই তুমি কই" এই কাঁদনের
> নয়নজলে গ'লে।

'গীতিমাল্যে'র বাইশসংখ্যক পদে দেখি, কবির ব্যক্তি-জীবনটি যেন ছোট একটি বাঁশী। একটি রাখাল যেমন কত পাহাড়িয়া পথে—কত নদীর তীরে সঙ্গের ছোট বাঁশীটি বাজাইয়া ঘুরিয়া ফেরে, জীবন-ধারার সঙ্গে জড়িত পরমপুরুষও লীলাময় হইয়া ধারণ করেন অমনি একটি ঘুরিয়া-বেড়ানো রাখালের বেশ, হাতে তাহার এই ব্যক্তি-জীবনের বাঁশী। বাঁশীতে যে সুর বাজে সে সুর বাঁশীর নয়, যে বাজায় তাহার; কিন্তু বাঁশী না হইলে শুধু বাজাইবার লোক থাকিলেই সুর কখনও বাজে না; সুতরাং সুর যে বাজায় তাহারও বটে, আবার বাঁশীরও বটে। জীবনের বাঁশীর সুরও ঠিক তাই। এইজন্যই *The Religion of Man* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"The Creation in me is his as well as mine."

এই জীবন-বাঁশীতে জীবনের রাখাল ভরিয়া দিয়াছেন অশেষ সুর, কারণ লীলা যে তাঁহার অশেষ।

আমারে তুমি অশেষ করেছ
এমনি লীলা তব।
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ
জীবন নব নব।
কত যে গিরি কত যে নদীতীরে
বেড়ালে বহি ছোটো এ বাঁশিটিরে,
কত যে তান বাজালে ফিরে ফিরে
কাহারে তাহা কব।

এই অশেষ লীলার অশেষ বিস্ময়ই ফুটিয়া উঠিয়াছে কবির অপর একটি গানে—

তুমি একলা ঘরে বসে বসে কী সুর বাজালে
প্রভু, আমার জীবনে!
তোমার পরশরতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে
প্রভু, গভীর গোপনে॥

একটি কবিরূপে রবীন্দ্রনাথ প্রথম যেদিন ধরায় চোখ মেলিলেন সেইদিন হইতেই সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতি পরম বিস্ময়ে যেন তাঁহার চারিপাশে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বিশ্বপ্রকৃতি যেন বুঝিতে পারিল, পরম পুরুষের সহিত তাহার পরিপূর্ণ মিলন সম্ভব নয়, সে মিলন সম্ভব এইরূপ অসীম-বেদনশীল একটি চৈতন্যের মধ্যেই। তখন প্রকৃতি শুধু সর্বরকমে চেষ্টা করিতে লাগিল এই অসীম-বেদনশীল ব্যক্তি-চৈতন্যের সঙ্গে পরম চৈতন্যের মিলনকে কত সুন্দর কত পূর্ণ করিয়া তোলা যাইতে পারে তাহারই। এই মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং আয়োজন কেবল কবির নিজের মধ্যে নাই—এই মিলনের আকাঙ্ক্ষা এবং উল্লাস সমগ্র প্রকৃতির মধ্যেই।—

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
ফুল্ল শ্যামল ধরা ॥
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে,
ঊষা এসে পূর্ব দুয়ার খোলে
কলকণ্ঠস্বরা।

কবি বার বারই বলিয়াছেন, এই যে এত 'আলোয় আকাশ ভরা' এই যে নিম্নে 'ফুল্ল শ্যামল ধরা'—এই সকলের মধ্যে যদি এমনতর একটি 'আমি' না থাকিতাম যে এই সকলের পূর্ণ মূল্য দিতে পারে তবে চারিদিকের এই সকল থাকাই ব্যর্থ হইয়া যাইত। সুতরাং আকাশ-ভরা এত আলোর মধ্যে—

তুমি যে চেয়ে আছ আকাশ ভরে
নিশিদিন অনিমেষে দেখছ মোরে।
আমি চোখ এই আলোকে মেলব যবে।
তোমার ওই চেয়ে দেখা সফল হবে,
এ আকাশ দিন গুনিছে তারি তরে।

'আমা'র দেখার ভিতর দিয়াই তোমার দেখা, তাই এত আলোকের মধ্যে 'আমি' যখন বিস্ময়ে আনন্দে জাগিয়া উঠিয়া বলিব 'বাঃ! চারিদিকে কত আলো কত আনন্দ'—তখনই 'তুমি'ও জানিতে পারিবে এত আলোর মহিমা। কবি তাঁহার সমগ্র জীবনের অনুভূতি ও সৃষ্টি দিয়া এইভাবেই নিখিল 'তুমি'কে যেন বিশ্ব-সচেতন এবং তাহার ভিতর দিয়া আত্ম-সচেতন করিয়া তুলিবার—এক কথায় এই 'তুমি'কে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের পণ—

তোমায় সৃষ্টি করব আমি
এই ছিল মোর পণ।

দিনে দিনে করেছিলেম
তারি আয়োজন।
তাই সাজালেম আমার ধুলো,
আমার ক্ষুধাতৃষ্ণাগুলো
আমার যত রঙিন আবেশ,
আমার দুঃস্বপন।

একদিকে যেমন 'তোমা'কে সৃষ্টি করিবার পণ ও আয়োজন, অন্যদিকে তেমনই আবার ব্যাকুলতা 'তোমা'র স্পর্শে নিজের সকল সত্যকে উপলব্ধি করার।—

'তুমি আমায় সৃষ্টি কর'
আজ তোমারে ডাকি,—
'ভাঙো আমার আপন মনের
মায়া-ছায়ার ফাঁকি।
তোমার সত্য তোমার শান্তি,
তোমার শুভ্র অরূপ কান্তি,
তোমার শক্তি, তোমার বহ্নি
ভরুক এ জীবন।' (গীতালি, ৭৯ নং)

এই যুগেই রচিত কবির 'উৎসর্গ'; তাহার ভিতরেও মাঝে মাঝে দেখিতে পাই 'গীতাঞ্জলি'র সুরেরই অনুরণন।

কেবল তব মুখের পানে
চাহিয়া,
বাহির হনু তিমির-রাতে
তরণীখানি বাহিয়া।—২ সং

আবার—

প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব নব পুষ্পদল;...
...নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পুজিতে যাব জগতে জগতে।—৪৬ সং

'বলাকা'য় আসিয়া রবীন্দ্রনাথের কবিতা মস্ত বড় একটা বাঁক ঘুরিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু 'বলাকা'র গতিবাদ আমাদের মধ্যে একটা বাঁধিবুলির 'আধিক্যেতা'য় তাহার 'বেগের আবেগে'র মর্যাদা হারাইতে বসিয়াছে মনে হয়। কথাটাকে আমরা কপ্‌চাইতে কপ্‌চাইতে এমন পর্যায়ে আনিয়া ফেলিয়াছি যেন ইহার পূর্বে রবীন্দ্রনাথের কবিতা একটা স্তৈমিত্যের সঙ্কীর্ণ ঘেরা বাঁধে অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল, পাশ্চাত্যের কবিধর্মী দার্শনিক বের্গসঁ-এর গতিবাদের আকস্মিক ধাক্কায় সে বেড়ার বাঁধ ভাঙিয়া গিয়া কবির ভাবরাশিকে একেবারে নিরুদ্দেশের বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। ফলে এমনতর কথাও সমালোচনার ঘূর্ণাবর্তে ভাসিয়া উঠিতে দেখিয়াছি যে 'বলাকা'র সুর রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে একটা সাময়িক খাপছাড়া সুর।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় গানে স্থিতির সুর কোথাও একান্ত হইয়া দেখা দেয় নাই। প্রথম যুগ হইতেই যে কবিতা ও গান তাহার মধ্যেই গতির কথা দেখি—তাঁহার নিজের ব্যক্তি-প্রবাহের যে অখণ্ডধারা; তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার অন্তর্নিহিত পরম সত্য কেবলই চলিতেছে এবং চলিতে চলিতে কেবলই হইতেছে। আবার এই নিখিল 'আমি'-ধারার সঙ্গে সঙ্গে পরম 'আমি'ও কেবলই চলিতেছে—কেবলই হইতেছে। এই চলা ও হওয়ার কথা তো রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিন হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ দিন পর্যন্তের কথা। প্রেমভক্তির সুরে রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি' 'গীতিমাল্য' 'গীতালি'র মধ্যে 'তুমি-আমি' লইয়া যত গান রচনা করিলেন সেখানেও তো 'তুমি' বা 'আমি' কেহই নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবার সুযোগ পায় নাই, পায়ে হাঁটিয়া দেশে দেশে চলিতে চলিতে প্রেম

ও আনন্দ, অথবা 'তরী'তে উঠিয়া ঘাটে ঘাটে বাহিয়া চলিতে চলিতে প্রেম ও আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ চিরকালই পথের পথিক এবং চলারও তাঁহার শেষ নাই। 'শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে ?' তথাপি যে মাঝে মাঝে শেষের কথা বলিয়াছেন তাহা কবি-জীবনে মানবতার পূর্ণতার একটা প্রেরণাময়ী আশায় ভরা আদর্শ মাত্র। মানুষের জীবনে সে আদর্শের মূল্য গভীর জীবনপ্রেরণায়। এতদিনের এই চলার কথার মধ্যে 'বলাকা'য় আসিয়া পরিবর্তন অবশ্যই লক্ষ্য করা যায়; এখানে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন কোনও গতিবেগ নাই—আছে পুরনো গতির মধ্যে অনেকখানি আবেগ এবং সে আবেগ একেবারে সোজা খাতে দেখা দেয় নাই—বাঁক ঘুরিয়া ঘুরিয়া খাত কাটিয়াছে।

এই নূতন আবেগ এবং বাঁকফেরার ব্যাপারে খানিকটা পাশ্চাত্য প্রভাব যে ছিল না—তাহা নহে; প্রভাব শুধু বের্গসঁ-এর Elan vital বা প্রাণশক্তির তত্ত্বদর্শনের নয়—ইউরোপ-আমেরিকার সবটা জুড়িয়াই একটা নূতন প্রাণশক্তির সবেগ সক্রিয়তা তিনি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছিলেন 'বলাকা' রচনার অব্যবহিত পূর্বে। আমেরিকায় এইবারে প্রথম গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইংলণ্ডে তো ইহার পূর্বে দুইবার আসিয়াছেন ও রহিয়াছেন। কিন্তু সে সমস্ত সময়ে পাশ্চাত্যের জঙ্গম জীবনের শক্তির বেগ এমন করিয়া কবির কাছে ধরা পড়ে নাই। এখন জীবনও প্রৌঢ়ত্বে আসিয়া পৌছিয়াছে, অভিজ্ঞতাও সাধারণীকৃত হইয়া জীবন সম্বন্ধে স্পষ্ট দৃষ্টিদান করিতেছে। ভারতীয় জীবনাদর্শের প্রতি কবি যতখানিই শ্রদ্ধান্বিত থাকুন, শুধু যে আদর্শে মানুষ গড়িয়া ওঠে না, গড়িয়া উঠিবার পিছনে যে প্রাণশক্তি, একটি দুর্বার আবেগ চাই এই কথা কবির মনকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিল। পাশ্চাত্য জঙ্গমজীবনের পাশে আমাদের সনাতন জীবনপ্রথাকে কবির অনেকখানিই স্থাবর বলিয়া

মনে হইতেছিল ; তাই 'আধমরাদের ঘা মেরে' বাঁচাইবার একটা প্রচণ্ড তাগিদ নিজের মনের মধ্যেই উপলব্ধি করিতেছিলেন। জীবনের পথে সনাতন আদর্শের বুলি কপ্‌চাইয়া আমরা যে একেবারে অনড় বিজ্ঞ, অচল সাবধানী হইয়া উঠিতেছিলাম ; ইহারই প্রতিক্রিয়ায় কবিচিত্তে জাগিল আহ্বান—

ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন্‌রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা।

কবির এবারকার পাশ্চাত্য হইতে প্রত্যাবর্তনের কিছু দিন পরে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধিয়া উঠিয়াছিল। কবি কি মনের মধ্যে ইহার আভাস পাইয়াছিলেন ? এই আভাসও কি অবোধপূর্বভাবে তাঁহার চিত্তে চাঞ্চল্যের বেগ সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল ?

কিন্তু এই চাঞ্চল্য এবং বেগের উদ্দামতার সঙ্গে কবির পূর্বমনের তেমন কিছুই যোগ নাই বা তাঁহার চিত্তের স্থিরবদ্ধ জীবনাদর্শ এবং অধ্যাত্মবোধ সবই একেবারে উধাও হইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল এমন কথা মনে করিবার বিন্দুমাত্র কারণ নাই। বরঞ্চ একটি আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, এত ঝড়ের মাতন, এত উদ্দাম উধাও বেগে ধাবনের মধ্যেও 'বলাকা'র মধ্যে অনেকগুলি কবিতা রহিয়াছে যেখানে বিশ্বভুবনের সঙ্গে 'আমি'র সম্বন্ধ এবং 'আমি'র সঙ্গে 'তুমি'র সম্বন্ধ সর্বাপেক্ষা স্পষ্ট এবং সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই-জাতীয় কবিতা লইয়া আলোচনার পূর্বে কবি গতিবেগে অত্যন্তভাবে যেখানে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছেন তাহারই দু-একটি কবিতা লইয়া আলোচনা করা যাক। এ-জাতীয় কবিতার মধ্যে 'চঞ্চলা' কবিতাটিকেই প্রতিনিধি-স্থানীয় বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কবি এখানে বলিলেন, 'চলেছ যে নিরুদ্দেশ সেই চলা তোমার রাগিণী' ; একটু পরেই বলিয়াছেন—

> শুধু ধাও, শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও
> উদ্দাম উধাও ;
> ফিরে নাহি চাও
> যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও।
> কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয় ;
> নাই শোক, নাই ভয়,
> পথের আনন্দবেগে অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।

এখানে যে সন্দেহটি আসিয়া মনে একটি আলোড়নের সৃষ্টি করিতে চায় তাহা হইল এই, কবি কি তাহা হইলে বের্গসঁ প্রভৃতির মত সমগ্র সৃষ্টি জুড়িয়া শুধু একটা 'ধাওয়া'র সত্যতেই বিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছেন, জটামুক্ত জীবন-জাহ্নবীর পিছনকার 'মহাদেবে'র ধ্যান কি একেবারে ভুলিয়া গেলেন। সৃষ্টি কি শুধু—

> বস্তুহীন প্রবাহের প্রচণ্ড আঘাত লেগে
> পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুফেনা ওঠে জেগে ;…

সে ধারার প্রচণ্ড বেগের পিছনে কি কোনও ধ্যান নাই ? সেই ধ্যানে বিশ্বাস যদি কবি এখানে হারাইয়া ফেলিবেন তবে এই 'অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা' কবিকে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনস্রোতের অখণ্ডতার চেতনায় উতলা করিয়া তুলিল কি প্রকারে ? কি করিয়া তিনি এই বোধে আরও গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন—

> যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
>
> চুপে চুপে
> রূপ হতে রূপে
> প্রাণ হতে প্রাণে

যে এমন করিয়া চলিয়া আসিয়াছে সে যে একই 'আমি'—সেই চিরদিনের 'আমি' এ-কথা এত প্রবাহের প্রচণ্ডতার মধ্যেও দেখিতেছি কবি ভুলিয়া যান নাই।

'শা-জাহান' কবিতার মধ্যেও তো সেই একই জীবনদর্শন। তাজমহল যত বড় সৌন্দর্যসৃষ্টিই হোক না কেন, তাহার মধ্য দিয়াই যদি সীমাবদ্ধ করিয়া শা-জাহানের জীবনকে দেখিতে চাই জীবন সম্বন্ধে সে দৃষ্টি তো হইবে মিথ্যাদৃষ্টি, কারণ সে দৃষ্টি যে জীবনের খণ্ডদৃষ্টি। তাজমহল রচনার মতন এত বড় একটা কবিকৃতির মূল্য কোথায়? মূল্য এই এইখানে যে, এই অপূর্ব অদ্ভুত সৌন্দর্যের নব-মেঘদূত সৃষ্টির ভিতর দিয়া শা-জাহানের চিরবিকাশের অভিলাষী ব্যক্তি-শতদলের একটি পাপড়ি চমৎকারভাবে খুলিয়া গেল—বিকাশের পথে জীবন আরও আগাইয়া গেল—মহৎসৃষ্টি ব্যক্তিজীবনকে অনেকখানি হওয়ার পথে টানিয়া লইল। সেই দৃষ্টিই তো জীবনের অখণ্ডপ্রবাহের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে বাঁধিয়া লইবার দৃষ্টি, তাহাই সত্যদৃষ্টি। এই জীবনদর্শনের কথাই তো রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'র পূর্ববর্তী সকল কবিতায় বলিয়া আসিয়াছেন। চলার বেগটাকে কবি অবশ্য এখানে অনেক বড় করিয়া দেখিয়াছেন—মহিমান্বিত করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু সেই বেগ কোনও স্ববিরোধিতায় পর্যবসিত হয় নাই, শুধু জীবনবোধকে বিক্ষুব্ধ উজান হাওয়ায় সচকিত করিয়া দিয়াছে। পূর্বে কবি তাঁহার জীবনের চিরকালের 'তুমি'র উদ্দেশ্যে যেভাবে পূজার আয়োজন করিতেছিলেন সে আয়োজনে নিজেই একটু লজ্জিত হইয়া উঠিয়াছেন।—

তোমার কাছে আরাম চেয়ে
পেলেম শুধু লজ্জা।
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে
পরাও রণসজ্জা।

এই রণসজ্জাতেই এবারে জীবনদেবতার নূতন পূজার আয়োজন। কিন্তু বীণা হাতে করিয়াই হোক, বাঁশী হাতে করিয়াই হোক—আর রণবেশে খড়্গ হাতে করিয়া 'মহা-শঙ্খে'র আহ্বানে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াই হোক—আয়োজন সেই একই পূজার, সে বোধটি অক্ষুণ্ণ দেখিতে পাই।

এই প্রসঙ্গে 'বলাকা'র পাঁচসংখ্যক কবিতাটিকে আমার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কবিতাটির তাৎপর্য যদি নির্ভুলভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়া থাকি তবে বলিব, কবিতাটি 'জীবনদেবতা' পর্যায়েরই একটি চমৎকার কবিতা ; শুধু 'জীবনদেবতা' যে জীবনের এই বাঁকে আসিয়া কিভাবে বেশবদল করিয়াছেন তাহাই সৌৎসুক্যে লক্ষণীয়। এখানকার যিনি জীবনদেবতা তিনি কবিরও যেমন জীবনদেবতা তেমনই বিশ্বমানবের ভিতরকার প্রত্যেকটি মানুষের ভিতরেই তিনি জীবনদেবতা। এই জীবনদেবতা শুধু বসন্তের দিনে বন-উপবনের ফুলসম্ভারের ভিতরেই মানুষকে তাঁহার আহ্বান জানান না, ঝড়ের দিনে মত্ত সাগরের বুকে গহন রাত্রির মধ্যেও জীবনতরীর 'নেয়ে' রূপে তাঁহার আবির্ভাব এবং আহ্বান।

মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে
ঐ যে আমার নেয়ে।
ঝড় বয়েছে, ঝড়ের হাওয়া লাগিয়ে দিয়ে পালে
আসছে তরী বেয়ে।
কালোরাতের কালি-ঢালা ভয়ের বিষম বিষে
আকাশ যেন মূর্ছি পড়ে সাগরসাথে মিশে,
উতল ঢেউয়ের দল খেপেছে, না পায় তারা দিশে,
উধাও চলে ধেয়ে।
হেনকালে এ-দুর্দিনে ভাবল মনে কী সে
কূল ছাড়া মোর নেয়ে।

এই গহনরাত্রির অন্ধকারে ঝড়ের বুকে তিনি যেন সকলকে নূতন

করিয়া বরণ করিয়া লইতে চান। পূর্বেই বলিয়াছি, কবির মনের মধ্যে কোথায় যেন ছিল জগৎজোড়া দুর্দিনের আশঙ্কা; কেমন করিয়া তিনি লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিলেন একটা ঝড়ের সঙ্কেত—একটা যুগসন্ধির অস্থিরতা। কবির মনে হইয়াছে, এবারে জীবন-দেবতা এই ঝড়ের রাত্রের বিক্ষুব্ধতার ভিতর দিয়াই মহামানবের নূতন প্রকাশ চান। এবারের এই যে আহ্বান—এ আহ্বান কোনও বিশেষ মানুষের কাছে নয়, বিশেষ জাতির কাছে নয়—অখ্যাত অজ্ঞাত সকল মানুষের কাছেই। তাই তো—

কার গলাতে নবীন প্রাতে পরিয়ে দেবে হার
নবীন আমার নেয়ে।

মানুষের জীবনদেবতার আজ কাহার গলায় মালা পরাইবার ইচ্ছা? ইঁহাদের বিষয়েই সম্ভবতঃ কবি 'বলাকা' সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এই দলের কত অখ্যাত লোক অজ্ঞাত পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, বলছে প্রভাত হতে আর বিলম্ব নেই। পাখির দল যেমন অরুণোদয়ের আভাস পায়, এরা তেমনি নূতন যুগকে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছে।" ইঁহাদের সম্বন্ধেই কবিতায় বলিয়াছেন—

সে থাকে এক পথের পাশে, অদিনে যার তরে
বাহির হল নেয়ে।
তারি লাগি পাড়ি দিয়ে সবার অগোচরে
আসছে তরী বেয়ে।
রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি,
ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি,
দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি
ছায়াতে ঘর ছেয়ে।
তোমরা যাহার নাম জান না তাহারি নাম ডাকি
ঐ যে আসে নেয়ে।

ঝড়ের মাতনের মধ্যেও কবি নৈরাশ্যবাদী হইয়া উঠিতে পারেন

নাই, এইখানেই তাঁহার বিশ্বাসের জোর। পৃথিবী ঘুরিয়া ঘুরিয়া বহির্বিশ্বের রূঢ় রূপের সহিত যত পরিচয় ঘটিয়াছে, চিত্তের মধ্যে সযত্নে লালিত অনেক সুকোমল ভাবতরুতে শিকড়সহ নাড়া পড়িয়াছে; ফলে জীবন ও জীবনদেবতা সম্বন্ধে কবির দৃষ্টি কেবলই প্রসার লাভ করিয়াছে। জীবনের একটা সহজসীমায় যে বিশ্বাসকে লালন এবং উপভোগ করা গিয়াছে বহির্বিশ্বের ধূলি-ধূসরতা তাপরুক্ষতার মধ্যেও তাহাকে কি করিয়া সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় সেইদিকেই তখন দেখা গেল ব্যাকুল আগ্রহ। এইখানেই 'বলাকা'য় মস্তবড় একটা বাঁক ঘুরিবার কথা। ইহার পূর্ব পর্যন্ত যে বিশ্বমানবের কথা কবি বলিয়াছেন সেখানে সত্যকার মানুষ কোথাও ছিল না এমন কথা বলিব না, কিন্তু সে বিশ্বমানবের রূপ কবি ভাবে-কল্পনায় যত বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন বাস্তবদৃষ্টিতে ততখানি সত্য করিয়া দেখেন নাই। বাস্তবদৃষ্টিতে যে মানুষকে দেশে বিদেশে সর্বত্র দেখিতে পাইলেন তাঁহার মধ্য দিয়াও এক পরম দেবতার পরম প্রকাশের সত্যকে কি করিয়া উপলব্ধি করা যায় কবিচিত্তে প্রবল হইয়া উঠিল তাহারই একটি প্রেরণা। 'বলাকা'র মধ্যে কতকগুলি কবিতায় দেখি পূর্বেকার সেই বিশ্বাসেরই পুনঃস্থাপন।—

আমি শুধু যৌবন তোমার
চিরদিনকার,
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।—১৩

অথবা—

জীবন হতে জীবনে মোর পদ্মটি যে ঘোমটা খুলে খুলে
ফোটে তোমার মানস-সরোবরে—
সূর্যতারা ভিড় ক'রে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় কূলে কূলে
কৌতূহলের ভরে।—৩৩

ইহা 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতিতে যে সব কথা দেখা যায় তাহারই চমৎকার পুনরুচ্চারণ। এক-একটি ব্যক্তি-মন লইয়া জন্ম-জন্মান্তরে পাপড়ি খুলিয়া খুলিয়া বিকশিত হইতেছে এক-একটি পদ্ম—এ পদ্ম ফুটিয়া উঠিবার মানস-সরোবর হইল পরম পুরুষের এক মানস বা মহাচৈতন্য। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি পরম কৌতূহলভরে জড়ের ভিতর দিয়া এই চেতনায় প্রবুদ্ধ ব্যক্তি-কমলকে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে। এই কথাই আমরা দেখিতে পাই পূর্বের সকল বর্ণনাতেও। আবার দেখি ব্যক্তি-মানবকে লইয়া যেমন ব্যক্তি-কমল তেমনই আবার বিশ্বমানবকে লইয়া বিশ্বকমল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে লইয়া ব্রহ্মকমল।

তাই তো আমি জানি
বিপুল বিশ্বভুবনখানি
অকূল মানব-সাগরজলে
কমল টলমল।—৩৫

'বলাকা'র মধ্যেও সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও এই কথাটাই শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিবার চেষ্টা দেখি—

বঁধুর দিঠি মধুর হয়ে আছে
সেই অজানার দেশে।—৪৩

শুধু তাহাই নহে; কবি অনুভব করিয়াছেন, বুদ্ধি লইয়া বিবেচনা লইয়া, আচার লইয়া যতই বিচক্ষণের মত স্থির হইয়া বসিয়া থাকা যায় জীবনের ভার ততই বাড়িয়া উঠিতে থাকে। যেখানে ভারজনিত স্থিরতা সেইখানেই আবর্জনা ও পঙ্কিলতা, সেইখানেই মৃত্যুভয় সেখানেই সতর্ক বুদ্ধির ভার নিমেষে নিমেষে মানুষকে 'সংশয়ের শীতে পক্ককেশে' বৃদ্ধ করিয়া তোলে; অপরপক্ষে—

যখন চলিয়া যাই সে-চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,

বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়।
পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃত পানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।—১৮

'বলাকা'র মধ্যে এই যে এত চলার কথা দেখিতে পাই, সে চলার বেগের মধ্যে যত দুর্বারতাই আসিয়া দেখা দিক না কেন, কবি চলার ভিতরে মূল উদ্দেশ্য হইতে বিচ্যুত তো হনই নাই—বরঞ্চ ইহার ভিতরে দু-একটি কবিতায় এই চলার মূল উদ্দেশ্য অতি সংহত এবং চমৎকার রূপে দেখা দিয়াছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে কবি যতই ভালবাসুন—তাহাকে রহস্যময়ী এবং মহিমময়ী করিয়া স্তুতি করুন, বিশ্বপ্রকৃতির সকল চলার বা বিবর্তনের চরম উৎকর্ষ যে সৃষ্টির বুকে চৈতন্যকে ফুটাইয়া তোলায় এবং চৈতন্যের পরম বিকাশ যে পুরুষ-চৈতন্যে এ-কথাটি কবি কোন যুগে কোন অবস্থাতেই ভুলিতে চাহেন নাই। এই জন্য পাখীর গান যতই সুন্দর যতই মধুর হোক, মানুষের গানের সঙ্গে তাহার কোনও তুলনা হয় না। পাখীর যে গান তাহার সবটুকুই বিধাতা তাহাকে দিয়া দিয়াছেন, তাহার মধ্যে নূতন কিছু সৃষ্টি করিবার তাহার শক্তি নাই। কিন্তু মানুষের পুরুষচৈতন্যের ভিতরে নামিয়া আসিয়াছে বিধাতার অনন্ত সৃষ্টিশক্তি, সেই অনন্ত সৃষ্টিশক্তিতে মানুষ যেমন করিয়া বিধাতার দোসর হইয়া উঠিয়াছে এমন সৃষ্টির মধ্যে আর কেহই পারে নাই। পুরুষচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত মানুষের মধ্যে সৃষ্টির এই অনন্ত শক্তি নিহিত আছে বলিয়াই বিধাতা আর সকলকেই শুধু দেন, আর মানুষের কাছে শুধুই চান। মানুষের কাছে যাহা পান তাহা লইয়া নূতন করিয়া ফিরিয়া যান নিজের মধ্যে—সেখানে দেখেন, মানুষ যে প্রতিটি নূতন সৃষ্টির দান দিয়াছে তাহার প্রত্যেকটিকে লইয়া বিধাতা তাঁহার আত্মচেতনাকে প্রত্যেক-

বার নূতন করিয়া বিচিত্র করিয়া পাইয়াছেন; মানুষকে তিনি দিয়াছিলেন চৈতন্য, সেই চৈতন্যের সম্পদে সামর্থ্যবান্ মানুষ বিধাতাকে নিত্য নূতন সৃষ্টি-দ্বারা প্রতিদান দিয়াছে অনেক বেশী।—

আর সকলেরে তুমি দাও,
শুধু মোর কাছে তুমি চাও।
আমি যাহা দিতে পারি আপন'র প্রেমে,
সিংহাসন হতে নেমে
হাসিমুখে বক্ষে তুলে নাও।
মোর হাতে যাহা দাও
তোমার আপন হাতে তার বেশি ফিরে তুমি পাও।—(২৮ সং)

একের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মসমাহিত 'এক' কেন আবার 'দুই' হইলেন এ-কথার উত্তর সর্বাপেক্ষা চমৎকার হইয়া দেখা দিয়াছে 'বলাকা'র ২৯সংখ্যক কবিতাটিতে। উত্তরটি অতি সহজ এবং সংক্ষিপ্ত।—

যেদিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে ত হয় নি তোমার দেখা।

আপনাকেও দেখা যায় না এমনতর একা—সে যে ভীষণ একা! 'কালের প্রথম কল্পে নিরন্তর অন্ধকারে বসেছ সৃষ্টির ধ্যানে কী ভীষণ একা!' (রোগশয্যায়)। সম্পূর্ণ আত্মসমাহিত ভাব—সে তো ঘুমের অচেতনতা, সেই ঘুমের মধ্যে, সেই অচেতনতার নিখিল শূন্যে 'আনন্দ কুসুম' ফুটিয়া উঠিবে কি করিয়া? একের মধ্যে নিঃশেষ সংহরণের এই ঘুমকে ভাঙিয়া দিবে কে? ভাঙিয়া দিতে পারে একমাত্র 'আমি' আসিয়া। 'আমি'ও সেই একের মধ্যেই ঘুমাইয়া ছিলাম—সেই একের আত্ম-ঈক্ষণের স্পৃহাজনিত স্পন্দন 'আমা'কে জাগাইয়া দিল। তখন—

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ-কুসুম।

আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণ মাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ বার বার এই কথা বলিয়াছেন যে, 'আছি' না হইলে কোন 'আছে'রই কোনও অর্থ হয় না; তাই সমস্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়া 'আমি আছি' বলিয়া যে পর্যন্ত পুরুষ-চৈতন্য সাড়া দিয়া না উঠিতে পারে সে পর্যন্ত কিছুই ছিল না। মানুষের পুরুষ-চৈতন্যের মধ্যে যে রূপ ধরা পড়িল—যে ধরণীর ফুল, আকাশের তারা দেখা দিল, তাহারাই নূতন অর্থ লইয়া বিধাতার মানসে ফিরিয়া গিয়া সার্থক স্পন্দন জাগাইল। মানুষের পুরুষচৈতন্যের ভিতর দিয়া বিধাতার কাছে সার্থক রূপে উপস্থাপিত হইল একদিকে বিশ্বপ্রকৃতি—আর একদিকে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি। সেই অন্তঃ-প্রকৃতির মধ্যে আছে যত সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার স্পন্দন—আছে জীবন-মরণের আলোড়ন, আছে যত হর্ষ-উদ্বেগ, বিষাদ-ব্যাকুলতা—তাহার প্রত্যেকটিই কেবল স্পন্দনে স্পন্দনে বিধাতার ঘুম ভাঙাইয়া দিয়া তাঁহাকে জাগরণের আনন্দে পূর্ণ করিয়া দিতেছে।

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত!
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

এই কথাকেই রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলিয়াছেন এইভাবে—

till at last knowledge gleams out from the dusk
in the infinity of human spirit,
and in that dim-lighted dawn
she speechlessly gazes through the break in the mist
at the vision of Life and of Love
emerging from the tumult of profound pain and joy.

রবীন্দ্রনাথের গভীর অনুভূতির মধ্যে এই কথাটি পরমবিস্ময়কর একটি সত্য হইয়া দেখা দিয়াছিল যে একটি বিশেষ প্রভাতের সূর্যোদয় কবির চৈতন্যের মধ্যে যে সত্যমূল্য লাভ করিয়াছে সেই সত্য কবির সেই মুহূর্তের চৈতন্যের মধ্যেই বিশেষ হইয়া উঠিয়াছিল —সৃষ্টির মধ্যে তাহা আর কোনও দিন কোথাও ছিল না। এইভাবে কবির উপলব্ধির ভিতর দিয়াই বিধাতা তাঁহার সকল ঐশ্বর্য নিজের কাছেই 'নিত্য নব নব' করিয়া পাইয়াছেন।

এমনি করেই দিনে দিনে
আমার চোখে লও যে কিনে
তোমার সূর্যোদয়।
এমনি করেই দিনে দিনে
আপন প্রেমের পরশমণি আপনি যে লও চিনে
আমার পরাণ করি হিরণ্ময়।—৩১

ইহার ঠিক পরের কবিতাটিতে আবার একদিনের একটি সন্ধ্যা তাহার যে মাধুর্য ও মহিমা কবির চিত্তে বিস্তার করিয়া দিয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন—

তোমার ঐ অনন্ত মাঝে এমন সন্ধ্যা হয় নি কোনোকালে,
আর হবে না কভু।
এমনি করেই প্রভু
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।

কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, 'গীতাঞ্জলি' প্রভৃতির মধ্যে এই অধ্যাত্ম-

বিশ্বাস যেরূপ একটানা সুরে প্রকাশিত হইয়াছে, 'বলাকা'র ভিতরে তাহা হয় নাই। জীবনের পথে যাত্রী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে মহামানবের সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া কবি যেন মনের মধ্যে কোথায় একটা আসন্ন বিপর্যয়ের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিলেন; ঈশানের ভ্রূকুটি কবিচিত্তের মধ্যে একটা নূতন ভাবনা জাগাইয়া দিয়াছে—সে-ভাবনা নানাভাবে চিত্তে বহন করিয়া আনিতেছে সংশয়। যে 'তুমি'কে কবি সুন্দর মধুর করিয়া দেখিতেই অভ্যস্ত ছিলেন সেই সুন্দরকেই কবি নিজে বারংবার রুদ্ররূপ ধারণ করিবার, দণ্ডধর খড়্গধর বিচারক রূপ ধারণ করিবার আহ্বান জানাইয়াছেন। কল্পনার বিশ্বমানব নয়—-বাস্তব বিশ্বমানবের মধ্যে কবি আসিয়া দাঁড়াইয়া অত্যাচারীর অবিচার দেখিয়া আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়াছেন—

তাদের আঘাত যবে প্রেমের সর্বাঙ্গে বাজে,
সহিতে সে পারি না যে;
অশ্রু-আঁখি
তোমারে কাঁদিয়া ডাকি,—
খড়্গ ধরো, প্রেমিক আমার,
করো গো বিচার।

এই অত্যাচারী অবিচারীকে কবি যখন মার্জনা করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছেন তখনও দেখিয়াছি—

হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়,
রক্তের বর্ষণে,
অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।— ১১

এই সব কবিতা পড়িলেই মনে হয়, কবি তাঁহার ধ্যাননেত্রে

আসন্ন বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সবখানিই যেন প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন। কবির এই চেতনাকে অত্যন্ত ঘনীভূত রূপে দেখিতে পাই সাঁইত্রিশ সংখ্যক কবিতায় যেখানে আরম্ভেই দেখি—

দূর হতে কি শুনিস্ মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।
বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ,
বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ,
ভূতল গগন
মূর্ছিত বিহ্বল-করা মরণে মরণে আলিঙ্গন ;
ওরি মাঝে পথ চিরে চিরে
নূতন সমুদ্রতীরে
তরী নিয়ে দিতে হবে পাড়ি,
ডাকিছে কাণ্ডারী
এসেছে আদেশ—
বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ, ...।

এখানে সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় হইল 'কাণ্ডারী'র এই নূতন ডাক। মায়ের আর্ত ক্রন্দন, প্রেয়সীর নীরব অশ্রুমোচন, ঝড়ের গর্জন, বিচ্ছেদের হাহাকার, ঘরে ঘরে 'আরামের শয্যাতলে'র অবসান—ইহার মধ্য দিয়া কাণ্ডারীর বজ্রনির্ঘোষে আহ্বান—"যাত্রা করো, যাত্রা করো যাত্রীদল"! মানবযাত্রীকে মানবকাণ্ডারী যে এমন করিয়া ডাক দিয়াছেন 'বলাকা'র পূর্বে এত স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠ রূপে ইহা আর দেখি নাই। এই আহ্বানের মধ্য দিয়া কবিচিত্তে যে আঘাত আলোড়ন স্পষ্ট হইয়া উঠিল তাহার ভিতর দিয়া জীবনের মূল্যায়ন প্রথাকে নূতন করিয়া বিচার করিবার তাগিদও কবির মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। অতি তীক্ষ্ণ করিয়া সে প্রশ্নকে নিজেই তুলিয়া ধরিয়াছেন—

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবে না কেনা।
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।

এই তীক্ষ্ণ প্রশ্নের উত্তরে কবি নিখিল 'তুমি'র আত্মাবলোকনের আনন্দলীলার আদর্শ তুলিয়া ধরেন নাই ; এই প্রশ্নে উত্তরের যে আভাস পরের পংক্তিগুলির মধ্যে দিয়াছেন তাহাতেই চিন্তা-বিশ্বাসের নবরূপায়ণের সঙ্কেত মিলবে। পরের কথাটিও উপস্থিত করিয়াছেন কবি প্রশ্নচ্ছলে, কিন্তু এই প্রশ্নের মধ্যেই রহিয়াছে সমাধানের ইঙ্গিত।

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা ?

তাহা হইলে দেখিতেছি, কবির ইঙ্গিত এই দিকে যে জীবনের মূল্য মানুষের মধ্য দিয়াই দেবতার অমর মহিমা প্রকাশে। মানুষ নিদারুণ দুঃখকষ্টের স্বেচ্ছাবরণের ভিতর দিয়া মহত্তম ত্যাগের মধ্য দিয়া নিজের 'মর্ত্যসীমা'কে চূর্ণ করিয়া যায়, তখনই মানুষের মধ্যে জাগিয়া ওঠে দেবত্বের অমর মহিমা—এই মহিমাই জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্য ; বীরের রক্ত মাতার অশ্রু সবই মূল্য লাভ করে মানুষের এই মর্ত্যসীমালঙ্ঘনকারী অমরতার মহিমায়। মানুষের মধ্যে এই 'দেবতার অমর মহিমা'র কথা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কিছু নূতন নয়, এ-কথাকে তাঁহার প্রথম দিকের রচনার ভিতর হইতেই খুঁজিয়া পাওয়া যায় ; কিন্তু নূতনত্ব দেখা দিয়াছে এই মহিমালাভের উপায়ের উপরে এখানে যে জোর দেখা যায় সেইখানে। মানুষের জন্য দুঃসহ আত্মত্যাগের ভিতর দিয়া অমরমহিমায় জীবনকে মূল্যদান করিবার

যে আহ্বান কবির বাণীতে এখানে বিশেষ জোর পাইল ইহার পর হইতেই কবির চেতনার মধ্যে ইহা একটা নূতন শক্তিরূপে দেখা দিল এবং ইহা কবিকে দিন দিনই আরও মানবমুখী করিয়া তুলিয়াছে। এ বিষয়ে কবি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর ছাত্রদের নিকটে যে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন তাহা অতিশয় প্রণিধানযোগ্য।—

"বলাকা রচনাকালে যে-ভাব আমাকে উৎকণ্ঠিত করেছিল এখনও সেই ভাব আমার মনে জেগে আছে। আমি আজ পর্যন্ত তাকে ফিরে ফিরে বলবার চেষ্টা করছি। বুকের মাঝে যে আলোড়ন হল তার কী সার্বজাতিক অভিপ্রায় আছে তা আমি ধরতে চেষ্টা করেছি। পশ্চিম মহাদেশে ভ্রমণের সময়ে সে-চিন্তা আমার মনে বর্তমান ছিল। আমি মনে মনে একটা পক্ষ নিয়েছি; একটা আহ্বানকে স্বীকার করেছি; সে-ডাককে কেউ মেনেছে কেউ মানে নি। বলাকায় আমার সেই ভাবের সূত্রপাত হয়েছিল। আমি কিছুদিন থেকে অগোচরে এই ভাবের প্রেরণায় অস্পষ্ট আহ্বানের পথে অগ্রসর হয়েছিলাম। এই কবিতাগুলি আমার সেই যাত্রাপথের ধ্বজাস্বরূপ হয়েছিল। তখন ভাবের দিক দিয়ে যা অনুভব করেছিলুম, কবিতায় যা অস্পষ্ট ছিল, আজ তাকে সুস্পষ্ট আকারে বুঝতে পেরে আমি এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি।"

১৯

'বলাকা'য় রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনার মধ্যে বাহিরের আঘাতকে অবলম্বন করিয়া একটি নূতনভাবে জাগরণ দেখিতে পাই। ইহার ফল দেখা দিয়াছে কবির ক্রমবর্ধমান মানব-মুখিতায়। যৌবনে মানবপ্রীতি দেখা দিয়াছিল কল্পনামিশ্রিত একটা আকাঙ্ক্ষারূপে। একটা অন্তরাবেগের দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া এই মানবপ্রীতি চিত্তের অন্যান্য প্রকারের সকল আচ্ছাদন ভেদ করিয়া বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বার আত্মপ্রকাশ করিতে চাহিয়াছে। 'নৈবেদ্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বলাকা'র পূর্ব পর্যন্ত দেখি কবিচেতনায় অধ্যাত্মবোধের প্রাধান্য;

এই অধ্যাত্মবোধ তাঁহার মানবচিন্তাকে দূরে সরাইয়া দেয় নাই—কবি অধ্যাত্ম-অনুভূতির আলোকে মানবতাকে উজ্জ্বল করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন, অধ্যাত্ম মূল্যবোধের দ্বারাই মানবতার সকল অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু 'বলাকা'র পর হইতে যে মানবমুখীনতা তাহার মধ্যে একটা নূতন ঝোঁক বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। এখানে নেপথ্যের অধ্যাত্ম-আলোক পাত করিয়া জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া কবি মানবতার আপন ঔজ্জ্বল্যকেই নানা-ভাবে এমন বড় করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন যাহাতে মানবতার মর্ত্যসীমা-লঙ্ঘনকারী মহিমার মধ্যেই দেবত্ব কেবলই আবিষ্কৃত হইতে থাকে। এখানে দেবতায় আত্ম-নিবেদিত মানুষ অপেক্ষা মানুষের মধ্যে বিকশিত দেবতার কথাই বড় হইয়া দেখা দিয়াছে। এইজন্য দেখিতে পাই, 'বলাকা'র পর হইতে সৃষ্টিরহস্যের কথা এবং অধ্যাত্মরহস্যের কথা যত আসিয়াছে তাহা অধিকাংশ স্থলেই কবির নিজের ভিতরকার যে একটি বিস্ময়কর কবি-পুরুষ তাহার রহস্য ও মহিমাকে অবলম্বন করিয়াই আসিয়াছে। কবিতার মধ্যে অধ্যাত্মচিন্তা অনেক সময়ই তাই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে জন্ম-দিনের স্মরণে। 'পূরবী'র মধ্যে আসিয়া তাঁহার পূর্ব অধ্যাত্মবিশ্বাসের কথা গভীর করিয়া পাইলাম তাঁহার 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতাতে। এই 'পঁচিশে বৈশাখ' তো একটি দিন বা একটি তারিখ মাত্র নয়,—

> এই দিন এল আজ প্রাতে
> যে অনন্ত সমুদ্রের শঙ্খ নিয়ে হাতে,
> তাহার নির্ঘোষ বাজে
> ঘন ঘন মোর বক্ষ-মাঝে।

এই জন্মদিনের স্মরণের মধ্যে বিস্ময়ের সঙ্গে কবি দেখিয়াছেন নিজের ভিতরকার মানুষটিকেই—সেই মানুষটিকে দেখার ভিতরেই স্মরণ করিয়াছেন এই মানুষটির পিছনকার অখণ্ড জীবনের নির্ঝরধারাকে।—

মনে রেখো, হে নবীন,
তোমার প্রথম জন্মদিন
রহ।
যেমন প্রথম জন্ম নির্ঝরের প্রতি পলে পলে ;
তরঙ্গে তরঙ্গে সিন্ধু যেমন উছলে
প্রতিক্ষণে
প্রথম জীবনে।

'পূরবী'র 'সৃষ্টিকর্তা' কবিতাটিতে কবির চিরকালের 'তিনি'র পদসঞ্চার শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু সে পদসঞ্চার দেখা দিয়াছে কবির আত্মচেতনাকে অবলম্বন করিয়া।

জানি আমি মোর কাব্য ভালোবেসেছেন মোর বিধি,
ফিরে যে পেলেন তিনি দ্বিগুণ আপন-দেওয়া নিধি।
তাঁর বসন্তের ফুল বাতাসে কেমন বলে বাণী
সে যে তিনি মোর গানে বারম্বার নিয়েছেন জানি।
আমি শুনায়েছি তাঁরে, শ্রাবণরাত্রির বৃষ্টিধারা
কী অনাদি বিচ্ছেদের জাগায় বেদন সঙ্গীহারা।···
ছায়াতে তিনিও সাথে ফেরেন নিঃশব্দ পদচারে,
বাঁশির উত্তর তাঁর আমার বাঁশিতে শুনিবারে।

এই পর্যন্ত যেটুকু কথা তাহার সহিত কবির পূর্বযুগের কথার মোটামুটিভাবে মিল আছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রেও কবির মানবচেতনা যে কতখানি বড় হইয়া উঠিয়াছে তাহার পরিচয় মেলে পরের কথায়—

যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহর মাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দু'টি হাতে মোর হাত রাখি'
স্তিমিত প্রদীপলোকে মুখে তার শুদ্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি' আকাশের তারকার মাঝে

অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে-স্বরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয়তিমিরে।

প্রেম এখানে কোনো দেশপ্রেম বা বৃহৎ মানবসমাজের প্রতি প্রেম নয়, নেহাৎ মানবী প্রিয়ার জন্য মানব প্রিয়ের প্রেম; সেই প্রেমের মহিমার মধ্যেই অধ্যাত্মপ্রেমের মহিমা আবিষ্কৃত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যকবিতায় এই জিনিসটি যে এইখানে আসিয়াই এই প্রথম ঘটিল এমন নহে; এ জিনিস পূর্বেও আছে, শুধু ঝোঁকের মাত্রাটা একটু সরিয়া আসিয়াছে, এই কথাটাই লক্ষণীয়।

এই মানুষের প্রেমকেই মর্ত্য সবকিছু হইতে কবি শ্রেষ্ঠ মূল্য দিয়াছেন। তাহার কারণ, কবির মতে সৃষ্টিবিবর্তনের ভিতরে পরম ধন যে মানুষের ভিতরকার পুরুষ-চৈতন্য, সেই চৈতন্যেরই ঘনীভূত সারবস্তু প্রেম। স্থানে স্থানে তাই কবি বলিয়াছেন যে মানুষের প্রেমের মূল্যেই হইল সৃষ্টির যাহা কিছু সকলের মূল্য। মানুষের প্রেমের মধ্য দিয়া মানুষ শুধু আত্ম-অতিক্রম করে না, মানুষ অতিক্রম করে সকল মর্ত্যসীমা। তাই—

যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি।

সেখানে বসেছিনু আপন ভোলা
আমরা দোঁহে পাশে পাশে।
সেদিন বুঝেছিনু কিসের দোলা
দুলিয়া উঠে ঘাসে ঘাসে।
কিসের খুশি উঠে কেঁপে
নিখিল চরাচর ব্যেপে,

কেমনে আলোকের জয়
আঁধারে হল তারাময় ;
প্রাণের নিশ্বাস কী মহাবেগে
ছুটেছে দশদিক্‌গামী,
সেদিন বুঝেছিনু যেদিন জেগে
চাহিনু তুমি আর আমি ।

যতদিন গিয়াছে ততই দেখিতে পাই কবির অন্তর্যামি-চেতনার সঙ্গে কবির মানব-চেতনা—কবির ইতিহাস-চেতনাও প্রধান হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয়ে যে জিনিসটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় তাহা এই যে, অন্তর্যামি-চেতনা ও মানব-চেতনাকে কবি কোথাও পরস্পর-বিরোধী হইয়া উঠিতে দেন নাই, উভয়কেই একটি গভীর সঙ্গতির মধ্যে বর্ধিত হইতে দিয়াছেন। 'পরিশেষে'র মধ্যে আবার 'জন্মদিন'-এর কবিতা পাই। জীবনের রূঢ়তাবোধ জীবনকে রুদ্রাক্ষের মালা করিয়া তুলিয়াছে, একটি একটি দিন যেন সে-মালার একটি একটি রৌদ্রদগ্ধ অক্ষ। রুদ্রের রূপেই জীবনদেবতাকে এখানে কবি আহ্বান করিয়াছেন এবং কবিতার প্রথমাংশে এই রুদ্র জীবন-দেবতার কাছেই আবেদন জানাইয়াছেন এই জীবনের রুদ্রাক্ষমালা নিজের হাতে গ্রহণ করিতে।

আমার রুদ্রের
মালা রুদ্রাক্ষের
অন্তিম গ্রন্থিতে এসে ঠেকে
রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গেঁথে একে একে ।
হে তপস্বী, প্রসারিত করো তব পাণি
লহো মালাখানি ।

জীবনের মূল্যবোধের রবীন্দ্রনাথের এই একটা দিক্—পূর্বের সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই বর্ধিত হইতেছে এই বোধ। 'গীতাঞ্জলি'র যুগে যে দেবতাকে কবি রুদ্র করিয়া দেখেন নাই তাহা নহে ; 'বজ্রে

তোমার বাজে বাঁশি' একথা কবি জানিতেন এবং সেই সুরেতেই নিজে জাগ্রত হইয়া উঠিতে চাহিয়াছেন; 'ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার'—এ-কথাও সেই-যুগেরই কথা; নিজের হৃদয়ের মধ্যে 'তীব্র দাহন' জ্বালিবার আহ্বান কবি নিজেই জানাইয়াছেন। তথাপি যে কথাটি মনে হয় তাহা এই, 'গীতাঞ্জলি'র যুগে রুদ্রকে জীবনের এই রৌদ্রদগ্ধ দিনগুলি গাঁথা রুদ্রাক্ষের মালাখানি গ্রহণ করিয়া আবেদন জানাইয়াই শেষ করিতেন। কিন্তু এখানে কবি সেই আবেদন জানাইয়াই শেষ করিলেন না, কবিতাটির শেষে বলিলেন—

এ জন্মের গোধূলির ধূসর প্রহরে
বিশ্বরস-সরোবরে
শেষবার ভরিব হৃদয় মন দেহ
দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাব, 'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা'।

কবিতাটির প্রথম অংশের সহিত শেষ অংশের যে কোনও বিরোধ আছে একথা বলিব না; কিন্তু মনে হয়, এক পূর্ণ দেবতার 'পূর্ণের পদ পরশ'-এর মধ্যেই জীবনের সকল মূল্য এ-কথাটাই এখানে কবিকে উদ্দীপিত করিয়া রাখে নাই; পূর্ণদেবতাকে কবি মনুষ্যত্বের পূর্ণাদর্শের মধ্যে নামাইয়া আনিয়াছেন—শাশ্বত মানবের মধ্যে যখন 'পরম পুরুষ'কে অনুভব করিতে চেষ্টা করিলেন তখন এই চিরকালের মানুষের জন্য যে অফুরন্ত ভালোবাসা কবি বলিয়া গেলেন সেই ভালোবাসাই তাঁহাকে জীবন-মূল্যে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছে; তাই দেখি, একদিকে আবেদন 'লহো মালাখানি', অন্যদিকে আশ্বাস—'আমি যাই, রেখে যাই, মোর ভালোবাসা'। নিখিল মানবের ভিতর নিজের জীবনের এই মূল্যবোধের ধারণাই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে

পরিশেষের 'আমি' কবিতার মধ্য দিয়া—যে কবিতায় বলিয়াছেন যে ব্যক্তি-জীবনের মধ্যে প্রবাহিত যে 'আমি'—

সাধকের ইতিহাসে তারি জ্যোতির্ময়
পাই পরিচয়।

কিন্তু মানুষের সাধনার ভিতর দিয়া 'আমি'র এই জ্যোতির্ময় পরিচয়ের কথা বলিতে গিয়া কবি তাঁহার চিরদিনের 'তুমি'কে বিস্মৃত হইয়া যান নাই; সাধকের ইতিহাসের মধ্য দিয়া 'আমি' যে জ্যোতির্ময় পরিচয় লাভ করুক, বিশ্বমানবের ভিতর দিয়া ব্যক্তি-মানব সার্থকতা লাভ করুক—এই ইতিহাস-চেতনাকে কবি তাঁহার অধ্যাত্ম-চেতনার সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ব্যক্তিমানবের হৃদয়কমল যে যুগযুগান্তে ফুটিয়া উঠিতেছে তাহার ভিতর দিয়া মহামানবতার বিশ্বকমল ফুটিয়া উঠুক ইহাই যে 'তুমি'রও ইচ্ছা; তাই 'আমি'র এই জ্যোতির্ময় পরিচয়ের সহিত 'তুমি'র যে চিরন্তন যোগের বিশ্বাস তাহা ভঙ্গ হয় নাই। 'পরিশেষে'র 'আমি' কবিতার পাশেই তাই পাই 'তুমি' কবিতাটি যেখানে দেখি—

সূর্য যখন উড়াল কেতন
অন্ধকারের প্রান্তে
তুমি আমি তার রথের চাকার
ধ্বনি পেয়েছিনু জানতে।

এই 'তুমি'র মধ্যে আবার দেখিতে পাই সেই যৌবনের 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সঙ্গিনীকে—

সংগীতে ভরি এ প্রাণের তরী
অসীমে ভাসিল রঙ্গে,
চিনি নাহি চিনি চিরসঙ্গিনী
চলিল আমার সঙ্গে।

ইহার সহিত আবার যুক্ত হইয়া যাইতেছে 'চিত্রা'র অন্তর্যামী—'চিত্রা'র জীবনদেবতা।

আমার নয়নে তব অঞ্জনে
ফুটিছে বিশ্বচিত্র,
তোমার মন্ত্রে এ-বীণাতন্ত্রে
উদ্‌গাথা সুপবিত্র।
অতল তোমার চিত্তগহন,
মোর দিনগুলি সফেন নাচন,
তুমি সনাতনী আমিই নূতন,
অনিত্য আমি নিত্য।...
প্রেমের দিয়ালি দিয়েছিল জ্বালি
তোমারি দীপের দীপ্তি
মোর সংগীতে তুমিই সঁপিতে
তোমার নীরব তৃপ্তি।
আমারে লুকায়ে তুমি দিতে আনি
আমার ভাষায় সুগভীর বাণী,
চিত্রলেখায় জানি আমি জানি
তব আলিপনালিপ্তি।
হৃৎশতদলে তুমি বীণাপাণি
সুরের আসন পাতি
দিনের প্রহর করেছ মুখর,
এখন এল যে রাতি।

'পরিশেষে'র 'প্রাণ' কবিতাটি একটি সংক্ষিপ্ত কবিতা। এ বিষয়ে এরূপ সংক্ষিপ্ত কবিতা ইহার পূর্বে কবি আর লেখেন নাই। সংহতির গুণে কবিতাটি নিটোল মুক্তা। দীর্ঘ দীর্ঘ ভাষণে এবং দীর্ঘ দীর্ঘ কবিতায় নানাভাবে কবি জড়সৃষ্টির এবং সেই জড়সৃষ্টির ভিতর দিয়া প্রাণ ও চেতনার আবির্ভাবের যে রহস্যকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন বিস্ময়কর সংহতাকারের সেই সমগ্র

রহস্যটিকে তিনি প্রকাশ করিয়াছেন এই কবিতাটির মধ্যে। ইহার মধ্যে উদ্গীত হইয়াছে চেতনার দীপে পরমোজ্জ্বল মানুষের বিজয়ধ্বনি।—

> বহু লক্ষ বর্ষ ধরে জ্বলে তারা
> ধাবমান অন্ধকার কালস্রোতে
> অগ্নির আবর্ত ঘুরে উঠে।
> সেই স্রোতে এ ধরণী মাটির বুদ্বুদ;
> তারি মধ্যে এই প্রাণ
> অণুতম কালে
> কণাতম শিখা লয়ে
> অসীমের করে সে আরতি
> সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
> উঠত না শঙ্খধ্বনি,
> মিলত না যাত্রী কোনো জন,
> আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
> রইত নীরব।

২০

রবীন্দ্রনাথের কবিমন কোথাও কোনো সংস্কার-বিশ্বাসের বাঁধা-পথে একটানা চলে নাই, চলার সঙ্গে সঙ্গে কবিমনও নিত্য বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রথম জীবনের কয়েকটি প্রবণতাকে শেষ বয়স পর্যন্ত চিনিয়া লওয়া যায়; কিন্তু প্রত্যেক স্তরে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারি, এগুলিও বিভিন্ন বয়সে জীবনের বিভিন্ন পরিবেশে কেবলই আলোড়িত হইয়া ধাক্কা খাইয়া নড়িয়া চড়িয়া হইয়া উঠিয়াছে। তাহা যদি না হইত তবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিপুল পরিমাণের মধ্যে কেবলই একটা শ্রান্তিকর পুনরুক্তি দেখিতে পাইতাম। একপ্রবণতাও এই কারণেই শুধু শ্রান্তিকর পুনরুক্তিকে

বহন করিয়া চলে নাই, কবির সজীব মন চলিবার পথে পারিপার্শ্বিকতার সকল প্রভাবকেই স্বীকার করিতে করিতে চলিয়াছে। চলার পথে তিনি বিজ্ঞানের যে দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করিয়াছেন তাহার বাণীকে তিনি সম্পূর্ণ পাশ কাটাইয়া চলিতে চাহেন নাই, সেই বিজ্ঞানের বাণী যে কবির অন্তরে সযত্ন লালিত বাণীর উপরে বার বার আঘাত করিয়াছে ইহার স্বীকৃতি কবির নিজের কথার মধ্যেই রহিয়াছে। বিজ্ঞানের সাধনার মধ্যে যে অংশে শুধু মারণাস্ত্রের এবং যন্ত্রবলের দম্ভ নাই, আছে সত্যানুসন্ধানে মননের সততা কবি সে সাধনাকে শ্রদ্ধায় স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, আর সেই স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের মনকেও প্রয়োজন মত প্রসারিত করিয়া লইয়াছেন। ১৯৩৭ সনে কবির বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' প্রকাশিত হয়। 'বিশ্বপরিচয়' কবির বিজ্ঞানবিষয়ক বহু গ্রন্থের অধ্যয়ন এবং বিজ্ঞানিগণের সহিত বিজ্ঞানবিষয়ক বহু আলোচনার ফল। বিজ্ঞানবিষয়ে অনুকূল এবং প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ায় কবিমন সদাজাগ্রত ছিল; তথাপি বিজ্ঞানের সহিত এইরূপ প্রত্যক্ষ এবং বিপুল পরিচয় ইতঃপূর্বে কবির আর কখনও ঘটে নাই। সেই জন্য 'বিশ্বপরিচয়ে'র রচনা কবির জীবনে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আধুনিক বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ধর্মবিরোধী নাও হইতে পারে, কিন্তু ধর্মচেতনার মধ্যে সহজলালিত সংস্কারগুলিতে তাহা তীব্র আঘাত হানে; ফলে দেখা দেয় ধর্মচেতনার মধ্যে একটা পরিমার্জনের প্রক্রিয়া, অসার সংস্কারের জটিলতা হইতে মুক্ত হইয়া চেতনা তখন সারসত্যে আরও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করে। এই যুগে এবং ইহার পর হইতে রবীন্দ্রনাথের কবিচেতনার উপরেও আমরা এই বিজ্ঞানের প্রভাব লক্ষ্য করি। পরিণত বয়সে কবি মনোবিকলনের নবভঙ্গিতে মনোবিজ্ঞানের একটা প্রচণ্ড মাথানাড়া দেখিতে পাইয়াছিলেন। সে মাথানাড়ার মধ্যে নবাবিষ্কারের মাদকতায় মানুষের সকল জানা সত্যের মুখে কালি মাখাইয়া দিবার

একটা অপচেষ্টা প্রকট হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সেই অপচেষ্টাটা যতখানিই নিন্দনীয় হোক, তাহার পিছনকার আবিষ্কারের সত্যটা তাহাতে কিছু অপ্রমাণিত বা অশ্রদ্ধেয় হইয়া যায় না। এই প্রভাব রবীন্দ্রনাথের মনেও কাজ করিয়াছে; চিত্তের গহনে যেখানে যাহা কিছু রহস্য তাহার সবই একদিন অতি তৎপরতার সহিত এক গহন নিবাসিনী কৌতুকময়ীর লীলা বলিয়া সহজবুঝ বুঝিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরিণত বয়সে সে বুঝ একেবারে ভাঙে নাই, কিন্তু তাহার মধ্যে জটিল ভাবনা দেখা দিয়াছে, সে ভাবনা পূর্ববুঝকে প্রয়োজনমত কোথাও বাঁকিয়া লইয়াছে। 'শেষ সপ্তকে'র নবম সংখ্যক কবিতায় নিজেই সে বুঝের মধ্যে কত জটিলতা পাকাইয়া লইয়াছেন। ভালোবাসার মধ্যে আমরা যখন বলি, 'সবটা দিলাম', সেখানে কবি আজ দেখিতে পাইতেছেন 'অবুঝ ইচ্ছা'র একটা অত্যুক্তি।

সবটার নাগাল পাব কেমন করে ;
ওযে একটা মহাদেশ,
সাত সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন।
ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে
নির্বাক্ অনতিক্রমণীয়।
তার মাথা উঠেছে মেঘ-ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায়,
তার পা নেমেছে আঁধারে-ঢাকা গহ্বরে।

আমার ভিতরকার 'সবটা'র এই যে বর্ণনা ইহা যেন যে-কোনও আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিকের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া নিখুঁত করিয়া বলা। 'ওখানে বহুদূর নিয়ে একা বিরাজ করছে' যে সত্য তাহাকে কবি পূর্বের ন্যায় অতি সহজগ্রাহ্য কোনও নাম দিলেন না, তাহাকে বলিলেন 'নির্বাক্ অনতিক্রমণীয়'। মনোবিজ্ঞানী এইখানেই তাল ঠুকিয়া বলিবেন, এই যে 'নির্বাক্ অনতিক্রমণীয়' মানুষের পরাশ্রয়ী দুর্বল মন ইহাকেই বলিয়াছে 'আমি'র অন্তর্নিহিত

'এক'—পুরুষের অন্তর্নিহিত 'পরমপুরুষ'; ভক্তির আত্মছলনায় তাহাকেই আমরা অবোধের মত সম্বোধন করিতেছি 'তুমি', 'নাথ', 'প্রভু', 'সখা' বলিয়া। রবীন্দ্রনাথ উল্টা কথা বলিবেন। তিনি বলিবেন, ঐ নির্বাক্ অনতিক্রমণীয়কে যদি ঐখানেই অমন করিয়া ফেলিয়া রাখা যায় তবে মানুষের সমগ্রতা কোনো দিনই সত্যমূল্য লাভ করিবে না। মানুষের অচেতন সত্তা—মানুষের অপ্রকাশিত সত্তা—এগুলিত মানুষের কতকগুলি নেতিমূলক বর্ণনা, কোথায় তাহাতে মানুষের সমগ্র পরিচয়? মানুষের—

জীবনভূমির এক প্রান্ত দৃঢ় হয়েছে
কর্মবৈচিত্র্যের বন্ধুরতায়,
আর একপ্রান্তে অচরিতার্থ সাধনা
বাষ্প হয়ে মেঘায়িত হল শূন্যে,
মরীচিকা হয়ে আঁকছে ছবি।

মানুষের ভিতরকার এই উভয় প্রান্তেরই বা যোগ কোথায়? এক-প্রান্ত লইয়া যে সত্য সে ত আধখানা সত্য। এই উভয়প্রান্ত জুড়িয়াই ত মানবলোকে ব্যক্তিজগতের প্রকাশচেষ্টা; সেই সমগ্র চেষ্টার মূল্য কোথায়?

এই অপরিণত অপ্রকাশিত আমি,
এ কার জন্যে, এ কিসের জন্যে;
যা নিয়ে এল কত সূচনা, কত ব্যঞ্জনা,
বহু বেদনায় বাঁধা হতে চলল যার ভাষা,
পৌঁছল না যা বাণীতে,
তার ধ্বংস হবে অকস্মাৎ নিরর্থকতার অতলে,
সইবে না সৃষ্টির এই ছেলেমানুষি।

ইচ্ছাখুশিতে কিছু গৃহীত হইল আর বাদবাকি সব বর্জিত হইল এইটাই ত চরম 'ছেলেমানুষি'। পূর্বের জীবনে কবির এখানে মানুষের হইয়া এত তর্ক করিবার প্রয়োজন ছিল না; তখন বলিয়া

দিলেই হইত, যাহা কিছু 'আমার অনাগত আমার অনাহত' সব কিছুই 'তোমারি বীণাতারে বাজিছে তারা'। কবির মন সেই কথাতেই পৌঁছিতে চাহিতেছে, কিন্তু পূর্বের ন্যায় অত সহজে যেন পারিতেছে না। তাই আমার মধ্যে যাহা কিছু 'বৃহৎ অগোচরতায় পুঞ্জিত আছে'—আমার মধ্যে রহিয়াছে প্রকাশের যে অপরিণতি তাহাকে আর একটু বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইতেছে।—

আমাতে তাঁর ধ্যান সম্পূর্ণ হয় নি,
তাই আমাকে বেষ্টন করে এতখানি নিবিড় নিস্তব্ধতা।
তাই আমি অপ্রাপ্য, আমি অচেনা ;…

কিন্তু সরল পথেই হোক আর ঈষৎ বক্রপথেই হোক, একটানা বিশ্বাসের ভঙ্গিতে হোক বা কিঞ্চিৎ বাঁকে বাঁকে ঘুরিয়া বিভিন্ন আবর্তের ভিতর দিয়াই হোক—কবির মানসিক ঝোঁক ঘুরিয়া ফিরিয়া এক কেন্দ্রবিন্দুতেই আসিয়া পৌঁছিতে চাহিয়াছে। এই কেন্দ্রবিন্দুর বাণীটি হইল 'আমি আছি'।

বিশ্বকর্মের নিত্যকালের সেই বাণী
"আমি আছি।"— ৩৬

সমস্ত বিশ্বসৃষ্টির ভিতর দিয়া 'পরম এক' উপলব্ধি করিতে চাহিতেছেন 'আমি আছি' ; বিশ্বপ্রবাহই হইল এই 'আমি আছি' সত্যটাকে অত্যন্তভাবে অনুভব করিবার পালা। আবার বিশ্ব-কর্মের মধ্যে নিত্যকালের এই 'আমি আছি'র বাণী সঞ্চারিত করিতেছেন যিনি তাঁহারই সোনার কাঠির স্পর্শে অসামান্য আলোক নামিয়া আসে প্রতিদিনের সামান্য মানুষটির মধ্যে।—

অলস মনের শিয়রে দাঁড়িয়ে
হাসেন অন্তর্যামী,
হঠাৎ দেন ঠেকিয়ে সোনার কাঠি
প্রিয়ার মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে

কবির গানের সুর দিয়ে
তখন যে-আমি ধূলিধূসর সামান্য দিনগুলির
মধ্যে মিলিয়ে ছিল,
সে দেখা দেয় এক নিমেষের অসামান্য আলোকে।

এই কথাটাকেই একটু ঘুরাইয়া বলা হইয়াছে 'শেষ সপ্তকের' সংযোজনের 'আমি' নামক কবিতাটিতে।—

এরি মধ্যে আছি আমি,
সব হতে এই দামি।
কেন না আজ বুকের কাছে যায় না জানা,
আরেকটি সেই দোসর আমি উড়িয়ে চলে বিরাট তাহার ডানা
জগতে জগতে
অন্তবিহীন ইতিহাসের পথে।

১৯৩১ সালে কবি হিবার্ট বক্তৃতাগুলি দেন। আমরা পূর্বেই দেখিয়া আসিয়াছি, নিত্যকালের বিশ্বমানবের ভিতর দিয়া প্রকাশিত যে মহিমা তাহাই যে ভগবৎ-মহিমা, নিখিল মানুষের মধ্যে প্রকাশিত মহত্ত্বাই যে দেবত্ব—মানুষের মধ্য দিয়া সেই দেবত্বকে প্রস্ফুটিত করাই যে ধর্ম এই কথাটাকে খুব বড় করিয়া বলিতে গিয়া কবিকে এই কথাটাকে চেতনার মধ্যে অনুভূতিতে ও মননে নিবিড় করিয়া লইতে হইয়াছে। মানুষের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া জড় হইতে প্রাণকে এবং প্রাণ হইতে চেতনাকে স্পষ্টভাবে অনুভূতিতে ও বিচারে বড় করিতে দেখিতে ও দেখাইতে হইয়াছে। এই কারণে এই সময়ের পর হইতে কবিতার মধ্যে এই সত্যটি কবিমনকে গভীরভাবে অধিকার করিয়াছিল। 'বিচিত্রিতা'র প্রথম কবিতায় যে অনুভূতিতে কবি মানুষকে লক্ষ্য করিয়া ফুলের মুখে বলাইয়াছিলেন 'সুন্দর আমাতে আছে থামি, তোমাতে সে হল ভালোবাসা', সেই অনুভূতিরই বলিষ্ঠ প্রকাশ দেখি 'বীথিকা'র 'সত্যরূপ' কবিতাটির মধ্যে।

তখনি বুঝিতে পারি, বিশ্বের মহিমা
উচ্ছ্বসিয়া উঠি
রাখিল সত্তার মোর রচি নিজ সীমা
আপন দেউটি।
সৃষ্টির প্রাঙ্গণতলে চেতনার দীপশ্রেণী-মাঝে
সে দীপে জ্বলিছে শিখা উৎসবের ঘোষণার কাজে।
সেই তো বাখানে,
অনির্বচনীয় প্রেম অন্তহীন বিস্ময়ে বিরাজে
দেহে মনে প্রাণে।

প্রকৃতির প্রত্যেক স্তরের মধ্যে যত রকমের বাধা রহিয়াছে সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া যে 'জয়ী' হইয়া উঠিয়াছে 'মানবের বাণী' এ-কথাটি চিত্রাঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে 'বীথিকা'র 'জয়ী' কবিতাটির মধ্যে।

ঐতিহাসিক ক্রমে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের ধারা অনুসরণ করিলে একটি জিনিস বেশ লক্ষণীয় হইয়া ওঠে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যজীবনকে লক্ষ্য করিলে দেখি, সেখানে সব জিনিসকে অবলম্বন করিয়াই কবির মনে কতকগুলি জিজ্ঞাসা জাগিয়া উঠিয়াছে। যত দিন অগ্রসর হইয়াছে ততই এই জিজ্ঞাসাগুলিও গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল—তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই জিজ্ঞাসাগুলি নিজেরাই আবার কতকগুলি সমাধানের আভাস দিতে লাগিল। 'চিত্রা' পর্যন্ত নানাভাবে দেখি যে সমাধানের ব্যঞ্জনা, 'নৈবেদ্য' হইতে 'গীতালি' পর্যন্ত দেখিতে পাই তাহা অবলম্বনে কতকগুলি অধ্যাত্ম বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত। কবিমন যখন অধ্যাত্ম-বোধের মধ্যে একটা গভীর সমাধান লাভ করিয়াছে তখন সুখদুঃখ আশা-নৈরাশ্য সকলের ভিতর দিয়াই চিত্তের একটা ধ্রুবাস্থিতির উল্লাস সকল গানে কবিতায় ব্যঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। 'বলাকা'র মধ্যে দেখি, চিত্তের এই ধ্রুবাস্থিতির মধ্যে নূতন নূতন আঘাত;

ইহার পর হইতেই লক্ষ্য করিতে পারি, সকল অনুকূলতা-প্রতিকূলতার ভিতরেও নিজের অধ্যাত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার চেষ্টা। এই চেষ্টায় মানবতাবোধকে ওতপ্রোতভাবে অধ্যাত্মবোধের সহিত মিলাইয়া লইতে হইয়াছে—এবং এই পথে মানবতাবোধই কবিমনে অধ্যাত্মবোধের সহিত অভিন্ন হইয়া গেল। সেই মানবতাবোধের উপরে কবি স্থানে স্থানে এমনভাবে জোর দিয়াছেন যে তাহার সহিত অধ্যাত্মবোধকে একান্ত অভিন্ন করিয়া না লইলেও পাশ্চাত্যের অনেক মানবতাবাদিগণের ন্যায় রবীন্দ্রনাথও এই মানবতাবোধের ভিতর দিয়া জীবন-রসদ সংগ্রহ করিতে পারিতেন। কিন্তু আমরা পূর্ব হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি, কবি তাঁহার এই মানবতাবোধকে কোনও স্থানেই তাঁহার অধ্যাত্মবোধ হইতে বিযুক্ত করিয়া ফেলেন নাই ; অনেক স্থলে এ-কথাও মনে হয়, অধ্যাত্ম-বোধকে তিনি এমন একটি ব্যাপক অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া লইয়াছেন যে মানবতাবোধের সঙ্গে তাহার সকল বিরোধ আপনা হইতেই অপসারিত হইয়া গিয়াছে।

উত্তরসপ্ততি বয়স্কাল হইতে লক্ষ্য করি, মৃত্যু কবিচেতনার উপরে নূতন করিয়া ছায়া ফেলিয়াছে। মৃত্যুচেতনা কবিকে প্রথম জীবন হইতেই প্রভাবিত করিয়াছে, কিন্তু দূরত্বের ব্যবধানকে লইয়া সেখানে খানিকটা কল্পনাশ্রয় ছিল ; উত্তরসপ্ততি কালে চেতনায় যে মৃত্যুছায়া তাহার মধ্যে কল্পনার ব্যবধান বেশি ছিল না—ছিল সত্যকার ছায়ার কম্পিত সঞ্চরণ। এই ছায়ার সঞ্চরণের মধ্যেও প্রত্যয়ের দীপকে কবি অনির্বাণ রাখিতে চাহিয়াছেন। দীপ নিভিয়া যায় নাই—কোথাও একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে নাই, কিন্তু দীপ একেবারে নিবাত নিষ্কম্প ছিল না। তাই দেখি সিদ্ধান্তের উল্লাসের পরিবর্তে স্থানে স্থানে আবার জিজ্ঞাসার নিথরতা। জিজ্ঞাসার মধ্যেই হয়ত প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনা রহিয়াছে, কিন্তু প্রত্যয়ের পূর্বোল্লাসের তাৎপর্যপূর্ণ অনুপস্থিতি। 'পত্রপুটে'র

আট সংখ্যক এবং তেরো সংখ্যক এই দুইটি কবিতাই পাশাপাশি রাখা যাক। কবিকে দেওয়া হইয়াছে একটি বুনো চারাগাছ, তাহার ফুলগুলি যেন আলো পান করিবার হলদে রঙের পাত্র। এই ছোট বুনো চারাগাছটিকে লইয়াই কবি তলাইয়া গিয়াছেন তাঁহার চিত্তধৃত প্রত্যয়ে—

লক্ষ লক্ষ বৎসর এই ফুলের ফোটা-ঝরার পথে
সেই পুরাতন সংকল্প রয়েছে নূতন, রয়েছে সজীব সচল,
ওর শেষ সমাপ্ত ছবি আজও দেয় নি দেখা।
এই দেহহীন সংকল্প, সেই রেখাহীন ছবি
নিত্য হয়ে আছে কোন্ অদৃশ্যের ধ্যানে।
সে অদৃশ্যের অন্তহীন কল্পনায় আমি আছি,
যে অদৃশ্যে বিধৃত সকল মানুষের ইতিহাস
অতীতে ভবিষ্যতে।

তেরো সংখ্যক কবিতা আরম্ভ 'আমি বনস্পতি'র বর্ণনায়। এই বনস্পতির জীবনরস-সংগ্রহের ইতিহাস এবং ইহার বিশ্বভবনে ছড়াইয়া পড়িবার ইতিহাসের চমৎকার বর্ণনার পরে—শেষের পালা।—

আজ আমার এই পত্রপুঞ্জের
ঝরবার দিন এল জানি।
শুধুই আজ অন্তরীক্ষের দিকে চেয়ে—
কোথায় গো সৃষ্টির আনন্দনিকেতনের প্রভু,
জীবনের অলক্ষ্য গভীরে
আমার এই পত্রদূতগুলির সংবাহিত দিনরাত্রির যে সঞ্চয়
অসংখ্য অপূর্ব অপরিমেয়
যা অখণ্ড ঐক্যে মিলে গিয়েছে আমার আত্মরূপে,
যে রূপের দ্বিতীয় নেই কোনোখানে কোনো কালে,
তাকে রেখে দিয়ে যাব কোন্ গুণীর কোন্ রসজ্ঞের
দৃষ্টির সম্মুখে,

কার দক্ষিণ করতলের ছায়ায়,
অগণ্যের মধ্যে কে তাকে নেবে স্বীকার করে।

এখানে অবশ্য বলা যাইতে পারে, 'কে তাকে নেবে স্বীকার করে' প্রশ্নের মধ্যেই এই আশ্বাস নিহিত আছে যে কেহ একজন স্বীকার করিয়া লইবে। ইহা হইল পূর্বাপরের সঙ্গতি-টানা ভাষ্য। এ-ভাষ্যের উপযোগিতাও যেমন আছে, বিপদও আছে। উপযোগিতা কেন্দ্রীয় ঐক্যের দিকে ইঙ্গিতে, বিপদ্ কবির প্রতি-মুহূর্তে সজাগ মনটির ভিতরে প্রতিফলিত সকল বর্ণবৈচিত্র্যকে মুছিয়া ফেলিয়া কবির কবিত্ব ঘুচাইয়া দিয়া তাঁহাকে লেপা-পোঁছা দার্শনিক বা ধার্মিক বানাইয়া তুলিবার চেষ্টায়, রক্তমাংসের অত্যন্ত একটি সজীব মানুষকে শুধু ভাবাদর্শের রেখাচিত্রে পর্যবসিত করিবার চেষ্টায়। শেষের দিকের কবিতাগুলিতে যে তাই আশ্বাস-সংশয়ের বিষমবর্ণের দ্বন্দ্ব প্রকটিত হইয়াছে তাহাকে এড়াইয়া চলিতে গেলে কবির সত্য-পরিচয়কেই এড়াইয়া চলিতে হইবে, কালের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন—এবং তাহারও পিছনে কবির সমগ্র পুরুষীয় সত্তাই যে চলিয়াছে, বাড়িয়াছে, পরিণতি লাভ করিয়াছে এই কথাটাকে অস্বীকার করিতে যাওয়ায় শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইবে না, প্রকাশ পাইবে সংস্কারাচ্ছন্ন মূঢ়তা। 'প্রান্তিকে'র ষোলো সংখ্যক কবিতায় কবি সকল নৈরাশ্যের ধূসরতার বুকেও প্রত্যয়ের আলোক অম্লান রাখিতে চাহিয়াছেন—

দেখিলাম বালুস্তরে
প্রচ্ছন্ন সুদূর যুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে
যেন মগ্ন মহাতরী অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবর্তবলে
লয়ে তার সব ভাষা, সর্ব দিনরজনীর আশা,
মুখরিত ক্ষুধাতৃষ্ণা, বাসনাপ্রদীপ্ত ভালোবাসা।
তবু করি অনুভব বসি এই অনিত্যের বুকে,
অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।

কিন্তু ঠিক ইহার একটি কবিতা পরে আঠারো সংখ্যক কবিতাতেই দেখিতে পাই, শুধু এই অসীমের হৃৎস্পন্দনের আশ্বাস বা অর্থ লইয়াই কবি প্রশান্তমনে ধরণী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারেন নাই ; ইতিহাস-চেতনা সকল শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিয়াছে— বিদায় লইবার পূর্বে কবিকে তাই তারস্বরে মানুষকে ডাকিয়া বলিয়া যাইতে হইয়াছে—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

এখানে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসটা বড় হইয়া দেখা দিয়াছে মানুষের উপরে। মানুষের ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করিয়া করিয়া পরম আশাবাদী কবিও স্থানে স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন এমন এক সঙ্কটের মুখে যেখানে মানুষের সমস্ত অর্থই যেন মিথ্যা হইয়া যাইতে বসিয়াছে। তখন কবি নির্বাণভূয়িষ্ঠ আদর্শবাদকে আবার নিজের মধ্যেই সন্ধুক্ষিত করিয়া লইয়াছিলেন কোন্ নব-আহৃত সমিধের দ্বারা ? তাহা হইল এই, 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব।' বলা যাইতে পারে, বিশ্বমানবই ত বিশ্বদেবতা—মানুষের উপরে বিশ্বাসই তো সেই বিশ্বদেবতায় বিশ্বাস। তত্ত্বের দিক হইতে যে কথাটাই সত্য হোক, এখানে কবির আশ্বাসটা মানুষের চরিত্রের উপরে—যে চরিত্রের মধ্যে একটা কল্যাণবোধ নিত্যকাল অনুস্যূত হইয়া আছে। এ সত্য শুধু একটা বিশ্বাসের তত্ত্ব নয়—এ সত্য মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসের বুকে ভাসিয়া-ওঠা ব্যবহারিক সত্য।

'সেঁজুতি'তে দেখি 'অমর্ত' কবিতায় কবি বলিয়াছেন—

যে-দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে—
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে।

'প্রতীক্ষা' কবিতাতেও পূর্বসুরের পুনরাবৃত্তিতে বলিয়াছেন—

অসীম আকাশে মহাতপস্বী
মহাকাল আছে জাগি।
আজিও যাহারে কেহ নাহি জানে,
দেয় নি যে দেখা আজো কোনো খানে
সেই অভাবিত কল্পনাতীত
আবির্ভাবের লাগি
মহাকাল আছে জাগি।

কিন্তু ইহারই ঠিক পরের কবিতা 'পরিচয়ে' কবি যেখানে নিজের শেষ পরিচয় দিয়াছেন সেখানে বলিয়াছেন—

ভাঁটার গভীর টানে
তরীখানা ভেসে যায় সমুদ্রের পানে।
নূতন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়ে
সুধাইছে দূর হতে চেয়ে,
"সন্ধ্যার তারার দিকে
বহিয়া চলেছে তরণী কে।"

সেতারেতে বাঁধিলাম তার,
গাহিলাম আরবার—
মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরি লোক।
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।

ইহাকে একটি বিশেষ ক্ষণের বিশেষ মেজাজের উক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা ঠিক হইবে না, শেষের দিকে দেখি, ইহা কবির ঠিক ক্ষণভঙ্গুর মেজাজ নয়, বেশি সময়ে ইহাতেই কবির চিত্তস্থিতি। মানুষকে সর্বপ্রকারে মহিমান্বিত করিয়া তাহার অসীমতার মধ্যে নিজের সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের মূল্যায়ন-চেষ্টা।

যে জীবনপ্রশ্ন একবার জাগিয়া উঠিয়াছিল কবির প্রথম জীবনে সেই জীবন-প্রশ্নই কি করিয়া আবার সচকিত করিয়া দিয়াছে কবিমনকে শেষবয়সে তাহার চমৎকার নিদর্শন মিলিবে 'নবজাতকে'র 'কেন' কবিতাটিতে। আবার একটি সর্বব্যাপী 'কেন' যেন কবির চিত্তকে ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে। কবিতাটির আরম্ভে দেখিতেছি—

জ্যোতিষীরা বলে,
সবিতার আত্মদান যজ্ঞের হোমাগ্নিবেদিতলে
যে জ্যোতি উৎসর্গ হয় মহারুদ্রতপে
এ বিশ্বের মন্দিরমণ্ডপে,
অতি তুচ্ছ অংশ তার ঝরে
পৃথিবীর অতি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রের 'পরে।

প্রথমেই মনে রাখিতে হইবে এখানে কবি কথাটা জ্যোতিষীদের মুখে বলাইতেছেন। আমরা দেখি এ-বর্ণনা কবির নিজেরই অত্যন্ত একটি প্রিয় বর্ণনা, শতাধিক কবিতায় রহিয়াছে কবির উল্লসিত মনের এই বর্ণনা। যাহা হোক, জ্যোতিষীদের বর্ণনার ভিতর দিয়া কবি লক্ষ্য করিলেন এই সৃষ্টিযজ্ঞের মধ্যে একটা

সর্বত্যাগী অপব্যয়,
আপন সৃষ্টির পরে বিধাতার নির্মম অন্যায়।

পূর্বজীবনে এই 'অপব্যয়' এবং 'নির্মম অন্যায়' কথার বিরুদ্ধে কবি

তাঁহার সর্বশক্তি লইয়া তীব্রতম ভাষায় প্রতিবাদ জানাইতেন। এখানে এই মত কবি গ্রহণ না করিলেও তীব্র প্রতিবাদও করিতেছেন না। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই অবশ্য একটা বিকল্পের কথা তুলিলেন ; কিন্তু সে বিকল্প-সম্ভাবনায়ও কবির পরম সন্তোষ নাই, তাই সেই বিকল্পের সঙ্গেও যোগ করিয়া দিলেন প্রকাণ্ড একটি 'কেন'।—

কিংবা এ কি মহাকাল কল্পকল্পান্তের দিনে রাতে
এক হাতে দান করে ফিরে ফিরে নেয় অন্য হাতে।
সঞ্চয়ে ও অপচয়ে যুগে যুগে কাড়াকাড়ি যেন—
কিন্তু, কেন।

এখানে এত বড় একটা 'কিন্তু' এবং 'কেন' আমাদিগকেও সচকিত করিয়া তোলে। কোথাও কিছু ফেলা যাইবে না—সকলের ভিতর দিয়া এক 'পরম পুরুষ' আত্মোপলব্ধি করিতেছেন—হইয়া উঠিতেছেন—সে সব কথা কি সমভাবে আর জীবন-প্রেরণা দান করিতেছে না? জড়জগতের আবর্তনের কথা বলিয়া কবি আসিলেন সুখদুঃখ-কল্পনা-ভাবনাময় মানুষের চৈতন্যজগতে। সেখানকার যে চিত্র কবি অঙ্কিত করিলেন, সে চিত্রও কোনো আশায় উজ্জ্বল চিত্র নহে।—

কোথাও বা জ্বলে ওঠে জীবন-উৎসাহ,
কোথাও বা সভ্যতার চিতাবহ্নিদাহ
নিভে আসে নিঃস্বতার ভস্ম-অবশেষে।
নির্ঝর ঝরিছে দেশে দেশে—
লক্ষ্যহীন প্রাণস্রোত মৃত্যুর গহ্বরে ঢালে মহী
বাসনার বেদনার অজস্র বুদ্বুদপুঞ্জ বহি।
কে তার হিসাব রাখে লিখি।
নিত্য নিত্য এমনি কি

অফুরান আত্মহত্যা মানবসৃষ্টির
নিরন্তর প্রলয় বৃষ্টির
অশ্রান্ত প্লাবনে।
নিরর্থক হরণে ভরণে
মানুষের চিত্ত নিয়ে সারা বেলা
মহাকাল করিতেছে দ্যূতখেলা
বাঁ হাতে দক্ষিণ হাতে যেন—
কিন্তু, কেন।

এ যে আবার দেখিতেছি কবির জীবনপ্রভাতের সেই প্রথম জিজ্ঞাসা। কবি নিজেও সে-বিষয়ে সচেতন। এই কবিতার পরের স্তবকের আরম্ভেই বলিয়াছেন—

প্রথম বয়সে কবে ভাবনার কি আঘাত লেগে
এ প্রশ্নই মনে উঠেছিল জেগে—

জীবনপ্রভাতে সেই প্রশ্নের সমাধান নিজের মধ্যেই কবি পাইয়াছিলেন অনেকখানি কল্পনায়—এই কল্পনাই অবশ্য কিছু পরে জীবনবোধে পর্যবসিত হইয়াছে।

কল্পনায় দেখেছিনু, প্রতিধ্বনিমণ্ডল বিরাজে
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরকন্দর-মাঝে।

কবি এখানে 'প্রভাতসংগীতে'র 'প্রতিধ্বনি' কবিতার কথারই ইঙ্গিত করিতেছেন। এই 'প্রতিধ্বনি'কে লইয়া ধীরে ধীরে কি করিয়া জীবনদেবতার বিশ্বাস গড়িয়া উঠিল—তাহা লইয়া চিরন্তনের 'তুমি' গড়িয়া উঠিল—এবং সেই 'তুমি'ই কবির জগতের এবং কবির ব্যক্তিজীবনের পরম নির্ভর হইয়া উঠিল তাহা তো আমরা সবিস্তারেই দেখিতে পাইয়াছি। এই 'প্রতিধ্বনি'কে লইয়াই জগৎ ও জীবনের কি তাৎপর্য জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহাও কবি এখানে স্মরণ করিতেছেন।—

অনুভব করেছি তখনি,
বহু যুগযুগান্তের কোন্ এক বাণীধারা
নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঠেকি পথহারা
সংহত হয়েছে অবশেষে
মোর মাঝে এসে।

কিন্তু আজ দেখিতেছি, সেই অনুভূতির পরেও নূতন করিয়া কবির মনে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিতেছে—

প্রশ্ন মনে আসে আরবার,
আবার কি ছিন্ন হয়ে যাবে সূত্র তার—
রূপহারা গতিবেগ প্রেতের জগতে
চলে যাবে বহুকোটি বৎসরের শূন্য যাত্রাপথে?
উজাড় করিয়া দিবে তার
পান্থের পাথেয় পাত্র আপন স্বল্পায়ু বেদনার—
ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড হেন?
কিন্তু, কেন।

সূত্র কোনোদিনই ছিন্ন হইবে না ইহাই কবির সারা জীবনের বাণী দেখিয়া আসিলাম, এখানে আবার সূত্র ছিন্ন হইবার কথা উঠিতেছে কেন? পান্থের পাথেয় পাত্রকে কবি এখানে 'ভোজশেষে উচ্ছিষ্টের ভাঙা ভাণ্ড' রূপে আদৌ কল্পনাই বা করিতেছেন কেন? বেশ বোঝা যাইতেছে, কবির এতদিনের বিশ্বাসের নীড়ে আবার দু-একটি সংশয়ের কালসর্প দেখা দিতেছে।

এই সংশয়কে আরও অনেক ঘনীভূত করিয়া দেখিতে পাইতেছি 'নবজাতকে'র 'প্রশ্ন' কবিতাটির মধ্যে। শুধু এই কবিতাটি হাতের কাছে থাকিলে কবিকে একেবারে পরিষ্কার নাস্তিক না বলিলেও বলিতাম 'অ্যাগ্নস্টিক্'—যে-জাতীয় 'অ্যাগ্নস্টিক্' ভাব কবির জীবনের অন্য কোনও স্তরেই লক্ষ্য করিতে পারি নাই। অন্যত্রও কবি প্রশ্ন করিয়াছেন—

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

ইহাও তীক্ষ্ণ প্রশ্ন। কিন্তু এ-প্রশ্নের মধ্যে প্রেমের সর্বশক্তিমত্তায় সংশয় প্রকাশ করা হইয়াছে, কোনও অনাস্তিক্য বা 'অ্যাগ্নস্টিক্' মনোভাব প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু 'নবজাতকের' প্রশ্নটির মধ্যে শুধু সুতীব্র আর্তস্বর নাই—একটা প্রকাণ্ড অস্বীকৃতির মনোভাব আছে। সৃষ্টিপ্রবাহের কথা—তাহার 'কেন্দ্র মাঝে' অসংখ্য বৎসরে 'আমি' ঘনাইয়া উঠিবার কথা আলোচনা করিয়া কবি বলিতেছেন—

তার পরে ভাবি,
এ অজ্ঞেয় সৃষ্টি 'আমি' অজ্ঞেয় অদৃশ্যে যাবে নাবি।
অসীম রহস্য নিয়ে মুহূর্তের নিরর্থকতায়
লুপ্ত হবে নানারঙা জলবিম্ব প্রায়।
অসমাপ্ত রেখে যাবে তার শেষ কথা
আত্মার বারতা।
তখনো সুদূরে ঐ নক্ষত্রের দূত
ছুটাবে অসংখ্য তার দীপ্ত পরমাণুর বিদ্যুৎ
অপার আকাশ-মাঝে ?
কিছুই জানি না কোন্ কাজে।
বাজিতে থাকিবে শূন্যে প্রশ্নের সুতীব্র আর্তস্বর,
ধ্বনিবে না কোনই উত্তর।

'ধ্বনিবে না কোনই উত্তর' এত বড় একটা ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক কথা কবি পূর্বে এমন করিয়া আর বলেন নাই।

'নবজাতকে'র 'শেষ কথা' কবিতাটিতে কবি 'বিলয়বিলীন দিনশেষে' 'গোপনচর জীবনের অন্তরতর'কে একবার 'চরম আলোকে' দেখিয়া লইতে চাহিয়াছেন। সেই চাওয়ার মধ্যেও যেন পূর্বপ্রত্যয়ের স্মৃতি আছে, প্রশান্ত নির্ভরের অসংশয় নাই।

জানি না, বুঝিব কি না প্রলয়ের সীমায় সীমায়
শুভ্রে আর কালিমায়
কেন এই আসা আর যাওয়া,
কেন হারাবার লাগি এতখানি পাওয়া।
জানি না, এ আজিকার মুছে-ফেলা ছবি
আবার নূতন রঙে আঁকিবে কি তুমি, শিল্পী কবি।

'নব জাতকে'র 'জয়ধ্বনি' কবিতায় অনেকখানি আশাবাদ অবলম্বন করিয়া কবি শেষবাক্যে নিজের অদৃষ্টের জয়ধ্বনি দিতে চাহিয়াছেন। জীবনের অনেক অপূর্ণতা দুর্বলতা ধিক্কারযোগ্যতা রহিয়া গিয়াছে, তথাপি কবি জয়ধ্বনি দিতে চাহিয়াছেন অখণ্ডকে—সকল স্খলন-পতন-ত্রুটিকে যাহা সমগ্রতার মধ্যে সার্থক করিয়া তোলে। কিন্তু এই জয়ধ্বনির মধ্যেও দেখিতে পাই, কবিচিত্তে অখণ্ডতা-বোধ বড় হইয়া দেখা দিয়াছে অখণ্ড মানবতার মধ্য দিয়া। চিরন্তন মানবের ভিতর দিয়া ব্যক্ত যে অখণ্ডতার মহিমা সে মহিমাকে বিরাট হিমালয়ের অখণ্ড মহিমার মতনই প্রত্যক্ষ করিলেন কবি সকল সংশয়-নৈরাশ্যের মধ্যেও।

অপূর্ণ শক্তির এই বিকৃতির সহস্র লক্ষণ
দেখিয়াছি চারিদিকে সারাক্ষণ,
চিরন্তন মানবের মহিমারে তবু
উপহাস করি নাই কভু।
প্রত্যক্ষ দেখেছি যথা
দৃষ্টির সম্মুখে মোর হিমাদ্রিরাজের সমগ্রতা,
গুহাগহ্বরে যত ভাঙাচোরা রেখাগুলো তারে
পারে নি বিদ্রূপ করিবারে—
যত কিছু খণ্ড নিয়ে অখণ্ডেরে দেখেছি তেমনি,
জীবনের শেষবাক্যে আজি তারে দিব জয়ধ্বনি।

এইযুগের কবিমনের এই সাধারণ নৈরাশ্য-সংশয়ের কারণরূপে

কয়েকটি কথা মনে হয়। কবি এখন আর আপনার মধ্যে আপনি কবি নন, এতদিনে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বজনের হইয়া উঠিয়াছেন। নিজের মধ্যে নিজে থাকিবার ইচ্ছা হইলেও কেহ তাহা দিতেছে না, সকলেই কবির ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় তাঁহাকে টানিয়া আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিতে চাহিয়াছে উত্তেজনাময় পৃথিবীর মাঝখানটাতে। চীনে আর জাপানে যুদ্ধ, কিন্তু অতিমাত্রায় উদ্বেজিত হইয়া উঠিতে হইল শান্তিনিকেতনে কবিকে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবল গৃহবিবাদ-জনিত উত্তেজনা, তাহাও গিয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে কবির নিভৃত কক্ষের হাওয়া। তাহা ছাড়া বিশ্বব্যাপী আবার সর্বঘাতী প্রচণ্ড ঝড়ের সঙ্কেত। আমরা আমাদের পূর্ব আলোচনায় দেখিতে পাইয়াছি, পাখী যেমন করিয়া ঝড়ের সঙ্কেত বুঝিতে পারে কবিমনও তেমন করিয়া মানুষ-সভ্যতার প্রকাণ্ড ঝড় বিশ্বযুদ্ধগুলির সঙ্কেত বুঝিতে পারে, 'বলাকা'র মধ্যেই দেখিয়াছি তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। এইবারে আসিয়াছে দ্বিতীয় ঝড়; শুধু সঙ্কেত আসিল না—পালাই সুরু হইয়া গেল। এদিকে আবার বার্ধক্যজনিত ও রোগজনিত একটা ক্রমঘনায়মান বিষণ্ণতা। এই সব জুড়িয়া যেন খানিকটা সংশয়ের আনাগোনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছিল। 'বলাকা'র যুগে ঝড়ের সঙ্কেত পাইয়া কবিমন সেই ঝড়ের মাতনেই মাতিয়া উঠিয়াছিল; দ্বিতীয় ঝড়ের আরম্ভে নূতন করিয়া মাতিয়া উঠিবার শক্তি এবং প্রেরণা ছিল না, অথচ তাহার সর্বঘাতী বর্বরতার বীভৎসতা সম্বন্ধেও উদাসীন থাকিবার উপায় ছিল না; ইহারই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে একটা সাধারণ নৈরাশ্যে ও সংশয়ে।

কিন্তু এই বিষণ্ণতার আবছায়ার মধ্যেও আর একবার জীবন-সায়াহ্নের 'সানাই' বাজিয়া উঠিয়াছিল, যে 'সানাই'য়ের সুর বহন করিয়া আনিয়াছিল পূর্বপ্রত্যয়কে; এই 'সানাই'য়ের সুরে বেহাগের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটিয়াছে ভৈরবীর।

মোর জন্মকালে
নিশীথে সে কে মোরে ভাসালে
দীপ-জ্বালা ভেলাখানি নামহারা অদৃশ্যের পানে ;
আজিও চলেছি তার টানে।
বাসাহারা মোর মন
তারার আলোতে কোন্ অধরাকে করে অন্বেষণ
পথে পথে
দূরের জগতে।

'সানাই'য়ের মধ্যেই 'কর্ণধার' কবিতায় আবার বহুদিনের পরিচিত সুরে 'লীলার কর্ণধারে'র কথা শুনিতে পাইতেছি।—

ওগো আমার লীলার কর্ণধার,
জীবন-তরী মৃত্যুভাঁটায়
কোথায় কর পার।

নীল আকাশের মৌন খানি
আনে দূরের দৈববাণী,
গান করে দীন উদ্দেশহীন
অকূল শূন্যতার।
তুমি ওগো লীলার কর্ণধার
রক্তে বাজাও রহস্যময়
মন্ত্রের ঝংকার

দিনের গান উঠিতেছে—'উদ্দেশহীন' এবং 'অকূল শূন্যতার' ; কিন্তু 'লীলার কর্ণধার' নীরবে রক্তের মধ্যে আবার 'রহস্যময় মন্ত্রের ঝংকার' বাজাইয়া দিতেছেন। কিন্তু এই ঝঙ্কারে 'উদ্দেশহীন' দিনগুলি পূর্বের ন্যায় আবার পরমনির্ভরযোগ্য 'উদ্দেশ' পাইতেছে কি ? 'অকূল শূন্যতা' এই ঝঙ্কারে আবার ভরিয়া উঠিতেছে কি ? সেই কথা আছে, সেই সুর আছে—কিন্তু সেই উদ্দীপনা যেন আর নাই। 'লীলার কর্ণধার'কে শাশ্বতমানবতার যত কাছাকাছি

টানিয়া আনা যায় ততই যেন তিনি ব্যবহারিক জীবনে সত্য হইয়া উঠিতেছেন,—নতুবা যেন শুধু কথা—শুধু সুর—শুধু স্বপ্ন। শেষ পর্যন্তই কবি থাকিয়া থাকিয়া এ সব কথা বলিয়াছেন—

স্বপ্নের এ পাগলামি বিশ্বের আদিম উপাদান।—আরোগ্য, ২৬

কিন্তু এই 'স্বপ্নের পাগলামি'র অর্থ একদিন যেন কবি অন্তরে স্পষ্ট করিয়া উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, শেষের দিকে তাহার অর্থ ক্রমেই দুর্জ্ঞেয় রহস্যে জটিল হইয়া উঠিয়াছে। 'জন্মদিনে'র প্রথম কবিতাতেই তাই দেখি—

আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।

দ্বিতীয় কবিতাটির মধ্যেও দেখি, কবি মনে করেন সৃষ্টির সকল বিবর্তনের ভিতর দিয়া—

এখনো হয় নি খোলা তাহার জীবন-আবরণ—
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্ম দিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তুলির টানে টানে
ফোটেনি তাহার মাঝে ছবির পরম পরিচয়।

একথা কবির কিছু নূতন কথা নহে, জীবন এই জীবনেই 'ধরা'র মধ্যে দিয়া অধরার যত কাছাকাছিই আসুক না কেন, জীবন যে তাহার পরম রূপ এবং পরম অর্থ এখনও লাভ করে নাই, একথা বহুবার বহুভাবেই কবি বলিয়াছেন। সে কথা বলিবার মধ্যে পূর্বে কবিকণ্ঠে কোনও নৈরাশ্য বা সংশয় ছিল না—ভবিষ্যৎ-বিবর্তনের সার্থকতা রূপেই তাহা পরম আশা বহন করিত। কিন্তু এখানে দেখিতেছি—

শুধু করি অনুভব,
চারিদিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে।

অবশ্য এই 'অব্যক্তের বিরাট প্লাবনকে' কবি শেষ জীবনে একটা 'অ্যাগ্নস্টিক্' দৃষ্টিতেই সর্বদা গ্রহণ করেন নাই; 'জন্মদিনের' তেরোসংখ্যক কবিতায় 'মহা অব্যক্তের অসীম চৈতন্য'কে গ্রহণ করিয়াছেন কবি তমসের পরপারের জ্যোতি বলিয়া এবং বলিয়াছেন—

বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেই খানে,
সেই সুন্দরের রূপে,
সে সংগীতে অনির্বচনীয়।

কিন্তু এই বোধেই যদি কবিমনের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ছিল তবে মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পূর্বে তাঁহার 'শেষ লেখা'য় কেন লিখিয়া গেলেন—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে—
কে তুমি।
মেলে নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়—
কে তুমি।
পেল না উত্তর।

এমন কথা বলিব না যে, মৃত্যুর একেবারে মুখোমুখী দাঁড়াইয়া চরমপরীক্ষার দিনে কবি তাঁহার অধ্যাত্মবোধ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া

পড়িয়াছেন, এবং সেই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া কিছুতেই বলিব না এমন কথা যে, কবির সারা জীবনের যে অধ্যাত্মবাণী তাহা কিছুই সত্য হইয়া ওঠে নাই, তাহা নিছক আত্মপ্রতারণার জন্য কল্পিত নিত্যনূতন স্বপ্নজাল। বরঞ্চ আমার কাছে মনে হয়, শেষ দিকে কবিকণ্ঠে এই যে সংশয়ের মিশ্রণ ইহা তাঁহার সমগ্রজীবনের অধ্যাত্ম-অনুভূতির সততা সম্বন্ধে আমাদিগকে নিঃসংশয়িত করিয়া তোলে। সত্যকে কবি যদি প্রথাপদ্ধতিপুষ্ট ধর্মীয় বিশ্বাস রূপে লাভ করিতেন তাহা হইলেই আমরা আশা করিতে পারিতাম যে, কবির সত্যানুভূতির ক্ষেত্রে কোথাও কোনো দিন কোনও কম্পন দেখা দিবে না। সত্যকে যে কবি প্রথাদৃঢ় বিশ্বাসের পথে লাভ করিতে চান নাই, কোনও শাস্ত্রবচন বা আপ্তবাক্যকে অবলম্বন করিয়াও এই বিশ্বাসকে তিনি গড়িয়া তুলিতে চান নাই; গড়িয়া তোলা বিশ্বাসকে তিনি শাস্ত্রবচন বা আপ্তবচনের দ্বারা চারিদিক হইতে ঠেকা দিয়াও রক্ষা করিতে চাহেন নাই। বিশ্বাসে সত্য সত্যই যেখানে চিড় ধরিতে চাহিয়াছে মিথ্যাবচনের প্রলেপ দিয়া তাহাকে যে জোড়া-তাড়া দিবার ক্লিষ্ট প্রয়াস করেন নাই সেইখানেই ত সত্য-সাধনায় তাঁহার সততার নিদর্শন। জীবনের রহস্যের এই দুর্জ্ঞেয়ত্বের স্বীকৃতি, চেতনায় মাঝে মাঝে এই পরিবর্তন-প্রবণতা—এই সংশয়ের কম্পন সর্বাপেক্ষা ভাল করিয়া প্রমাণ করিয়া দেয়—কবি রবীন্দ্রনাথ মানুষের সকল মহত্ত্ব এবং দুর্বলতা লইয়া সত্যকারের একজন মানুষ ছিলেন, তিনি কোনও একটি বিশিষ্টতত্ত্ববিগ্রহ ছিলেন না।

প্রথমাবধি আমরা দেখিয়াছি, সত্যকে রবীন্দ্রনাথ কোনো দিনই কোনও পারলৌকিক ইষ্টপূর্তির জন্য অচল আসনে অনড়মূর্তিতে বসাইয়া রাখেন নাই, সত্য তাঁহার জীবনের প্রতিমুহূর্তে হইয়া উঠিয়াছে; আবার জীবনের ভিতর দিয়া প্রতিমুহূর্তে হইয়া ওঠা সত্যকে কবি বার বার গভীর করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়াছেন নিজে নিত্যনূতন করিয়া হইয়া উঠিবার জন্য।

'শেষের দিন সেই ভয়ঙ্কর' আসিয়া উপস্থিত হইলেই সত্য আসিয়া কি করিয়া রক্ষা করিবে এবং নিত্য নরকাগ্নি বা নিত্য-আলোপুলকিত নিত্য-আনন্দধাম দান করিবে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম সেইদিকেই তাঁহাকে উন্মুখীন করিয়া তোলে নাই। জীবনের প্রতিমুহূর্তে পাওয়া সত্য প্রতিমুহূর্তের জীবনকেই আবার ধারণ করিয়া রাখিবে, সেই ধর্মপ্রবণতাই দেখা দিয়াছে রবীন্দ্রনাথের জীবনে মুখ্য হইয়া। শেষের দিনে সত্য আসিয়া কবির দুই হাত ভরিয়া কি দিল সেই প্রশ্নটাই রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বড় প্রশ্ন নয়—সত্য কবি অনুভূতির ভিতর দিয়া বর্ষে বর্ষে দিবসে-নিশীথে কি দিয়াছিল কবির দেহ-প্রাণ-মন ভরিয়া—কেমন করিয়া তাহা ধারণ করিয়া আসিয়াছে কবির দীর্ঘ জীবনকে সেই কথাটাই হইল বড় কথা।

জীবনপ্রবাহ মূলে অন্ধপ্রবাহই হোক আর চৈতন্যপ্রেরিত প্রবাহই হোক—প্রাণপ্রেরিতির ভিতর দিয়া মানুষের চেতনাকে জাগাইয়া দিতেছে। রবীন্দ্রনাথের আজীবন বিশ্বাস, এই চৈতন্যের ভিতর দিয়াই অসীম অনন্তের সহিত মানুষের পরিচয় এবং যোগ। গভীর অনুভূতিতে চৈতন্যের যে নিঃসীম ঘনীভবন সেইখানেই এই পরিচয়ের এবং যোগের পালা। নিত্যবিচিত্র অনুভূতির ভিতর দিয়া ঘনীভূত চেতনায় উদ্ভাসিত হইয়াছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সব সত্য; চেতনার ঘনীভবন-জাত জীবনোদ্ভূত সত্য জীবনকেই প্রতিনিয়ত আবার কিভাবে যে প্রভাবিত এবং নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতে থাকে রবীন্দ্রনাথের জীবনে সেই জিনিসটিই হইল পরম লক্ষণীয়। সত্যের সর্বনিরপেক্ষ কি মূল্য আছে আমরা তাহা জানি না; আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে সত্যের পরিচয় লইতে হইলে বলিব, জীবনসত্য হইল জীবন-প্রত্যয়। জীবন তাহার প্রবাহে প্রবাহে এই প্রত্যয়গুলিকে জাগাইয়া তোলে—তাই প্রত্যয়গুলি আবার জীবনের উপরে ফিরিয়া ফিরিয়া আসিয়া জ্ঞাতে অজ্ঞাতে প্রবাহশক্তির সহিতই মিশিয়া যায়। প্রবাহ হইতে

প্রত্যয়—প্রত্যয়ের আবার প্রবাহশক্তিতে রূপান্তর—ইহাই হইল জীবন লইয়া সত্যের খেলা। রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনে সেই খেলা যে কত সূক্ষ্ম এবং কত বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে আমাদের সকল আলোচনার মুখ্য লক্ষ্য হইল তাহাই।